গ্রন্থস্বত্ব : শ্রীমতী ছবি সরকার

প্রথম প্রকাশ : ১ জানুয়ারী ১৯৬০

প্রকাশক : শ্রীমতী ছবি সরকার, ৮।৩, সন্তোষপুর ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০৭৫

মুদ্রণে : গীতা প্রিন্টার্স, ২১ পঞ্চানন ঘোষ লেন কলকাতা-৭০০০০৯

প্রচ্ছদ : তপন কর

এই লেখকের :

মানবসভ্যতায় কুমারীবলি (২য় সংস্করণ)

রক্তকরবীর লোকায়ত ভাবনা

বিবাহের লোকাচার (সম্পাদিত, ২য় সংস্করণ)

সূচিপত্র ঃ পৃষ্ঠা

বিসমিল্লায় গলদ

ইস্কুলে ব্যাকরণ পড়ান, স্বপাকে আহার করেন, এমন একজন শিক্ষক একদিন দুপুরে স্নান সেরে খেতে বসে কুকারের ঢাকনা খুলতেই ভাতের বাটি থেকে একরাশ ধোঁয়া তাঁর নাকে-মুখে এসে লাগলো। বাটির দিকে তাকিয়ে হতাশায় বলে উঠলেন, 'বিসমিল্লায় গলদ!'

ব্যাপারখানা কী? বাটির ভেতর তাকিয়ে দেখলেন ভাত নেই, আছে শুধুই গরম জল। অর্থাৎ চাল দিতে ভুলে গেছেন।

এমন ভুল আমাদের প্রায় সকলেরই অনেক সময় হয়। কিন্তু 'গোড়ায় গ্রুটি রয়ে গেছে'—এটাকে বোঝাতে গিয়ে বিসমিল্লাহ্‌কে আমরা টেনে আনি কেন? এ কি তাঁর ভুল!

গোড়ায় নিজের ভুল হয়েছে এটি স্বীকার করবার জন্যই ব্যাকরণ শিক্ষক মশায় 'বিস্‌মিল্লায় গলদ' এই বাগ্‌ধারাটি ব্যবহার করেছেন। বাঙালী আমরা কবে থেকে কোন উৎসমুখে এই বাগ্‌ধারার সৃষ্টি করেছিলাম তা চিন্তা করতে গেলে, ভাতের পরিবর্তে সেদ্ধ জলের ধোঁয়াই চোখে মুখে এসে লাগে, এখানেও চিন্তার গোড়ায় গলদ থেকে যায়।

ইতিহাসের পথ বেয়ে যদি আমরা পেছন দিকে তাকাবার চেষ্টা করি, তবে দেখতে পাব, প্রত্যেক জাতির জীবন থেকে কিছু কিছু দিক হারিয়ে গেছে। বাস্তবে হারিয়ে গেলেও তাদের স্মৃতিকথা রয়ে গেছে বিভিন্নভাবে।

কেন কখন কোন সামাজিক পরিবেশে কেমন করে 'বিসমিল্লায় গলদ' এই বাগ্‌ধারাটির জন্ম হয়েছিল তার উত্তর খুঁজে পেলে বাঙালীর জাতীয় ইতিহাসের একটা ভুলে-যাওয়া অধ্যায়ের ধূসর চিত্রপট স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

যারা লেখাপড়া করে কোন-না-কোন একদিন লেখা এবং পড়ার কাজের সূচনা করতে তাদের হয়। পড়তে হয় লেখা জিনিসকে। তাই আমরা নির্বিচারে বলতে

পারি পড়ার আগে লেখার সৃষ্টি হয়েছিল। লেখা না থাকলে পড়ার প্রশ্নই আসে না। তাই, লেখাপড়া এই যুগ্ম শব্দটিতে 'লেখা'-শব্দটি আগে এবং 'পড়া'-কথাটি পরে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। এখন লেখাপড়া বললে জ্ঞানার্জন বুঝলেও মূলে এটা ছিল লিখতে পারা এবং পড়তে পারার অভ্যাস গঠন। আর জ্ঞানার্জন! এ তো মূলত জীবন-অভিজ্ঞতা ভিত্তিক।

যা-ই হোক, 'লেখাপড়া' শেখার প্রথম অনুষ্ঠানটিকে হিন্দুরা বলেন 'হাতে খড়ি'। এই শব্দটির মধ্যে আছে, মূলে এই অনুষ্ঠানে কি করা হতো। এখনও গতানুগতিক অনুষ্ঠানে হাতে খড়ির (প্রধানতঃ বিদ্যার দেবী সরস্বতী পূজার) দিনে নতুন শিক্ষার্থীকে সুন্দর জামাকাপড় পরিয়ে পবিত্রভাবে পূজার জায়গায় এনে তার হাতে একটি চক বা খড়ি দেওয়া হয়। পুরোহিত, যিনি অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন, চক শুদ্ধু তার হাত ধরে একটা শ্লেটের উপর ওঁসরস্বত্যৈ নমঃ কথাটি লেখান। ভাবখানা এমন, যেন শিক্ষার্থী লিখন শিক্ষার উদ্বোধন নিজেই করলো বিদ্যার দেবীর নাম স্মরণ এবং লিখনের মাধ্যমে। এর পর তার হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে অ আ ক খ লেখান এবং তাকে দিয়ে উচ্চারণ করান। হাতে খড়ির এইটুকুই প্রধানত আনুষ্ঠানিক দিক। হিন্দুরীতিতে, মধ্যযুগীয় বাংলার সমাজ জীবনে 'হাতে খড়ি' অনুষ্ঠানের সময় শিক্ষার্থীর আজকের মতোই পাঁচ বৎসর হওয়া চাই।

এই থেকে মনে হতে পারে যে হাতে খড়ির সূত্রপাত মধ্যযুগে। মোটেই তা নয়। প্রাচীন ভারতের ব্রাহ্মণ্য-শিক্ষা-ব্যবস্থাতেও অনুষ্ঠানটি ছিল। তখন এর নাম ছিল 'অক্ষরস্বীকরণম্'। অর্থগত দিক থেকে হাতে খড়ি এবং অক্ষরস্বীকরণ একই।

বিগত শতাব্দীতেও হাতেখড়ির মত একই একটি অনুষ্ঠান বঙ্গদেশের ইসলামীয় শিক্ষা-ব্যবস্থায় প্রচলিত ছিল। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে অ্যাডাম শিক্ষা-সংক্রান্ত যে রিপোর্ট দাখিল করেন তাতে অনুষ্ঠানের যে বর্ণনা পাওয়া যায় তা মোটামুটি এইরকম :

এই অনুষ্ঠানের সময় ছাত্র/ছাত্রীর বয়স হোতে হবে চার বৎসর চার মাস চার দিন। এই বিশেষ দিনে ছাত্রটিকে সুন্দর জামা কাপড়ে সাজিয়ে একখানি আসনে বসিয়ে দেওয়া হোতো। এরপর তাতে আরবী বর্ণমালা, সংখ্যা, কোরাণের ভূমিকা এবং তা থেকে বিভিন্ন অধ্যায়ের নির্বাচিত অংশবিশেষ শুনে শুনে আবৃত্তি করতে

বলা হোতো। কোনো কারণে নতুন শিক্ষার্থী যদি এগুলি আবৃত্তি করতে না চাইতো তবে 'বিসমিল্লাহ্' এই সর্বসিদ্ধিকর শব্দটি বলতে বলা হতো। সে এটি বললেই, ধরে নেওয়া হোতো যে তার শিক্ষারম্ভের অনুষ্ঠানটি সুসম্পন্ন হয়েছে।

যদি এখানে কোন ত্রুটি থাকতো তবে, ধরে নেওয়া যেতে পারে যে 'বিসমিল্লায় গলদ' হয়েছে। এমন মনে করা হোতো।

এই সমস্ত চিত্রটি সামনে রেখে সে যুগের বাংলার সাংস্কৃতিক চরিত্রের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা যেতে পারে। প্রথমত, হিন্দুদের 'হাতেখড়ি' আর মুসলমানদের 'বিসমিল্লাহ্' অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীর বয়স একই। এক ক্ষেত্রে পাঁচ বৎসর, অন্যটিতে চার বৎসর চার মাস চার দিন। খুলনা অঞ্চলে এই বয়স চার বৎসর, চার মাস চার দিনই। দ্বিতীয়ত, হাতেখড়ি এই শব্দটি পুরো বাংলা শব্দ দিয়ে তৈরি ; সংস্কৃত করলে দাঁড়াবে 'হস্তখটিকা'। আর হাতেখড়ি এবং অক্ষরস্বীকরণ দু'টি শব্দেরই মধ্যে কেবল লিখন শিক্ষার প্রসঙ্গ আছে, পড়ার কথা নেই! অন্যদিকে 'বিসমিল্লাহ' অনুষ্ঠানে কেবল মুখে মুখে পড়া, লেখার ব্যাপার নেই। তৃতীয়ত, হিন্দুরা সর্বসিদ্ধিদাতা হিসাবে গণেশকে বোঝালেও 'হাতে খড়িতে' তিনি নেই ; আছেন বিদ্যার দেবী সরস্বতী। অন্য দিকে মুসলমামরা দেববাদে বিশ্বাসী নন তাই 'বিস্‌মিল্লাহ্'কেই সর্বসিদ্ধির প্রতীকরূপে মনে করেন বলে তাঁরই নামে বিদ্যারম্ভের অনুষ্ঠানের নামকরণ করেছেন। চতুর্থত, হাতেখড়িতে লেখা ও আবৃত্তি করা দুই ই আছে, 'বিসমিল্লাহ্'-তে কেবল আবৃত্তি—এই থেকে বলা যায় এই অনুষ্ঠানের যুগে প্রাথমিক ইসলামী শিক্ষায় লিখন শিক্ষার গুরুত্ব স্বীকৃত হয়নি। মক্তবে তখন আবৃত্তিরই প্রাধান্য ছিল। পঞ্চমত, 'বিসমিল্লায় গলদ' এই বাগ্‌ধারার দুটি শব্দই আরবী। অর্থাৎ এই বাগধারাটির সৃষ্টির যুগে আরবী এবং ফারসী শিক্ষা ও শব্দ এদেশে প্রাধান্য পেয়েছিল। ষষ্ঠত, এই বাগ্‌ধারাটি সুপ্রাচীন নয় ; ইসলামীয় সংস্কৃতি বাংলার মাটিতে দৃঢ়মূল হওয়ার আগে এটির জন্ম এবং বাংলাভাষা ভান্ডারে স্থানলাভ সম্ভবপর নয়।

আজ যে কোনো ব্যাপারের মূলে ত্রুটি বোঝাতে 'বিস্‌মিল্লায় গলদ'-এর জন্ম ইসলামীয় শিক্ষারম্ভের অনুষ্ঠান 'বিসমিল্লাহ্'কে কেন্দ্র করে। কালের প্রভাবে এই বাগ্‌ধারাটিকে কেন্দ্র করে বিস্‌মিল্লাহ্ শব্দটির অর্থের ক্ষেত্রে যেমন প্রসার ঘটেছে অন্য দিকে আমরা ভুলে গেছি বাগ্‌ধারাটির উৎস-মুখকে।

বাগ্‌ধারা, প্রবাদ প্রবচনের চর্চা ভাষা-সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণের

সঙ্গে সংস্কৃতি চর্চার পথও যে খুলে দিতে পারে তার প্রমাণ আলোচিত বিষয়ের বিভিন্ন দিকে দেখা যায় বলেই মনে করি।

বিসমিল্লায় গলদ একথা যখন ভাবি তখনই মনে হয় একি সত্যি গোড়ায় গলদ? কিসের গোড়ায় গলদ? বিসমিল্লাহ্ অনুষ্ঠান ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের মধ্য থেকে আজ প্রায় উঠেই গেছে। আমার এক ছাত্রের (সে ইসলাম ধর্মাবলম্বী) মুখে শুনেছি ডায়মণ্ডহারবার মহকুমার একটি বা দু'টি গ্রামে নাকি এখনও দু'একটি পরিবারে এ অনুষ্ঠান হয়। হিন্দুদের মধ্যে আজও হাতে খড়ি অনুষ্ঠান হয়। কিন্তু তার জৌলুস কমে এসেছে। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে আমার নিজের ছেলের হাতে খড়ির কথা।

সব আয়োজনই আমাদের অঞ্চলে যেমন হয় তেমনি হয়েছিল। যে পুরোহিত অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেছিলেন তিনি ছেলের হাত ধরে অ আ ক খ লেখাচ্ছিলেন। সেই মুহূর্তটা আমি কাছে ছিলাম না। এসে শ্লেটখানা দেখলাম। সব বর্ণই লিখেছেন, কেবল 'ঋ' বাদ। সংস্কারাচ্ছন্ন মনে একটা কেমন ভাব এলো—আচ্ছা, জীবনের প্রথম লেখাতেই, বিসমিল্লায় গলদ। কেন জানিনা হঠাৎ মনে হলো, আচ্ছা, 'ঋ' দিয়ে কি কি শব্দ হয়? বাংলায় যেগুলি ব্যবহৃত হয়? দুটি শব্দই মনে পড়ল—ঋদ্ধি এবং ঋণ। জীবনের প্রথম লেখাতে 'ঋ' বাদ। 'ওর জীবনে ঋণও নেই, ঋদ্ধিও নেই! তাই কি? সংস্কারাচ্ছন্ন মন এ প্রশ্ন আজও করে যখন ঐ অনুষ্ঠানটির কথা ভাবি।

ভাবি এই জন্য যে, যে বিসমিল্লাহ্ বা হাতে খড়ি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে জীবনের, সামাজিক জীবনের শুভ সূচনা তাতে ঋণ ও ঋদ্ধি দুই-ই আছে। ঋণ আমাদের প্রাগৈতিহাসিক পূর্বপুরুষ থেকে অদ্যাবধি কালের মানুষের কাছে। ঋণ সেই অতি-অতি-অতিবৃদ্ধ মাতাপিতা থেকে আবহমান কালের সংগ্রামী মানুষের কাছে যাঁরা কোনো অবস্থাতেই মাথা নত করেন নি। সমস্ত রকম প্রতিকূল অবস্থাতেও ধৈর্য না হারিয়ে মানবতার মহান লক্ষ্যের পথে এগিয়ে আমাদের আজ এখানে দাঁড় করিয়েছেন, সেখানে আমাদের চিন্তাচেতনা স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হতে হতে স্পষ্টতমের দিকে এগোচ্ছে। তার সেই অপরাজিত, জীবনযুদ্ধে অপরাজিত তাঁদের সংগ্রামী চেতনাই এনেছে আমাদের ঋদ্ধি। আমাদের জন্য এনেছেন ঋদ্ধি। আবহমান কালের পথে তাঁদের অঙ্গুলি নির্দেশ সিদ্ধির। সেই সিদ্ধিলাভই মানুষের লক্ষ্য।

কিন্তু তার জন্য চাই ব্যক্তির নিঃস্বার্থ ব্যক্তিত্বের সার্থক অভিস্ফুরণ। আধুনিক শিক্ষাচিন্তা বলে, অন্তরের সুপ্ত সম্ভাবনাসমূহের পূর্ণাঙ্গ বিকাশের পথ তৈরি করাই শিক্ষার লক্ষ্য। এককালে ভাবতাম শিক্ষকের কাজ শিক্ষাদান। এখন শিক্ষাবিদ্‌দের বক্তব্য স্বীকার করে নিয়ে মনে প্রাণে বিশ্বাস করি এবং বলি, শিক্ষকের কাজ শিক্ষাদান নয়। শিক্ষার্থীর মনে আগ্রহ সৃষ্টিই তাঁর একমাত্র কর্তব্য।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে আমার বাল্যের অভিভাবক-শিক্ষক স্বর্গত হরনাথ পাইন মহাশয়ের একটি গল্পকে।

সারাদিন ছোটাছুটি করে আর খেলে সন্ধ্যায় প্রচন্ড ঘুম পেয়েছে ছোট্ট ছেলের। রান্নাঘরে এসে দেখলো তখনও রান্না হয় নি। মাকে বলল, 'মা' আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। আমার ক্ষিদে পেলে জাগিয়ে দিস। মা বললেন, বাবা, আমায় জাগাতে হবে না। ক্ষিদেই তোমায় জাগিয়ে তুলবে।

অনেকদিন আগে শোনা গল্প। আজ বুঝি—শিক্ষার্থীর মধ্যে জানবার বুঝবার ক্ষিদে যাতে জাগে সেই চেষ্টা করাই শিক্ষকের কাজ। তা যদি সম্ভব হয় তবে সব শিক্ষার্থীর মধ্যেই জেগে উঠবে প্রসন্ন গুরুর পাঠশালার অপু, যে 'দুর্ভিক্ষের ক্ষুধার আগ্রহে গিলিত' পাঠশালার সব আলোচনা।

আজকে শিক্ষা বলে, শিক্ষাক্ষেত্রে আগে জন, তারপর ল্যাটিন, তারপরে টিচার। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে কি হয়?

'পৌষমাসের দিন। অপু সকালে লেপ মুড়ি দিয়া রৌদ্র উঠিবার অপেক্ষায় বিছানায় শুইয়াছিল, মা আসিয়া ডাকিল, অপু, ওঠ শীগ্‌গির ক'রে, আজ তুমি যে পাঠশালায় পড়তে যাবে!...পাঠশালার নাম শুনিয়া অপু সদ্য-নিদ্রোত্থিত চোখ দু'টি তুলিয়া অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার ধারণা ছিল যে যাহারা দুষ্ট ছেলে, মার কথা শোনেনা, ভাইবোনদের সঙ্গে মারামারি করে, তাহাদেরই শুধু পাঠশালায় পাঠানো হইয়া থকে। কিন্তু সে তো কোনদিন ওরূপ করে না, তবে সে কেন পাঠশালায় যাইবে?'

কিন্তু এই ধারণা কেমন করে গড়ে ওঠে প্রতিটি অপুর মনে আজও? তত্ত্ব বলছে শিক্ষার পরিবেশ হবে আনন্দময়। অথচ আধুনিক কালের কোনো ছাত্রকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করানো কি ছাত্র কি অভিভাবক কার কাছে আনন্দময়? বিদ্যালয়ে পঠন পাঠনার পদ্ধতি তত্ত্বগত দিক থেকে যতই মনোবিজ্ঞান, যুক্তিবিজ্ঞান সম্মত

বলে দাবি করা হোক, ভালো স্কুলে ছাত্রকে ভর্তি করার পর কি অভিভাবক, কি সেই শিক্ষার্থী সবাই একবাক্যে যেন মনে মনে শ্রীনাথ বহুরূপীর আবির্ভাবে সব কিছু লন্ড ভন্ড হওয়ার পর যেমন 'ভট্টচার্য্যিমশাই তাহার (শ্রীনাথের) পিঠের উপর খড়মের এক ঘা বসাইয়া দিয়া রাগের মাথায় হিন্দী বলিতে লাগিলেন, 'এই হারামজাদা বজ্জাতকে বাস্তে আমার গতর চূর্ণ হো গিয়া। খোট্টাশালার ব্যাটারা আমাকে যেন কিলায়কে কাঁটাল পাকায় দিয়া'—তেমনি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে একই কথা। আধুনিক শিক্ষা বিশেষ করে নামীদামী স্কুলে যাঁরা ছেলে-মেয়েদের ভর্তি করেছেন তাদের দিকে তাকালেই বোঝা যাবে।

আধুনিক শিক্ষা-ব্যবস্থায় আমরা বলি শিক্ষার পরিবেশ হবে আনন্দময়। প্রাক্-প্রাথমিক এবং প্রাথমিক স্তর সম্বন্ধে একথা আরও বেশি করে প্রযোজ্য। এমন কি হঠাৎ-গজিয়ে ওঠা শিশুদের জন্য স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা যখন মায়েদের সংগে স্কুলে যায় তখনও তাদের যেভাবে 'আজকের পড়া' মুখে মুখে পড়তে পড়তে যায়, খেতে খেতে পড়ে, ঘুমে চোখ ভেঙে-আসা ছেলেমেয়েদের 'আর দু'টো বলে ঘুমিয়ে পড়' বলে মা 'ভালো রেজাল্ট-'এর জন্য এই ধরনের প্রচেষ্টা চালাতে থাকেন তখন কেবলই ভট্টচার্য্যিমশায়ের কথা মনে পড়ে—'কিলায়কে কাঁটাল পাকায় দিয়া—'

প্রতিটি নরনারীর জীবনের বিশেষ বিশেষ দিনকে স্মরণীয় করে রাখবার জন্য জন্মদিন, বিবাহবার্ষিকী ইত্যাদি নানা ধরনের উৎসবের ব্যবস্থা চালু হয়েছে বিভিন্ন দেশে। ভারতও এর ব্যতিক্রম নয়। জীবনের দশ-কর্ম স্মরণীয় অনুষ্ঠানের দিন। ভারতে জীবনের প্রথম শিক্ষারম্ভের দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য তাই বিসমিল্লাহ্ (জানিনা মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে এ অনুষ্ঠান ছিল বা আছে কিনা; নাকি হাতে-খড়ি যাকে প্রাচীন শিক্ষা-ব্যবস্থায় বলা হতো "অক্ষরস্বীকরণ' অনুষ্ঠান তারই ইসলামীকৃত বিসমিল্লাহ্ অনুষ্ঠান) অথবা হাতেখড়ি বোধ হয় স্মরণীয়তম অনুষ্ঠান, অন্নপ্রাশনকে বাদ দিলে। যাকে কেন্দ্র করে এই অনুষ্ঠান তার ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে পূর্ণ মর্যাদা দিয়ে (কিছু না বলতে চাইলে কেবল বিস্‌মিল্লাহ্ বললেই অনুষ্ঠান পূর্ণ হলো ধরে নেওয়া) আনন্দময় পরিবেশে শিশুর ভাবী সুস্থ সুন্দর জীবনের প্রথম পদক্ষেপের আয়োজন-এর বোধ হয় তুলনা হয় না। শিক্ষাই যে মানুষকে সু-নাগরিক করে গড়ে তোলে, আর শিক্ষায় শিক্ষার্থীর ইচ্ছা-অনিচ্ছাই যে বড়

কথা, তার মধ্যে আগ্রহকে সৃষ্টি করার জন্য শিশু-নায়ককে আত্মীয় স্বজন, শিক্ষকের সামনে সুসজ্জিত করে উপস্থাপনাই যে শেষ কথার মধ্যে অন্যতম প্রধান তা এই হারিয়ে-যেতে-বসা এই অনুষ্ঠানকে দেখলেই বোঝা যায়। এই অনুষ্ঠান আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় নেই দেখে, অভিভাবক, শিক্ষকের শিক্ষার্থীকে জোর করে গেলানোর চেষ্টা দেখলে বারে বারেই মনে হয়,—বিসমিল্লায় / গোড়ায় গলদ করে চলছি না তো আমরা!

জীবন সমস্যার সমষ্টি। সমস্যা সমাধানের উপায় খুঁজে বের করে সে পথে অগ্রসর হওয়ার নামই অগ্রগতি। সে পথের প্রথম পদচারণায় 'বিসমিল্লাহ্'কে বাদ দিয়ে যেন আমরা গোড়ায় গলদ করছি। জীবন সমস্যা, কিন্তু তার সমাধানের পথ হওয়া উচিত আনন্দময়তার সঙ্গে যুক্ত।

মাটি খাওয়া

দুই চাষী চলছিলেন গ্রামের পথ বেয়ে। কথা বলতে বলতে চলছিলেন ওঁরা। একজন আর একজনকে কথা প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন—তা, হ্যাঁগো, জামাই কেমন হলো? দ্বিতীয় ব্যক্তির উত্তর—আর বোলো না। মাটি খাওয়া কাজ করেছি ভাই। এক মুকখুর হাতে মেয়েটা গিয়ে পড়লো! দেখে তো বাইরে থেকে ভালই মনে হয়েছিল।

ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় কন্যাকুল যেহেতু প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রেই প্রাক্ বিবাহিত জীবনে পিতৃ-পরিবারের বয়ঃজ্যেষ্ঠদের মতের উপর নির্ভরশীল, তাই বিবাহ, পাত্র নির্ধারণ এগুলির জন্য প্রধানত পিতা বা পিতৃস্থানীয় ব্যক্তির উপর দায়িত্ব বর্তায়। তাঁরা সাধ্যমত বিচার বিবেচনা করে কন্যাকে সৎপাত্রে অর্পণের চেষ্টা করেন।

উল্লিখিত কন্যার পিতাও সে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু নতুন জামাতা তার পরবর্তী আচার আচরণে শ্বশুরকে তৃপ্ত করতে পারে নি। আর সেই জন্যই চাষীর দীর্ঘশ্বাসপূর্ণ উপরিউক্ত বক্তব্য।

তিনি তাঁর মনের খেদকে প্রকাশ করতে গিয়ে এমন একটি শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করেছেন যাকে সাধারণত প্রবাদ নামে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে; আর সেটি হলো 'মাটি-খাওয়া।' প্রবাদ বা Proverb সম্পর্কে ইংরেজীতে একটি প্রচলিত কথা আছে—'The wisdom of many and the wit of one.' এই বক্তব্যকে স্বীকৃতি দিলে বলতে হয়, প্রবাদ হচ্ছে বহু মানুষের অভিজ্ঞতা এবং ব্যক্তি-এককের বৈদগ্ধ্যের ফসল।

এই অভিজ্ঞতা এবং বৈদগ্ধ্য আলোচ্য প্রবাদটি গঠনে কেমন করে কাজ করেছে, এবার আমরা তা দেখতে চাই।

'মাটি-খাওয়া'—এই প্রবাদটির জন্ম-ইতিহাসের পেছনে একটি গল্প প্রচলিত আছে। গল্পটি এই রকম:

নতুন বিয়ের পর জামাই দ্বিরাগমনে শ্বশুরবাড়ি এসেছে। আদর আপ্যায়নের ত্রুটি হয়নি। কিন্তু ছেলেটি সারাক্ষণ প্রায় চুপচাপই থেকেছে। যে সময়কার গল্প এটি তখন কি নববধূ, কি বর উভয়ই প্রথম শ্বশুর বাড়িতে গিয়ে ভদ্র, সভ্য, নম্রভাবে থাকবে—এটাই আকাংক্ষিত ছিল। আর এই রীতি যাতে ছেলেটি শ্বশুর বাড়িতে গিয়ে লঙ্ঘন না করে তার জন্য তাকে শিখিয়ে দেওয়া হয়েছিল, 'ওখানে গিয়ে উঁচু জায়গায় বসবি, কোকিলের সুরে কথা বলবি।' ... ..ইত্যাদি ইত্যাদি।

পৌঁছে ছেলেটির মনে পড়ল, বাড়ি থেকে বলা হয়েছে উঁচু জায়গায় বসতে। অথচ ঘরের মধ্যে সে এমন কিছু বসবার পেলো না, যাকে উঁচু বলা যায়। খুঁজতে খুঁজতে বাড়ির একদিকে দেখল একটা উঁচু ছাইগাদা—পাশে মানকচুর বড় বড় গাছ। সেইটেকেই উপযুক্ততম উঁচু জায়গা মনে করে সে তার উপর বসে পড়ল।

এদিকে জামাইকে দেখতে না পেয়ে বড় সম্বন্ধী নাম ধরে ডাকতেই ছাইগাদা থেকে উত্তর আসতে থাকল প্রতিবারেই—'কু-উ, কু-উ'......। ব্যাপারটা যখন জানাজানি হয়ে গেল, তখন স্বভাবতই শাশুরী ঠাকুরনের সন্দেহ হল—জামাই উন্মাদ কিনা! কানে উঠল শ্বশুরের। তিনি ব্যাপারটা গোপনে পরীক্ষার জন্য বিকেলবেলায় জামাই বাবাজীবনকে সঙ্গে নিয়ে নদীর ধারে বেড়াতে বেরুলেন।

কিছুক্ষণ পথ চলার সময় জামাই পড়েছে ফাঁপড়ে। বারবার উত্তর দেবার ব্যাপারে তালিম দেওয়া হলেও আলাপ করার পদ্ধতি সম্বন্ধে তাকে সচেতন করে দেওয়া হয়নি। গ্রাম থেকে দূরে অন্যত্র তার শ্বশুর বাড়ি। এখানে সবাই প্রায়-অপরিচিত। কী-ই বা কথা সে বলবে শ্বশুর মশায়ের সঙ্গে? হঠাৎ মনে হল, আচ্ছা সে তো বিবাহসূত্রেই এ বাড়িতে এসেছে। অতএব শ্বশুরমশায়ের সঙ্গেও বিবাহ-প্রসঙ্গেই আলাপ করা যেতে পারে। সে প্রশ্ন করে বসল—আচ্ছা শ্বশুর মশায়, আপনি বিয়ে করেছেন কাকে? শুনে স্বভাবতই কন্যার পিতার কর্ণমূল আরক্ত হয়ে ওঠার কথা। এবং তিনি তা হলেনও। তবু নির্বিকারভাবে বললেন,—তোমার শাশুড়ীকে। জামাইয়ের উত্তর—'খুব ভাল করেছেন। ব্যাপারটা ঘরে ঘরেই মিটে গেছে। আপনাকে দূরে যেতে হয়নি।' শ্বশুর বুঝলেন, জামাই উন্মাদ নয়, মূর্খ। আবার নীরবতা।

হঠাৎ জামাই-ই নীরবতা ভাঙল—আচ্ছা শ্বশুরমশাই, এই যে বিরাট নদী,

এটা কাটতে কত লোক লেগেছিল ? আর কেটে মাটিগুলোই বা রাখলো কোথায় ?"

মুর্খামির সীমা থাকা উচিত। রেগে গিয়ে শ্বশুরমশাই উত্তর দিলেন, কত লোক তা তো জানি না। তবে এর অর্ধেক মাটি খেয়েছেন তোমার বাবা, তা না হলে তোমার মত ছেলে তাঁর হতো না ; আর অর্ধেক খেয়েছি আমি, তা নইলে তোমার হাতে মেয়ে দিতাম না।

আজ আমরা যে অর্থে মাটি খাওয়া প্রবাদটিকে ভাষায় প্রয়োগ করে থাকি, গল্পটির সমাপ্তি অংশে সে অর্থটিকে পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে।

এখন প্রশ্ন প্রবাদটির জন্ম আগে, না গল্পটির ? এমন মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে প্রবাদটিকে ব্যাখ্যা করার জন্যই যেন গল্পটি তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু তেমন সম্ভাবনাকে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় না কয়েকটি কারণে।

প্রথমত, আমাদের আলোচ্য জামাতৃবাবাজীবন শ্বশুর বাড়িতে যে আচরণ করেছেন, সেটা অস্বাভাবিক বলে মনে হলেও, যে সময়কার গল্প এটি তখন বাংলার সমাজজীবনে বাল্য, এমন কি শৈশব বিবাহও প্রচলিত ছিল। তাই বিবাহিত বালক যখন প্রথম একা শ্বশুর বাড়িতে দ্বিরাগমনে যেতো তখন তাকে বিভিন্ন ধরনের উপদেশ দিয়ে না দিলে ঠাট্টা সম্পর্কের নতুন আত্মীয়দের হাতে পদে পদে নাকাল হতে হত। মধ্যযুগীয় বা প্রাগাধুনিক সাহিত্য এবং অনেকের স্মৃতিকথায় এ জাতীয় চরিত্রের নজির মিলবে। বালক উঁচু জায়গার খোঁজে ছাই গাদায় বসে নি। হয়তো বা ঠাট্টার আক্রমণ থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য সে ওই অঞ্চলে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। দ্বিতীয়ত, সে কু-উ কু-উ করে নি। কী-ই, কী-ই বলে উত্তর দেবার চেষ্টাই ঠাট্টাস্থানীয়দের ঠাট্টায় কু-উতে রূপান্তরিত। তৃতীয়ত, ঘরে ঘরে বিয়ে হয়ে যাওয়ার কথা বলা তার অজ্ঞতার পরিচয় নয়। সে তৃপ্তি পেয়েছিল এই ভেবে সে, তার শ্বশুর মশাইকে নিশ্চয়ই তার মত ঠাট্টা-স্থানীয়দের হাতে পদে পদে নাকাল হতে হয়নি। বোকামি নয়, শ্বশুরের প্রতি বালক-মনের সহানুভূতিরই প্রকাশ এই উক্তি। কিন্তু কন্যার পিতা সংসারাভিজ্ঞতায় বালকসুলভ সরল মনকে হারিয়ে ফেলে, সম-মানসিকতার ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে বালক-জামাইয়ের বক্তব্যকে বিচার না করে যে উক্তিটি করলেন, তা অতীব নির্মম এবং হতাশাব্যঞ্জক মনের পরিচায়ক। এর কারণ, আমাদের মধ্যযুগীয় মানসিকতা, এমন কি আরও প্রাচীনকাল থেকেই শিশু বা বালক বালিকাকে পরিপূর্ণ মানুষের ক্ষুদ্র সংস্করণ বলেই ভাবতে অভ্যস্ত আমরা। মানুষের

শৈশব বা বাল্য যে তার নিজস্ব প্রকৃতিতে চলে তা আমরা ভাবিনি। আর সেই স্বাভাবিক ভাবনার প্রতিফলন অতি সাম্প্রতিককালে পঠনপাঠনার ক্ষেত্রে ঘটলেও সামাজিক আচার আচরণে এখনও প্রায় প্রতিটি গৃহে শৈশব থেকেই শিশুকে তথাকথিত 'শিক্ষাসহবৎ' শেখানোর যে চেষ্টা করি, তা বোধহয় প্রায় কেউই অস্বীকার করতে পারবো না। নদীর বিরাট খাদের মাটি পাড়কে উঁচু করে নি। তা কোথায় গেল—এ প্রশ্ন বালকমনের বিস্ময়ের প্রকাশ মাত্র।

যা-ই হোক, আলোচ্য গল্পের কন্যার পিতা দুঃখ এবং হতাশায় নদীর মাটি খেয়ে ফেলার কথা বলেছেন। আমরা জানি মাটি খাদ্যবস্তু নয়। কিন্তু তা জানলাম কেমন করে? মাটি কি আমরা খাই? খাই না। কিন্তু আজ না খেলেও কোনোকালেই কি খাইনি? খেয়েছি। খেয়েছি যে তার অন্যতম প্রমাণ আমাদের প্রত্যেক মানুষের শৈশব-অভিজ্ঞতা। গৃহকর্মে ব্যাপৃতা মায়েরা যখন কোমরের ঘুনসির সঙ্গে দড়ি আটকে আমাদের খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখতেন, তখন সামনে যা পেয়েছি তা-ই মুখে পুরে দিয়েছি নির্বিচারে আমাদের আদিমতম পিতৃমাতৃকুলের মত। Trial and error পদ্ধতিতে কোনটি খাদ্য, কোনটি নয়,—তা জেনেছি বহুপুরুষের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে। খাদ্য আমরা তাকেই বলি যা আমাদের ক্ষুন্নিবৃত্তি এবং দেহের পুষ্টি সাধন করতে সমর্থ। কিন্তু মাটির সে গুণ নেই। তাই, যা আমাদের পুষ্টিসাধনে অসমর্থ তাকে তাচ্ছিল্যভরে অখাদ্যরূপ পর্যায়ে ফেলেছি। অথচ দায়ে পড়ে সেই অখাদ্য গলাধঃকরণে বাধ্য হওয়ার মত হতাশাব্যঞ্জক অভিশাপ জীবনে নেই। ভারতীয় সমাজরীতিতে সম্প্রদত্তা কন্যাকে, অবস্থা যতই বেদনাময় হোক না কেন, পুনর্গ্রহণ করা যেতো না। আর সেই জন্যই মূর্খ জামাতাকে গ্রহণ করতে বাধ্য হওয়া এখানে মাটি খাওয়ারই সামিল।

যে অভিজ্ঞতা, গল্পটিকে কেন্দ্র করে, বাংলার বাল্যবিবাহের যুগে প্রকাশিত হয়েছিল, তা-ই বা সেই ঘটনার কথাই যখন পল্লবিত হতে হতে পরবর্তীকালের বৃহত্তর জনসমাজের দৈনন্দিন হটকারী আচরণ প্রসঙ্গে মানুষের মনে পড়তে থাকল তখন গল্পের পটভূমি-অনুষঙ্গও বদলাতে লাগল। এবং কালক্রমে মূল ঘটনাকেন্দ্রিক গল্পটি তলিয়ে গেল মহাকালের গহ্বরে। কেবলমাত্র বেঁচে রইল গল্পের শেষ এবং মূল উক্তি—'মাটি খাওয়া' এই অংশটুকু।

যে ঘটনাকে কেন্দ্র করে 'মাটি খাওয়া' কথাটি ব্যবহৃত হয়েছিল, তেমন

অভিজ্ঞতা প্রায় প্রত্যেক সমাজব্যবস্থায় প্রতিটি মানুষেরই আছে। কিন্তু এমন সুচিন্তিত, অর্থবহ সংহত বক্তব্য আমরা অনেকেই রাখতে পারি না বলে পূর্ব-বর্তী কোনো বক্তার সুপ্রযুক্ত পদগুচ্ছকে ভাষায় বিশিষ্ট স্থান করে দিই। তারা হয়ে ওঠে ভাবপ্রকাশের অমূল্য সম্পদ। এমন সম্পদকে গ্রহণ করি প্র (প্রকৃষ্ট) উক্তি (বদ, বচ্ ধাতু) বলে। গড়ে ওঠে প্রবাদ।

স্বভাবতই প্রশ্ন আসে প্রবাদটি কতদিন থেকে বাংলাভাষায় চলছে? এ প্রশ্নের উত্তর খুব সহজসাধ্য নয়। প্রথমত, ধরা যাক প্রবাদটির দেহ গঠনের দিক। যে দুটি শব্দ 'মাটি এবং 'খাওয়া' দিয়ে এটি গঠিত তারা উভয়েই তদ্ভব শব্দ এবং আধুনিক কালেও এরা ভাষায় ব্যবহৃত। দ্বিতীয়ত, 'মাটি খাওয়া' এই প্রবাদটি যারা বা যিনি সৃষ্টি করেছেন তাঁরা বা তিনি গ্রাম বাংলার মাটির কাছাকাছি স্তরের মানুষ। তা না হলে মাটি খাওয়া না হয়ে অন্য কিছু খাওয়া প্রসঙ্গে প্রবাদটিকে সৃষ্টি করতেন। তৃতীয়ত, পরিশীলিত মনের সৃষ্টি হলে শব্দের মধ্যেও পরিশীলনের চেষ্টা করতেন। চতুর্থত, জনজীবনে যদি কোনো প্রবাদ দীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত থাকে তবে তার প্রতিফলন সমকালীন সাহিত্যেও ঘটে।

'মাটি খাওয়া' এই প্রবাদটির ব্যবহার করেছেন ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর। রামপ্রসাদ সেনও তাঁর বিদ্যাসুন্দর কাব্যে এর প্রয়োগ করেছেন। এইসব দিক বিচার করলে সপ্তদশ শতাব্দী বা তার কাছাকাছি কোনো সময়ের প্রবাদ এটি—এই সিদ্ধান্তে আসতে হয়। অবশ্য এই সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত এমন দাবি করা সমীচীন নয়।

যাই হোক, লোক-প্রচলিত গল্পকে বিশ্লেষণ করলে, প্রবাদটির দৈনন্দিন ব্যবহার দেখলে মাটির কাছাকাছি মানুষের জীবন-অভিজ্ঞতাকে স্বীকৃতি দিলে প্রবাদ সম্পর্কে উদ্ধৃত ইংরেজী বক্তব্যটির পুনরুক্তি করতে ইচ্ছা করে—এরা হচ্ছে **The wisdom of many and wit of one.**

সবশেষে মনে হয় একটি কথা—মানুষ যখন প্রকৃতির বিভিন্ন দিককে বিস্ময় বিমুগ্ধ চোখে দেখেছে তখন তার অনেক বিষয়ই তাকে করে তুলেছে জিজ্ঞাসু। আর এক জিজ্ঞাসার উত্তরই তাকে সমকালীন অভিজ্ঞতায়, জীবনচর্চা এবং চর্যার ভিত্তিতে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন হবার পথে এগিয়ে দিয়েছে। নদীর খাদের মাটি স্রোতোবাহিত হয়ে মোহনায় দ্বীপের সৃষ্টি করে—এ জীবন অভিজ্ঞতা

তার ছিল না। অথচ এত মাটি কোথায় গেল, এ প্রশ্ন এসেছে তথাকথিত মূর্খ জামাতার মনে। সদুত্তর দেবার মত মন শ্বশুর মশায়ের সেই মুহূর্তে থাকলে খাওয়ার পরিবর্তে হয়তো অন্য কথাই বলতেন তিনি। হয়তো আমরা পেতাম একটি বৈজ্ঞানিক চিন্তার প্রবাদ।

বামুন গেল ঘর তো লাঙল তুলে ধর

হাল ফ্যাসানের বাড়ি তৈরি হচ্ছে শহরের বুকে। বাড়ি না বলে গগনচুম্বী প্রাসাদ বলাই ভাল। রাজকীয় ব্যাপার। ঠিকেদারের অধীনে কাজ করছে বহু শ্রমিক। কাজের ফাঁকে বাড়ির এক কোণে বিড়ি খেতে খেতে গল্প করে একটু নিঃশ্বাস ফেলার চেষ্টা করছিল দু'জন ঘেমে যাওয়া শরীরে। দু'টি মিনিটও কেটেছে কিনা সন্দেহ। হঠাৎ ঠিকেদারের বজ্র-হুংকার—'কিরে? বামুন গেল ঘর তো লাঙল তুলে ধর! একটু চা খেতে গেছি আর অমনি ফাঁকি! গল্প জুড়ে দিয়েছিস সব! এক ঘণ্টার মজুরি কাটা গেল আজকের বলে দিলাম। যত্তো সব...'কথা অসমাপ্ত থেকে যায়, কিন্তু বক্তব্য স্পষ্ট। ইলেকট্রিক শক্ খাওয়ার মতো করে ছিটকে পড়ে দু'জন দু'দিকে।

উল্লিখিত দৃশ্যের প্রতিরূপ আমরা প্রায়শই যত্রতত্র দেখতে পাই। ঠিকেদার জানে শ্রমিকের 'দেহ যতক্ষণ বহে ততক্ষণ খাটাইয়া লওয়াই যুক্তিসংগত'। শ্রমিক দেখছে, পেটের দায়ে কাজ তারা করছে তার ফল আর যারাই ভোগ করুক তারা যে নয় তা নিশ্চিত। নিম্নতমেরও কম মজুরির বিনিময়ে যে সৌন্দর্য তারা রচনা করে চলেছে, সৃষ্টি শেষ হয়ে গেলে সেখানে প্রবেশাধিকারও তার থাকবে না। স্বচ্ছন্দ বিচরণ তো দূরের কথা। একদিকে নিজের দৈন্য-প্রপীড়িত জীবনে মাথা গোঁজার জায়গা ভাঙা কুঁড়েঘরে, অন্যদিকে নিজের সমস্ত জীবনীশক্তি নিংড়ে গড়ে তুলছে অট্টালিকা। একদিকে বৈষম্যের এই শোষণচিন্তা অন্যদিকে বিষম শ্রমসাপেক্ষ পরিবেশে একটুখানি শক্তি পুনরুদ্ধারের জন্য ক্ষণিকের সুখ-দুঃখের কথা বলা, ধূমপান—একেও যখন নিয়োগকর্তা বাহুল্য মনে করে বিষ নজরে দেখে তখনই পড়ে দীর্ঘশ্বাস। কিন্তু উপায় নেই।

নিয়োগকারীর ভাবনা যে কি, তার পরিচয় শরৎচন্দ্রের মেজদিদি গল্পের পূর্বোল্লিখিত উদ্ধৃতিতেই পাওয়া যাবে। প্রশ্নটা আপাতত তা নয়।

আমাদের প্রশ্ন—ঠিকেদারের দৃষ্টিতে ফাঁকি দেওয়ার এই প্রবণতাকে ধিক্কার জানাতে 'বামুন গেল ঘর তো লাঙল তুলে ধর' এই প্রবাদ-বাক্যটির প্রয়োগ কেন? এর উৎস কী?

প্রথমেই আসা যাক প্রবাদটির চিত্রকল্প প্রসঙ্গে। উল্লিখিত পদগুচ্ছ উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে যে ছবিটি মনের সামনে ভেসে ওঠে তা হলো, প্রায়-দুপুরের সূর্যে ঘর্মাক্ত কলেবরে কর্মরত কয়েকজন কৃষাণ। গাছপালাবিহীন বিরাট বিস্তৃত মাঠে এক হাতে লাঙলের মুঠি, অন্য হাতে পাচন। কয়েকজোড়া শীর্ণ গরুকে তাড়িয়ে নিয়ে মাঠ চষে বেড়াচ্ছে। দূরে অপসৃয়মান একটি নাদুস নুদুস দেহ। গলায় যজ্ঞোপবীত, মাথায় ছাতা। কৃষাণরা কাজে ঢিলে দিয়েছে। মূর্তিটি অদৃশ্য হতে না হতেই সবগুলি লাঙল নিশ্চল।

অট্টালিকা নির্মাণকারী শ্রমিকের আচরণের সঙ্গে মাঠের কৃষাণের পার্থক্য বড় কম।

চিত্রটি মনে ভেসে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আরও একটি কথা মনে হয়। পৈতে-ধারী যে মানুষটি ছাতা মাথায় এইমাত্র দুপুরের বিশ্রামের জন্য, স্নাহাহারপর্ব সমাধা করার জন্য বাড়ির দিকে রওনা হলেন, যে জমি চাষ হচ্ছে তিনি তার মালিক। তিনি যখন দুপুরের রোদ এড়িয়ে শরীর আর পেট সহ মাথা ঠান্ডা করে বিশ্রাম সুখ উপভোগ করবেন তখন মাঠের এই কৃষাণ হয়তো পুত্রকন্যা বা স্ত্রীর বয়ে আনা পান্তা গিলে আবার লাঙলের মুঠি ধরবে দুপুর সূর্যের খরতাপ বা অবিশ্রান্ত বর্ষণের তীব্রতাকে উপেক্ষা করে। এই তো দেখে আসছি আমরা আবহমানকাল ধরে অদ্যাবধি। তবে পার্থক্য এক জায়গায়। প্রবাদটিতে জমির মালিক হিসাবে দেখানো হয়েছে একজন ব্রাহ্মণকে। এ যুগে কিন্তু এর পরিবর্তে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখতে পাই বর্ণাশ্রমপ্রথা নির্ধারিত অন্য বর্ণের মানুষকে। জমির মালিকানা হয়তো বা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে, বা অন্য নানাবিধ কারণে অন্য বর্ণের হাতে পড়েছে। আমরা সেদিকের আলোচনায় না গিয়ে, আলোচ্য প্রবাদের চিত্রকল্পের দিকে লক্ষ রেখে নির্দ্বিধায় বলতে পারি বাংলা তথা ভারতের সমাজব্যবস্থার একটা বিশেষ যুগে জমির মালিকানা বর্তেছিল ব্রাহ্মণদের উপর। সেটা কেমন করে?

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এই চতুরাশ্রম প্রথার স্রষ্টা ভারতে বহিরাগত আর্য-ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী। রাজত্ব প্রতিষ্ঠা এবং বিস্তারের যুগে স্থিতিশীল হয়ে

এরা শিক্ষাব্যবস্থাকে তুলে দিল পুরোহিত শ্রেণীর উপর। ব্রহ্মজ্ঞানী এরা তাই ব্রাহ্মণ। এই পুরোহিত তথা ব্রাহ্মণশ্রেণী বিদ্যালয়-আশ্রম প্রতিষ্ঠা, পরিচালনা, বিশেষ করে ব্যয়ভার বহনের জন্য রাজাদের কাছ থেকে গ্রাম উপহার পেতেন। উপহার প্রাপ্ত বা দত্ত এই সব গ্রামকে বলা হতো অগ্রহার গ্রাম। শিক্ষার সমস্ত ব্যয়ভার গ্রহণ করতেন আশ্রমগুরু। তিনি এই সব গ্রামের মাঠে শস্য উৎপাদনের জন্য প্রথম যুগে ছাত্রদের (আরুণি তথা উদ্দালক-আয়োদধৌম্য কাহিনী স্মরণীয়) কাজে লাগাতেন। আরও পরবর্তীকালে বেতনভুক্ কৃষি-শ্রমিক অথবা সম্ভবত ভাগচাষী নিয়োগ করতেন। ভাগচাষীর সঙ্গে হয়তো রাজাদের হয়ে দাস/ ক্রীতদাসরাও এ কাজ করে দিত।

স্মৃতির যুগে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ছাড়াও ব্রাহ্মণকে ভূমিদান অত্যন্ত পবিত্র কর্তব্য বলে নির্ধারিত হয়েছিল। বিষ্ণুস্মৃতি বা বিষ্ণুসংহিতার মতে— ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ ভুবং প্রতিপাদয়েৎ ॥ ৩। ৫৭ ॥ অর্থাৎ রাজা ব্রাহ্মণদের ভূমিদান করবেন।

এইভাবে যে জমি ব্রাহ্মণের কুক্ষিগত হলো তাতে ফসল ফলাবে কে ? নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ নিজে নয়। এ ছাড়া বিভিন্ন বর্ণের মানুষের জন্য এযুগে কর্ম নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। ব্রাহ্মণ বেদপাঠ, যজন-যাজন অধ্যাপনা ; ক্ষত্রিয় যুদ্ধ-বিগ্রহ ; বৈশ্য পশুপালন ব্যবসা ও কৃষি কর্ম ; শূদ্র উচ্চ তিন বর্ণের দাসত্ব করবে। এই অবস্থায় ব্রাহ্মণ নিজের হাতে লাঙল ধরবে এ আশা করা বৃথা। এখানেই শেষ নয়। স্মৃতির যুগে কৃষিকে অত্যন্ত নিন্দনীয় কর্ম বলে নির্ধারিত করা হয়েছিল। এর প্রমাণ মিলবে মনুসংহিতার ১০। ৮৪ সংখ্যক শ্লোকে। সেখানে স্পষ্টতই বলা হয়েছে—'কৃষিং সাধ্বিতি মন্যতে সা বৃত্তিঃ সদ্বিগর্হিতা।' যদিও কেহ কেহ কৃষিজীবিকার প্রশংসা করিয়া থাকেন তথাপি ইহা সজ্জননিন্দিত।

ফসল না ফলালে চলবে না। অথচ কৃষিকর্ম বা কৃষিজীবিকা উচ্চবর্ণের পক্ষে নিন্দিত—এই সমাজমানসিকতা স্মৃতির যুগেই শেষ হয়ে যায় নি। বরং ব্যাপকতর হয়েছিল তার প্রমাণ আমার নিজের একটি বাল্য অভিজ্ঞতা।

আমার মাতুল বংশ প্রখ্যাত এক জমিদার বংশ। দাদামশাই তখনও জীবিত। একদিন কথাচ্ছলে তাঁকে জানিয়েছিলাম যে আমার জ্যাঠতুতো বড়দার বিয়ের কথাবার্তা চলছে তোমাদেরই পাশের গ্রামে। পরিবারটির পরিচয় পেয়েই বলে উঠলেন—ও বাড়িতে বিয়ে যদি হয় তবে বরযাত্রী যাওয়া বা আসার সময় তোরা কেউ আমার বাড়িতে উঠবি না। বললাম—কেন ? দাদুর উত্তর ওরা আবার

কায়েত নাকি ! ওরা তো 'থাপরাইনা' কায়েত। শব্দটার অর্থ না বুঝে বললাম—মানে ? 'মানে ওরা তো চাষা (আজও চাষা শব্দটি গালাগাল অর্থে ব্যবহৃত হয় শিক্ষাভিমানী সমাজে। কিন্তু চাষা চাষীকেই বুঝায়। এই গালির ভাষা-ই প্রমাণ করে আজও মনের অবচেতনে কি ভাবে ঐতিহ্য কাজ করে চলেছে)। সারাদিন মাঠে নিজেরা লাঙল চালায়। দিনের শেষে লাঙল জোয়াল কাঁধে গরু তাড়িয়ে বাড়ি ফেরে। তারপর এক থাবলা তেল গায়ে মাথায় থাপড়ে মেখে ঝুপ করে স্নান সেরে মুখে ভাত গুঁজে দেয়।'

আমরা কায়স্থ। এযুগের। এবার বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কেদাররাজা' থেকে কিছু শুনুন ঃ

গোপেশ্বর চাটুজ্জে বললেন, আচ্ছা রাজামশাই, ওই কালো পায়রা দীঘির ওপারের বন কেটে বেশ আলু হয়—কিছু বীজ এনে—

—না দাদা, ওসব আমাদের বংশে নেই। চাষকাজ করে চাষা লোকেরা। আমার দরকার হয় গড়ের জঙ্গল থেকে মেটে আলু তুলে আনবো।

কেদার রাজা ব্রাহ্মণ জমিদার বংশের হৃত-দরিদ্র মানুষ। আমার দাদামশাই কায়স্থ জমিদার হলেও অর্থনৈতিক দিক থেকে একই ছিলেন, যখনকার কথা বললাম। অথচ দুজনের মনই স্মৃতি-শাসিত মানসিকতাপুষ্ট চাষ-প্রসঙ্গে।

কেবল এঁরাই নন। এঁদের পুত্র কন্যাদের মধ্যেও এই বিষয় অন্যভাবে প্রবেশ করেছিল। কায়িক পরিশ্রম সম্বন্ধে এঁদের শ্রেণী-সচেতনতা কোন পর্যায়ে পেঁছিতে পারে তার উদাহরণ দিচ্ছি আমার অন্য একটি বাল্যস্মৃতি থেকে।

গরিব হলেও সুন্দরী বলে, উচ্চ জমিদার বংশে জন্ম। তাই আমার ছোটমাসির বিয়ে হয়েছে সবে এমন এক পরিবাররে যাঁদের একজন ছিলেন ভারত বিখ্যাত পন্ডিত। সবে বিয়ে হয়েছে মাসির। দাদামশাই আর বাবা আমাদের নিয়ে মাসিকে আনতে গেলেন মাসির শ্বশুর বাড়ি।

সেখানে মাসির বড় জা আমাকে আদর করে কাছে ডেকে আমাদের পরিবারের খোঁজ খবর নিচ্ছিলেন। জানতে চাইলেন, আমার মা তো চিররুগ্না ! বাড়িতে ঝি আছে ? 'না'। 'তবে এঁটো বাসনপত্র মেজে দেয় কে ?' আমি বললাম, 'কেন ? আমরাই।' ঠিক সেই সময় আমার ছোটমাসি, ও বাড়ির নতুন বউ যাচ্ছিলেন পাশ দিয়ে । তখন কিছু বললেন না। নৌকোতে এসে পড়লেন আমাকে নিয়ে। কেন আমি বললাম না যে আমাদের বাসন মাজার ঝি আছে। আমি তো হতবাক।

মিথ্যে কথা বলবো ? (একটু অপ্রাসঙ্গিক হলেও এখানে বললাম)।

এই সমাজ মানসিকতা সৃষ্টির জন্য দায়ী রাজতন্ত্র এবং স্মৃতির বিধান-কারী পৌরোহিত্যের কূটকৌশল। যে শ্রমজীবী দাস শ্রেণীর মানুষ বন জঙ্গল কেটে নিজেদের ঘাম আর রক্তের বিনিময়ে জমিকে আবাদযোগ্য করে তুললো, ফসল ফলালো, ফলিয়ে চলেছে আজও, জমির মালিক তারা হলো না—হোলো রাজা। দান সূত্রে পেলো ব্রাহ্মণ। উৎপন্ন ফসল তার নয়, যে বহুদিনের trial and error পদ্ধতিতে প্রকৃতির স্বাভাবিক দান দানাশস্য শাকসব্জীকে কৃষির আওতায় আনলো, জমি আর ফসলের—উভয়েরই মান উন্নত করলো। স্বত্বভোগী হলে উচ্চবর্ণের মানুষ। এই বেদনা, এই যন্ত্রনাই সৃষ্টি করলো অবহেলিত, উচ্চবর্ণের মানুষের উচ্ছিষ্টান্নে ধুঁকে ধুঁকে প্রাণকে টিকিয়ে রাখা, ক্লান্ত জীবনকে ঠেলে চলা শ্রমজীবী নিম্নবর্ণের মানুষের মনে। রাজতন্ত্রের পৃষ্ঠপোষকতায়। দাসত্ব প্রথা চলছিল দুর্বার, অ-নিবার্য, অপ্রতিহত গতিতে। তারই প্রবল স্রোতে ভেসে যেতে থাকলো প্রকৃত কৃষক। বিদ্রোহ ঘোষণার (যা পরবর্তীকালে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষক-বিদ্রোহের রূপ নিয়েছিল) উপায় বা মানসিকতা ছিল না সেই সমাজ-কাঠামোতে। তাই সে ধরলো ভিন্নতর পন্থা। মালিকের অবর্তমানে কাজ না করার কৌশল। হয়তো কোনো অঞ্চল বিশেষের দাস-কৃষাণের দল সম্মিলিত সিদ্ধান্ত নিল—মালিকের তদারকির নামে অত্যাচারের চাবুক একটু ঢিলে পড়লেই লাঙল বন্ধ করায়। গ্রামকেন্দ্রিক সমাজ ব্যবস্থায় বঞ্চিত সব অঞ্চলের মানুষই এই নীরব-বিদ্রোহকে স্বাগত জানালো। প্রতিবাদের উপায় ?—বামুন গেল ঘর তো লাঙল তুলে ধর।

বঞ্চিত মানুষের জীবন–অভিজ্ঞতার তিক্ততার ফসল মানুষকে শেখালো কেমন করে শোষণকারীকে বঞ্চনা করতে হয়। ফলে একটা যুগের পর কৃষির আর উন্নতি ঘটলো না। যে ভারত প্রাগ্‌বৈদিক যুগ থেকে এক কালে বহির্বিশ্বে খাদ্য ও কৃষি-উৎপাদন রফতানি করতো, তার নিজের ক্ষুধার অন্নে ধরলো টান। জনসংখ্যা বাড়লো, সমহারে উৎপাদন বাড়লো না। ফল দাঁড়ালো উচ্চবর্ণের মানুষের গোয়াল ভরা গরু, পুকুর ভরা মাছ, গোলাভরা ধান। তারা শিশুকে ঘুম পাড়াবার জন্য ছড়া তৈরী করলো—আয় চাঁদ নড়িয়ে / দুধ দেবো বাড়িয়ে…। অন্যদিকে ঈশ্বরী পাটনির মত শ্রমজীবী মানুষের দেবতার কাছে, অন্নদার (দেবীর নাম নির্বাচন লক্ষণীয়—অন্ন-দা ; মানুষের অন্ন আসে দেবতার দানে। কৃষকের

পরিশ্রমের কোনো মূল্য বা স্বীকৃতি নেই দেবী-কল্পনায়) কাছে—আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে। কারণ, তার ক্ষেতও নেই, গরুও নেই দুধ দেবার মত। তারা তো ব্রাহ্মণ তথা উচ্চবর্ণের মানুষের কুক্ষিগত! উচ্চবর্ণের মানুষের দয়ার দানে ধুঁকে ধুঁকে বেঁচে আছে এই শ্রমজীবীর দল! তাই দৈব-আশীর্বাদ ছাড়া সুস্থভাবে বাঁচার পথ খুঁজে পায়নি ঈশ্বরী পাটনি বা শরৎচন্দ্রের মহেশ গল্পের গফুরের দল। তাই অন্নদা বা অল্লার দরবারে সুবিচার ভিক্ষা। মানুষ যদি তার ভাই, মানুষের জন্য ন্যায়-বিচার না করে তবে দেববাদ নির্ভর সমাজ ব্যবস্থায় এ ছাড়া ঈশ্বরী পাটনিরা কি করতে পারে সে যুগে।

জীবিকাকে কেন্দ্র করে বঞ্চনার যে সূত্রপাত ঘটলো, আজ তা সমাজের প্রতি স্তরে। আজ যে দিকেই তাকানো যায়, সেখানেই এই প্রবাদচিত্র—বামুন গেল ঘর তো লাঙল তুলে ধর। অনুষঙ্গ বদলে গ্রাম বা শহর সর্বত্রই প্রবাদটি ব্যবহৃত হচ্ছে ব্যাপকতর অর্থে। কিন্তু ভুলে গেছি উৎসকে। যে ব্রাহ্মণের কাজ মূলত পৌরোহিত্য অর্থাৎ মানুষের মঙ্গলবিধান করা, সে যদি স্মৃতির অনুশাসন পুষ্ট মন নিয়ে নব নব বর্ণাশ্রমের সৃষ্টি করে চলে রাজতন্ত্র এবং উচ্চশ্রেণীর মুখের দিকে লক্ষ্য রেখে, ভূমি-আগ্রাসনের অসদিচ্ছাকে শাস্ত্রাচার বলে গ্রহণ করতে বাধ্য করে সমাজকে, তখন কিন্তু সে আর ব্রাহ্মণ নয়। শ্রমজীবী মানুষের কাছে বামুন হয়ে যায়। প্রবাদে এই মানসিকতারই প্রতিফলন ঘটেছে।

প্রবাদটির জন্ম কবে? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে এর ভাষা বিশ্লেষণ অপরিহার্য হয়ে ওঠে। সেদিক থেকে দেখা যায়, এর প্রতিটি শব্দই তদ্ভব এবং আধুনিক মৌখিক ভাষায় প্রচলিত। এই নিরিখে বিচার করলে একে আধুনিক-কালে সৃষ্ট বলে মনে হবে। কিন্তু সেভাবে দেখলে সিদ্ধান্তে ভ্রান্তি আসার সম্ভাবনা থাকে। কারণ মৌখিকভাষা যুগোপযোগী রূপান্তর অত্যন্ত সাধারণ এবং স্বাভাবিক ভাবেই গ্রহণ করে। তাই সেদিক থেকে না দেখে একটি বিশেষ শব্দ 'বামুন-'এর দিকে লক্ষ রাখাই সমীচীন বলে মনে হয়। আগেই বলেছি এ যুগে জমির মালিকানায় ব্রাহ্মণেতর বর্ণের অনেক মানুষ এসেছে। সেক্ষেত্রেও কিন্তু কায়েত বা অন্য কোনো বর্ণনির্দেশক শব্দ বামুন শব্দটিকে স্থানচ্যুত করতে পারে নি। তাই আমাদের সিদ্ধান্ত, যে যুগে জমির মালিকানা কেবল ব্রাহ্মণেরই ছিল, প্রবাদটির সৃষ্টি-চিন্তার উৎস তখনই।

প্রবাদ বহু মানুষের জীবন-অভিজ্ঞতার এবং ব্যক্তিবিশেষের বৈদগ্ধ্যের ফসল।

যাঁর বৈদগ্ধ্য এই প্রবাদটি সৃষ্টি করেছিল, নির্ব্বিধায় বলি তিনি শ্রমজীবী মানুষের দরদী বন্ধু।

আমি নিজে প্রবাদটির প্রথম ব্যবহার শুনি দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায়। এখানে লেখাপড়া থেকে শুরু করে, যে কোনো রকম কাজে অবহেলা দেখলেই লোকে প্রবাদটির ব্যবহার করে। কেন যে প্রবাদটি এই অঞ্চলের মানুষের মুখে মুখে ফেরে, তা মনে হতেই চিন্তার মোড় ঘুরে গেল। এখানকার জন-বিন্যাসের ইতিহাসের দিকে। বন হাসিল করে সুন্দরবনের বিরাট অংশে যারা শস্যক্ষেত্র করেছেন তারা দু'টি শ্রেণীতে বিভক্ত, আলোচ্য প্রবাদের জন্ম-যুগেরই মত। যারা মালিক তারা এনেছেন শ্রমিক শ্রেণীকে বাংলার বা বাইরের অন্যান্য প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে। কালে কালে মিশ্র-সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। এই সংস্কৃতি-সমন্বয়ের, শোষণের যুগে, শ্রমজীবী মানুষের ব্যথার প্রকাশে যে বক্তব্য ছিল মুখর, তাকে মালিকপক্ষ ব্যবহার করতে শুরু করলো শ্লেষাত্মক, বিদ্রূপাত্মক নতুন অনুষঙ্গে। অর্থান্তর ঘটলো প্রবাদটির ব্যবহারিক অনুসঙ্গে। উৎস-পটভূমি হলো অতীতের বিস্তৃত ইতিহাস।

সাধারণ মানুষ ভুললেও, ভুলতে পারে না সেই কৃষিশ্রমিকের দল, যারা মালিকের জন্য ফসল ফলিয়েছে কখনও কৃষিশ্রমিক, আবার কখনো ভাগচাষী হিসাবে। বিনিময়ে যা পেয়েছে তাতে গ্রাসাচ্ছাদনই হয় না। তাই, যে বেদনা একদিন প্রকাশ পেয়েছিল প্রবাদের ভাষায়, তাই বিস্ফোরক হয়ে রূপ নিল তে-ভাগা আন্দোলনের কৃষক বিদ্রোহে। কিন্তু সে বিদ্রোহের পরিণতি কি তা আমরা জানি। নিজের ন্যায্য পাওনা থেকে যখন কোনো মানুষ বঞ্চিত হয়, বঞ্চনার প্রতিবাদে যখন মেলে লাঞ্ছনা, তখনই লাঙল তুলে ধরে প্রতিশোধ গ্রহণের চেষ্টা করে মালিকের অগোচরে। ফল হয় সুদূর প্রসারী। জাতীয় জীবনে বেড়ে যায় ফাঁকি দেবার প্রবণতা। এ প্রবণতা বেড়ে কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে, তা আজ আমরা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছি।

প্রবাদ পৃথিবীর সব ভাষাতেই আছে। তাদের সৃষ্টির ইতিহাসও আছে। কালে কালে সামাজিক বিবর্তনে তাদের রূপান্তর, অর্থান্তরও ঘটে। তবু সচেতন মানুষ যদি এর উৎস-চিন্তা করেন, তবে সমাজ ইতিহাসের অনেক অলিখিত অধ্যায়ের সামনে দীর্ঘদিনের টেনে দেওয়া যবনিকা সরে যেতে পারে।

আলোচ্য প্রবাদের যবনিকা উঠে গেলে যে চিত্র স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়, তা

হলো, অকর্ষিত ভূমি কর্ষণযোগ্য করে তুললো সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণী। কর্ষণের জন্য নির্দিষ্ট ভূমির অপাত্রে ন্যস্তীকরণ বর্ণাশ্রম প্রথানির্দিষ্ট শ্রেণীবিভক্ত ভারতীয় সমাজে এনেছে যে অসন্তোষ, তা যখন প্রবাদবাক্যের ফ্রেমে বাঙ্ময় চিত্র হলো, তখন তা কেবল অর্থনৈতিক বৈষম্যজনিত উষ্মারই বহিঃপ্রকাশ হলো না, সামাজিক বিচারে শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত ব্রাহ্মণশ্রেণী বঞ্চিত কৃষিজীবী জনগোষ্ঠীর চোখে অবজ্ঞার পাত্ররূপে চিত্রিত হলো এই প্রসঙ্গে। মানুষকে অবজ্ঞা করতে শেখায় যে ঘটনা, তা সমাজের এক কলঙ্কিত অধ্যায় হিসাবেই চিহ্নিত হওয়া উচিত।

বাংলাভাষায় বহু প্রবাদের ব্যবহারে আছে, অতীত সমাজের শিলীভূত সাক্ষী। কিন্তু আলোচ্য প্রবাদটির মত বঞ্চিত মানুষের বেদনা ও যন্ত্রণার যুগপৎ বাঙ্ময় রূপ খুব কম প্রবাদেই পাওয়া যাবে।

তুলসীবনের বাঘ

'দুই বিঘা জমি'র একদা-মালিক উপেনকে কাহিনীর শেষে জমিদার বলেছিলেন, 'বেটা সাধুবেশে পাকা চোর অতিশয়।' রবীন্দ্র-সমকালীন জমিদার-শ্রেণীকে নব্যশিক্ষার আলোকে আংশিক আলোকিত বলা যেতে পারে; অন্তত, ভাষা ব্যবহারের দিক থেকে। তাই উপেনকে সাধুবেশী দুর্বৃত্ত দেখে (!) সোজাসুজি উপরিউক্ত বক্তব্য স্পষ্ট ভাষায় রাখেন জমিদার।

কিন্তু মধ্যযুগীয় বাংলা গদ্য বা পদ্য উভয় শাখাতেই কোনো কোনো ক্ষেত্রে একই বক্তব্য প্রকাশ করতে গিয়ে যে প্রবচনটির ব্যবহার লক্ষ করা যায় তা হল 'তুলসীবনের বাঘ।'

প্রবচনটি শোনার সঙ্গে সঙ্গেই যে প্রশ্ন মনের কোণে উঁকি ঝুঁকি মারে তা হলো, বহিরঙ্গে সাধু, অন্তরঙ্গে দুর্বৃত্ত, এমন চরিত্রের সঙ্গে তুলসী নামীয় গুল্ম এবং ব্যাঘ্র নামীয় হিংস্র প্রাণীটির, কোন দিককে লক্ষ্য রেখে বাংলা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী এই প্রবচনের জন্ম দিয়েছিল? কথাগুলো মনে আসতেই আমার ছোটবেলার একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল।

গ্রামের বাজার। বসতো দুপুরে। চাষীরা সকালে চাষের কাজ সেরে শাক-সব্জী দুধ নিয়ে আসতেন। জেলেদেরও ধরা মাছ খাল বিল নদীর পাড় থেকে আনতে দেরি হয়ে যেত। তাই গ্রামের বাজার দুপুরে বসারই প্রথা। অন্তত এককালে ছিল দেখেছি।

বাজারে ছিল অন্যান্যদের মধ্যে ত্রিলোচন সাহার মুদিখানা, ঠিক মাছের বাজারের গায়েই। এ পাশে, মুখোমুখী ছিল বিরাট আড়ৎ। জমিদারবাবু লেঠেলির সঙ্গে ব্যবসাও চালাতেন; নইলে সংসার চলত না।

মাছের বাজারে ঢুকেছি। এমন সময় দেখলাম নিজের আড়ৎ ছেড়ে জমিদার-বাবু ঢুকেছেন ত্রিলোচনের দোকানে। চীৎকার করে বলছেন (ঘটনাটি ঢাকার

এক গ্রামের), 'তিলচুইন্যা রে ! তর গায় লাত্থিটা মারুম কুথায় ? যেইখ্যানে মারুম, পোরবো গিয়্যা কিষ্কের গায় !'

দোকানের সামনে কৌতূহলী জনতার ভিড়। শুনলাম, এবং সেই ছোটবেলার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় জেনেছিলাম ত্রিলোচন সাহা কোনো দিন কাউকে সওদা ওজন করতে গিয়ে, এক সেরে চৌদ্দ ছটাকের বেশি দেন নি। কিন্তু তার ওজনের কৌশল এমন অপূর্ব ছিল যে, সামনে দাঁড়িয়ে থেকেও, ওজনে কম দিচ্ছেন এটা ধরবার ক্ষমতা কারোই প্রায় ছিল না।

সেদিন এমনি এক খদ্দের সন্দেহ নিরসনের জন্য এখান থেকে কেনা তেল অন্য দোকানে ওজন করাতেই ব্যাপারটা ধরা পড়ে। তার পরের ঘটনাগুলি—জমিদারের কাছে নালিশ, জমিদারের প্রতিক্রিয়া, উপরিউক্ত মন্তব্য, ত্রিলোচনের বিনয় প্রকাশ ইত্যাদি।

ত্রিলোচন সাহাকে ভালো লাগত। দোকানে যেখানে বসে এই প্রৌঢ় ওজনদাড়ি ব্যবহার করে ব্যবসা চালাতেন, ঠিক তার মাথার ওপরে দেওয়ালের গায়ে বিরাট আকৃতির বাঁধানো ফটো—উদ্বাহু নিতাই গৌর সপার্ষদ হরিনাম বিতরণের জন্য রাজপথে বেরিয়েছেন।

ঠিক তারই নীচে দীর্ঘশিখ, গলায় তুলসীর কণ্ঠি, আজানুলম্বিত বস্ত্রাচ্ছাদিত দেহের নিম্নদেশ বাদ দিয়ে, নগ্ন ঊর্ধাঙ্গের সর্বত্র রসকলি, ফোঁটা এবং ইষ্ট নামের শ্বেতচন্দনের ছাপ। মুখে 'পথের পাঁচালী'র 'পিতম'-কাঁসারীর মত 'রাধারাণী'র নাম—ত্রিলোচন সাহা বসে বাণিজ্য করছেন।

তখন যে বয়স, সে বয়সে 'তুলসীবনের বাঘ', কথাটি শুনিনি। শুনলে হয়তো ত্রিলোচন যাহাকে চিনতে ভুল হত না।

ত্রিলোচন জাতীয় ভক্তের সঙ্গে তুলসীনামীয় গুল্মটি ধর্মীয় সংস্কারেই জড়িয়ে গেছে। হিন্দু, বিশেষ করে বৈষ্ণবদের কাছে তুলসী অতি পবিত্র বৃক্ষবিশেষ। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের মতে 'নরাঃ নার্যশ্চ তাং (তুলসীং) দৃষ্টা তুলনাং দাতুমক্ষমাঃ।' এটা পুরাবিদ্দের মত। তুলসী কৃষ্ণের প্রিয়া গোপিনী বিশেষ, নারায়ণরূপী কৃষ্ণ তুলসীকে বক্ষে ধারণ করেন। বৈষ্ণবরা তুলসী কাঠের মালা ধারণ করেন কন্ঠে। বৈষ্ণবীয় মতে দেবতার প্রতিটি ভোগের উপরই তুলসীপত্র দেওয়ার বিধি। ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গলে দেখা যায় পাত্রপাত্রীর বিবাহের পাকা কথা যখন বলেন, তখন অভিভাবকরা তুলসীপত্র গ্রহণ বিনিময় করেন। প্রতিটি

হিন্দুই শ্মশানের মাটিতে তুলসীবৃক্ষ রোপন করেন, যেমন মৃতের চোখের উপরে, কন্ঠদেশে রাখেন তুলসীপাতা।

শুধু এদেশে নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তুলসীকেন্দ্রিক আচরণ এদেশের হিন্দুদের মতই। প্রাচীন গ্রীসে তুলসী রাজকীয় উৎসবে ব্যবহৃত হত। বিবাহে বরের বন্ধুরা কনের হাতে, উপহার হিসাবে অন্যান্য জিনিষের সঙ্গে তুলসী দেন। ক্ষেমানন্দীয় তুলসীপত্র বিষয়ক আচরণ ওদেশেও আছে। মোল্ডাভিয়াতে প্রেমিকা তরুণী প্রেমিকের বাউন্ডুলে জীবনের অবসানকল্পে তার হাতে সমঞ্জরী তুলসী তুলে দেয়, যেমনটি এখানেও বিষ্ণু আরাধনায় সমঞ্জরী তুলসীদানের বিধি। অঞ্চল বিশেষে এটি রান্নায় ব্যবহৃত হয়। এর রস মস্তিষ্কের, হৃদ্যন্ত্রের পক্ষে উপকারী। স্ত্রীরোগে, পুরুষের পুরুষত্ব বৃদ্ধিতে, সন্তান ধারণে, সুপ্রসবে তুলসীর যে ভেষজগুণ মানুষ আবিষ্কার করতে পেরেছিল, তাই দিয়েই প্রাচীন মধ্য-প্রাচ্য, ভারত এবং ইউরোপ একসময়ে এই গুল্মটিকে শ্রদ্ধার আসনে বসিয়েছিল। পুরাবিদ্‌রা এ সংবাদ ভালভাবেই জানতেন। ভারতীয় বৈষ্ণব তথা হিন্দুধর্ম মূলত প্রেমে বিশ্বাসী। এবং সে প্রেমও মূলত জৈব-মানসিক সৃষ্টিকেন্দ্রিক বলেই তুলসীকে ধর্মীয় চেতনায় চিন্তায় প্রেমের মূর্ত প্রতীক হিসাবে চিহ্নিত করেছিল—আজও পূর্বসংস্কার বশত করে। কিন্তু দুঃখের সঙ্গেই বলতে হয় যে, সুস্থ সমাজ গঠনে, নীরোগ বলিষ্ঠ মানুষ সৃষ্টির অদম্য আকাঙ্ক্ষা বুকে নিয়ে, মানব সভ্যতা পার্থিব বিভিন্ন বস্তুতে যে ভেষজগুণ আবিষ্কার করতে পেরেছিল এবং করেছিল, প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের পৌরোহিত্য যখন সেগুলিকে কেন্দ্র করে পুরাণ কাহিনী গড়ে তুলে তাকে দেব-মহিমার সঙ্গে যুক্ত করে দিল, তখন মূল উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য থেকে মানুষের দৃষ্টি সরে এল। বাস্তব জীবন-দৃষ্টির ক্ষেত্রে এলো বিপর্যয়। পরবর্তী যুগে বিস্মৃত-মূল হয়ে তারা হলো লোকসংস্কারের পর্যায়ভুক্ত। রাজ-পুরোহিত-তন্ত্রের উদ্দেশ্য সফল হলো।

বস্তুমুখী মনকে দেবানুগ্রহমুখী করে সাধারণ মানুষকে ধর্মের নামে দুর্বল করে দেওয়ার এক কৌশল আবিষ্কৃত হলো। এরই সুযোগ নিয়ে ধীরে ধীরে ঢুকতে থাকল ধর্মীয় ব্যভিচার।

এই সত্যকে উপলব্ধি করেই প্রথমে কোন্ মানবদরদী মানুষের মুখ থেকে প্রথমে 'তুলসী বনের বাঘ'—এই কথা ক'টি উচ্চারিত হয়েছিল তা আজ আর

জানবার উপায় না থাকলেও, একথা সত্য যে, অত্যাচারক্লিষ্ট বাংলা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী যে কথা পীনদ্ধ করে বলবার জন্য উৎকণ্ঠ ছিল, তাকেই প্রথম-উচ্চারণ-কারী সার্থক বাঙ্ময় রূপ দিল। জনসমাজও তাকে সাদরে নিজেদের বাগ্‌ভঙ্গিতে স্থান দিল। 'তুলসীবনের বাঘ'-এর ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায় শিবরতন মিত্রের Types of Early Bengali Prose-এ এবং অমূল্যরতন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশিত (১৩২২) বাইশ কবি মনসা-গ্রন্থে (বঙ্গীয় শব্দকোষ দ্রষ্টব্য)। অর্থাৎ মধ্য-যুগের বাঙালী সমাজ-পটভূমিতে কি ধর্মীয়, কি সাংস্কৃতিক, কি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে স্বার্থলোলুপতা, অত্যাচারের রূপ দেখেছিল তারই প্রকাশ করতে গিয়ে বৈষ্ণবদের অতি পবিত্র একটি পত্র—তুলসীকে টেনে আনল কেন—এ প্রশ্ন মনে আসা অসমীচীন নয়।

মধ্যযুগের বাংলার শাসক গোষ্ঠীর অনেকেই বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে অস্থিরতা, তার সাক্ষী সমকালের ইতিহাস। শাসনের নামে শোষণ, এবং অরাজকতা দমনে ব্যর্থ-শাসককুলের এই-ই তখনকার পরিচয়। এ ছাড়া, ধর্মীয় চিন্তা এবং আচার আচরণের ক্ষেত্রে যে অনাচার ও ব্যভিচার সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকেছিল তার চিত্র ছড়িয়ে আছে শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব গ্রন্থসমূহের অনেকগুলিতে। বিশেষ করে বৈষ্ণবধর্মের মূলে মানবপ্রেমের যে উদারতা ছিল তার মধ্যে ঢুকল ব্যভিচার। শাসক গোষ্ঠীও যখন সেই ব্যভিচারের স্রোতকে রোধ করার চেষ্টা না করে, সেই স্রোতেই গা ভাসিয়ে দিল, তখন সাধারণ মানুষ তার মধ্যে যেন দেখতে পেল হিংস্রতার চিত্র। টেনে আনল বাঘের চিত্রকল্পকে।

বাঘ শব্দটি প্রসঙ্গে মনে পড়ে একটি কথা। বাঘ বা ব্যাঘ্র শব্দের ব্যুৎপত্তি-গত অর্থের মধ্যে আছে এর তীক্ষ্ন ঘ্রাণশক্তির অধিকারিত্বের কথা। বিশেষ রূপে ঘ্রাণ লওয়ার ক্ষমতা আছে যে প্রাণীর তা-ই ব্যঘ্র বা বাঘ। বাঙালী যে বাঘের সঙ্গে পরিচিতি তার গায়ে ডোরা কাটা। ইংরেজীতে যাকে tiger বলে, সেই প্রাণীটির ঘ্রাণশক্তি কিন্তু অত্যন্ত দুর্বল; বলেছেন ব্যঘ্র-বিশেষজ্ঞ জিম করবেট তার ব্যঘ্রসম্পর্কিত একাধিক লেখায়। বাংলার পরিচিত বাঘও এর ব্যতিক্রম নয়। তাহলে কোন্ প্রাণীকে ব্যাঘ্র বলা হত প্রাচীনকালে?

এ কালে দুর্গা সিংহবাহিনী হয়েছেন। কিন্তু ব্যাঘ্রবাহনা দেবীমূর্তি অপ্রতুল নয়। এককালে দুর্গার মনুষ্য মুখাকৃতি ছিল না। তিনি ছিলেন কোকামুখী। সংস্কৃত কোক শব্দের অর্থ ব্যাঘ্রের আকৃতি বিশিষ্ট বন্যকুকুর। বন্যকুকুরেরই

প্রাণীজগতে ঘ্রাণশক্তি তীব্রতম। এরা হিংস্রতমও বটে। ব্যাঘ্র বলতে এককালে (ব্যুৎপত্তিগত অর্থের যুগে) এই ডোরাকাটা অরণ্য-শ্বাকেই বোঝাত।

তুলসীর ঘ্রাণ হৃদযন্ত্র ও মস্তিষ্কের পক্ষে উপকারী। এ বক্তব্য চিকিৎসা-শাস্ত্রের। তীক্ষ্ম ঘ্রাণশক্তির অধিকার নিয়ে, কৃষ্ণনামের নামাবলীর মত ডোরা-কাটা আচ্ছাদনে দেহকে আচ্ছাদিত করেও বাঘ (অরণ্য কুকুর) নিজের হৃদয়-বৃত্তির প্রসারতা ঘটাতে পারেনি। বরং মস্তিষ্ককে উন্নত করে মধ্যযুগীয় রাজতন্ত্র এবং ব্যাভিচারী ধার্মিকরূপী বাঘ, মানুষের ওপর যে অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অত্যাচার চালিয়েছিল—তারই কুটিল চরিত্রকে সুসংহত করে দু'টিমাত্র শব্দের প্রবচন তৈরি হয়েছে—তুলসীবনের বাঘ।

যিনিই এই প্রবচনটি প্রথম উচ্চারণ করে থাকুন, স্বীকার করতেই হবে যে তুলসী সম্পর্কিত বিভিন্ন ভেষজ-ব্যবহার এবং ধর্মীয় উপাখ্যান সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। বাঘের অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ পরিচয়ও তার অজানা ছিল না। এক কথায় প্রকৃতি-বীক্ষণ-এর সুন্দর পরিচয় ছড়িয়ে আছে এই প্রবনচনটিতে। প্রবচনের শেষ শব্দটি ব্যবহারে শোষক শ্রেণীর, অত্যাচারীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের নিখুঁত পরিচয় আছে।

প্রবচনটি প্রসঙ্গে মনে হয় আরও একটি কথা। জীবন সংগ্রামে অভ্যস্ত প্রতিটি মানুষই তুলসীর মত ভেষজগুণ সম্পন্ন। কল্যাণকামী শ্রমজীবী-মানুষের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা কি পারবে না তাদের মধ্যে মিশে-থাকা নামাবলী আচ্ছাদিত বাঘকে চিহ্নিত করতে? তাড়াতে পারবে না বৃহত্তর মানব সমাজের তুলসীবন থেকে?

বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা

লক্ষ্মণের বাণে নাক কান কাটা যাওয়ার পর—
সূর্পণখা যায় খরদূষণের পাশে।
নাকে হাত দিয়া কান্দে রক্তে গাত্র ভাসে॥
কহে খরদূষণ রাক্ষস সেনাপতি।
কোন বেটা করে হেন ভগিনীদুর্গতি॥
এ দেখি বাঘের ঘরে ঘোঘের বসতি।
মরিবার ঔষধ কে বান্ধিল দুর্মতি॥
খরদূষণের থাবা যমের সমান।
যোদ্ধা চৌদ্দ হাজার যাহার বলবান॥
রাবণেরে নাহি মানে আমারে না জানে।
মরিবার উপায় সৃজিল কোন জনে॥

এ বর্ণনা কৃত্তিবাসী রামায়ণের। পঞ্চদশ শতকের এ লেখায় বাঘের ঘরে ঘোঘের বসতি—প্রবচনটি ব্যবহৃত হয়েছে খরদূষণের আস্ফালন প্রকাশ প্রসঙ্গে।

দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী' নাটকের তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কের কিছু সংলাপ এইরকম—

নিম। গোকুলো ব্যাটা ভারি পাজি।

অটল। আমায় কাঞ্চনকে ছেড়ে দিতে বলেন।

নিম। তুই কেন বললি নে, তোমার মাগটিকে দাও, কাঞ্চনকে ছেড়ে দিচ্ছি।

অটল। আমি তা বলতেম, কেবল বাবা ছিলেন বলে রেয়াৎ করিছি, বাবা আবার অসভ্য ভাববেন।

নিম। গোকুলের মাগকে দেখেছিস ?

অটল। এমন সুন্দরী তুই কখন দেখিসনি, ঠিক যেন ইহুদীর মেয়ে। তোমার রীত খারাপ বলে আমার সমুখে আসে না, তা নইলে গোকুলের মাতায় হাত বুলাতেম।

নিম। বয়স কত ?

অটল। সতের কি আঠার, আমার স্ত্রীর চাইতে মাস কতকের বড়।

নিম। সুড়ঙ্গ কাটতে পাল্লে ব্যাটার বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা করি।

অটল। গোকুলবাবুর মাগ যদি বেরয়ে আসে, তাহ'লে আমি কাঞ্চনকে ছেড়ে দিই।

সুড়ঙ্গ কেমন করে কাটা হয়েছিল, পরিণতি কি হয়েছিল, দীনবন্ধুর রসিক পাঠক মাত্রেই সে ব্যাপারে অবহিত আছেন। তবু, নিমচাঁদ এবং অটলবিহারী 'বাঘের ঘয়ে ঘোঘের বাসা' করতে চায়।

'জামাই বারিক' প্রহসনে দীনবন্ধু এই একই প্রবচনকে ব্যবহার করেছেন সম্পূর্ণ অন্য পরিবেশে দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্কে—

দুই স্ত্রী বগলা এবং বিন্দুবাসিনীর পতিপ্রেমের আতিশয্যে, তারা ঘুমিয়ে না পড়লে পদ্মলোচন বাড়িতে ঢোকে না। এমনি একদিনে দুজনেই জেগে ঘুমুচ্ছে। চুরির আশায় চোর ঢুকলে তার প্রতি দুই সতীনের পতিদেবতা-ভ্রমে আচরণ যখন শেষ পর্যায়ে, তখন বাড়িতে ঢুকে—

পদ্মলোচন। তোরা ভাতার গড়িয়ে ঝগড়া কচ্ছিস নাকি ?

বগলা। এতক্ষণ কোথায় ছিলে, এমন ঝাঁটাগুলো বৃথা গেল। এমন জোরের কীলগুলো বাজে খরচ হয়ে গেল।

পদ্ম। তুই ব্যাটা কে রে !

বিন্দু। চোর, চুরি করতে এয়েছে, টিপি টিপি বগীর ঘরে যাচ্ছিল, আমি বলি, তুমি যাচ্ছ, গলায় গামছা দিয়ে তাই মারতে লাগলেম, তারপর বগী এসে যোগ দিলে।

পদ্ম। ওরে ব্যাটা সিঁদেল চোর, আমার ঘরে এয়েচ চুরি কত্তে ; বাঘের ঘরে ঘোঘের বাসা রা হারামজাদা ! চল, ব্যাটা চল, তোকে পুলিশে দেব।

চোর। মশাই গো, পুলিশে দেবেন না, একদিনের মার বাঁচিয়ে দিলেম।

পদ্ম। তুই ব্যাটা চোর ত ?

চোর। আমি চোর, না তুমি চোর ?

পদ্ম। আমি হলেম কিসে ?

চোর। তা নইলে সাত চোরের মার হজম কর কেমন ক'রে ?

পদ্ম। এ কথা তুমি বলতে পার।

গৃহস্বামী-পদ্মালোচন নিঃসন্দেহে চোরের কাছে বাঘ। সেই ব্যাঘ্রসদৃশ পদ্মলোচন চোরকে বলছে 'ঘোগ'। কিন্তু পরবর্তী আলাপ-আলোচনায় প্রমাণিত হয়েছে, সে যতখানি আস্ফালন করছে বাস্তব অবস্থা মোটেই তার উপযুক্ত নয়।

শরৎচন্দ্রের 'বামুনের মেয়ে'র-পরিচয় নতুন করে দেবার প্রয়োজন আছে বলে মনে করিনা। ঐ কাহিনীর 'শিরোমণি' গোলোক চাটুয্যে কেমন করে শ্যালিকা জ্ঞানদার সর্বনাশ করে তাকে পঞ্চাশ টাকা হাতে ধরিয়ে দিয়ে অন্ধকারের মুখে ঠেলে দিয়েছিলেন, তা পাঠকের সুবিদিত। সেই সুবিদিত কাহিনীর কিছু অংশ এখানে তুলে ধরছি।—

রাসমণি ললাটে একটুখানি করাঘাত করিয়া বলিলেন, তুমি বাঁচাও তো ভয় নেই সত্যি, কিন্তু সর্বনাশী যে এদিকে সর্বনাশ করে করে বসেছে। এখন তার মত একটু ওষুধ দিয়ে উদ্ধার না করলে যে কুলে কালি পড়বার জো হ'লো বাবা।

প্রিয়নাথকে তিনি ঘরের একধারে টানিয়া লইয়া গিয়া কানে কানে গুটি কয়েক কথা বলিতেই সে চমকাইয়া উঠিয়া কহিল, বল কি মাসী ? জ্ঞানদা—?

মাসী কহিলেন, কি আর বলব বাবা, কপালের লেখা কে খণ্ডাবে বল ? এখন দাও একটু ওষুধ পিওনাথ, যাতে গোলোক চাটুয্যের মাথা নীচু না হয়। একটা দেশের মাথা, সমাজের শিরোমণি। পুরুষ মানুষ—তার দোষ কি বাবা ? কিন্তু তার ঘরে এসে তুই ছুঁড়ি কি ঢলাঢলিটা করলি বল্ দিকি ?

প্রিয়র মুখ ফ্যাকাশে হইয়া গেল। একবার জ্ঞানদার মুখখানা দেখিবার চেষ্টা করিলেন, তারপরে ধীরে ধীরে কহিলেন, তোমরা বরঞ্চ বিপিন ডাক্তারকে খবর দাও মাসী, এ-সব ওষুধ আমার কাছে নেই। বলিয়া তিনি হেঁট হইয়া নিজের বাক্সটা এবং বইগুলা সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।···সহসা দ্বার খুলিয়া নিঃশব্দে গোলোক প্রবেশ করিলেন এবং প্রিয়র বাঁ হাত চাপিয়া ধরিয়া মিনতি করিয়া কহিলেন, বিষের ভয়ে ও যে আর কারও ওষুধ খেতে চায় না বাবা, নইলে কষ্ট তোমাকে দিতাম না। এ বিপদটি তোমাকে উদ্ধার করতেই হবে, প্রিয়নাথ।

প্রিয় হাত ছাড়াইয়া লইয়া বলিলেন, না, না ওসব নোংরা কাজের মধ্যে আমি নেই।…গোলোক সেই হাতটা আর একবার নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া প্রায় কাঁদ কাঁদ গলায় কহিতে লাগিলেন, প্রিয়নাথ, বুড়ো মানুষের কথাটা রাখো বাবা। সম্পর্কে তোমার আমি শ্বশুরই হই। রাখবে না জানলে যে তোমাকে আমরা বলতাম না। দোহাই বাবা, একটা উপায় করে দাও—হাতে ধরচি তোমার—

প্রিয়নাথ হাতটা পুনরায় ছাড়াইয়া লইয়া কহিলেন, সম্পর্কে শ্বশুর হন বলে কি আপনার কথায় জীবহত্যা করব? আচ্ছা লোক ত আপনি? পরলোকে জবাব দেব কি?

গোলোক দ্বারের কাছে সরিয়া গেলেন। তাঁহার মুখের চেহারা, চোখের ভাব, গলার স্বর সমস্তই যেন অদ্ভুত জাদুবলে একনিমেষে পরিবর্তিত হইয়া গেল। কর্কশ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, এতরাতে তুমি ভদ্রলোকের বাড়ির ভেতরে ঢুকেচ কেন? এখানে তোমার কি দরকার?

…কি দরকার! বাঃ বেশত! চিকিৎসা করতে কে ডেকে পাঠালে? বাঃ—

…বাঃ? চিকিৎসার তুই কি জানিস হারামজাদা নচ্ছার? কে তোকে ডেকেচে? কোথা দিয়ে বাড়ি ঢুকলি? খিড়কির দরজা তোকে কে খুলে দিলে? জ্ঞানদার প্রতি ফিরিয়া কহিলেন, হারামজাদী! তাই অন্ধ শ্বশুর কেঁদে কেঁদে ফিরে গেল, যাওয়া হ'লো না! বুড়ো শাশুড়ী মরে—আমি নিজে কত বললুম, জ্ঞানদা যাও, এ-সময়ে তাঁর সেবা করো গে। কিছুতেই গেলিনে এইজন্যে? রাত দুপুরে চিকিচ্ছে করাবার জন্যে? দাঁড়া হারামজাদী, কাল যদি না তোর মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে গ্রামের বার করে দিই ত, আমার নাম গোলোক চাটুয্যেই নয়।…

গোলোক রাসমণির প্রতি চাহিয়া কহিলেন, রাসু, চোখে দেখলি ত এদের কান্ড? আমি দশখানা গ্রামের সমাজের কর্তা, আমার বাড়ীতে পাপ! এযে বাঘের ঘরে ঘোঘের বাসা হ'লোরে!

…হ'লোই ত দাদা!

…কিন্তু সাক্ষী রইলি তুই।

…রইলুম বৈ কি! আমি বলি, রাত্রিতে ত একটু হাত আজাড় হ'লো—দেখে আসি জ্ঞানদা কেমন আছে, দেখি, বেশ দুটিতে বসে বসে হাসি তামসা,

খোস-গল্প হচ্ছে।···

প্রিয় আচ্ছন্ন অভিভূতের মত দাঁড়াইয়া ছিলেন, গোলোক ছোঁ মারিয়া তাঁহার হাত হইতে বইগুলি কাড়িয়া লইয়া তাঁহার গলায় সজোরে একটা ধাক্কা মারিয়া বলিলেন, বেরো ব্যাটা পাজী নচ্ছার আমার বাড়ী থেকে। কি বলব, তুই রামতনু বাড়ুয্যের জামাই, নইলে জুতিয়ে আজ আধমরা করে তোকে থানায় চালান দিতাম ! বলিয়া পুনশ্চ একটা ধাক্কা দিলেন এবং যে চাকর-দাসীরা গোলযোগ শুনিয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহাদেরই মধ্য দিয়া তাহাকে বারংবার ঠেলিতে ঠেলিতে বাহির করিয়া লইয়া গেলেন।

উদ্ধৃত চারটি উদাহরণে একই প্রবচন ব্যবহৃত। কিন্তু প্রত্যেক ক্ষেত্রে বক্তাদের বাস্তব অবস্থা কিন্তু এক নয়। প্রথম ক্ষেত্রে খরদূষণ তার দোর্দ্দ হাজার সৈন্য এবং রাবণের পৃষ্ঠপোষকতার উপর ভিত্তি করে নিজকে 'বাঘ' মনে করছে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে নিমচাঁদ এবং অটলবিহারী বয়সে তরুণ। গোকুল সম্পর্কে, বয়সে এবং আর্থিক সামর্থ্যে অটলবিহারীর চেয়ে বড়। নিমচাঁদ অটলের বন্ধু। কিন্তু দুষ্টবুদ্ধিতে গোকুলের চেয়ে কম যায় না। দুজনে গোকুলের স্ত্রীকে কেমন করে ঘরের বাইরে আনা যায় তার চিন্তা করে। এরা 'ঘোগ'। ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজচিত্রে বড়লোকদের গণিকা প্রতিপালন, আর্থিক সামর্থ এবং দম্ভপ্রকাশের জন্য একের অন্যের রক্ষিতাকে ছিনিয়ে নেওয়া প্রায়শই দেখা যায়। সেদিক থেকে গোকুল 'বাঘ'। তৃতীয় উদাহরণে যেহেতু পদ্মলোচন গৃহস্বামী, এবং চোর তারই বাড়িতে চুরি করতে ঢুকেছে,—তাই পদ্মলোচন 'বাঘ' এবং চোর অবজ্ঞার পাত্র হিসাবে 'ঘোগ'।

কৌলীন্যের অভিশাপ বাঙালী হিন্দুর সমাজজীবনে যে অভিশাপের কলঙ্ক-তিলক এঁকে দিয়েছিল, তার হাত থেকে আজও এ সমাজ মুক্ত নয় (খবরের কাগজে পাত্র-পাত্রী-সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন যারা সামাজিক বিবর্তনের দৃষ্টিকোণ নিয়ে পড়েন, তারাই উপলব্ধি করতে পারবেন)। তার মর্মমূলে সমব্যথীর মন নিয়ে, সহমর্মিতার দৃষ্টিতে দেখে যাঁরা লেখনী ধারণ করেছিলেন শরৎচন্দ্রের সংগে বোধ হয় তাঁদের কাউকেই তুলনা করা যায় না (কুলীনকুল সর্বস্ব কে বাদ দিলে)।

'বামুনের মেয়ে'র 'সমাজের শিরোমণি' 'একটা দেশের মাথা, সমাজের শিরোমণি'। গোলোক বাড়ুয্যে 'বাঘ' আর প্রিয়নাথ ঘোষ। তা নইলে ব্যর্থ-

মনোরথ হয়ে নিজের পিঠ বাঁচাবার জন্য তিনি যে কৌশল অবলম্বন করেন, তা তুলনারহিত।

পঞ্চদশ শতকে যে প্রবচনটি কৃত্তিবাস ব্যবহার করেছেন তাঁর অমর কাব্যে, ঊনবিংশ শতকে গোপাল উড়ে, দাশরথি রায়, দীনবন্ধু মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র, বিংশ-শতাব্দীতে শরৎচন্দ্র যার ব্যবহার করেছেন তাঁদের লেখায়, সেই 'বাঘের ঘরে ঘোগের/ঘোঘের বাসা প্রবচনটি আজও সমান তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে জনজীবনে প্রাত্যহিকতার ভাষায় ব্যবহৃত হচ্ছে। এর উদ্ভব নিঃসন্দেহে পঞ্চদশ শতকেরও আগে। অর্থাৎ পাঁচশ বা তার চেয়েও বেশি বছর ধরে একটি বিশেষ অনুভূতিকে প্রকাশ করতে গিয়ে বাংলাভাষাভাষী জনগোষ্ঠী প্রবচনটি সমান গুরুত্বের সঙ্গে ব্যবহার করে আসছে। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, যে বক্তব্যকে প্রকাশ করার জন্য এই প্রবচনটির জন্ম সেখানে 'বাঘ' 'ঘোঘ'/'ঘোগ', 'ঘর' এবং 'বাসা'—এই চারটি শব্দ কেন এলো !

'আমরা' কবিতায় সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বলেছিলেন—

বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আমরা বাঁচিয়া আছি ;
আমরা হেলায় নাগেরে খেলাই নাগেরই মাথায় নাচি।

সাপ বাঘ এককালে বাঙালীরা নিকটতম প্রতিবেশী অরণ্যপ্রাণী। তাই আমাদের অনেক প্রবাদ, প্রবচন, ছড়া, ধাঁধাতেই অরণ্য-প্রাণীরা নিজেদের স্থান পাকা করে নিয়েছে, মানুষের দৈনন্দিন জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে।

বাঘ বললে আমরা বাঙালীরা নেকড়ে বাঘ, চিতা বাঘ অথবা গায়ে কালো ডোরাকাটা হলুদ রঙের সব বাঘকেই বুঝি। অন্যদিকে বিড়ালকে বলে বলে 'বাঘের মাসি'।

সাধারণ মানুষ বাইরের কতগুলি সাধারণ লক্ষণ দেখে নেকড়ে, চিতা ও পরিচিত প্রাণী বাঘকে এক শ্রেণীভুক্ত করলেও, প্রাণিতত্ত্ববিদদের মতে এরা কিন্তু একই শ্রেণীভুক্ত নয়, যদিও সকলেই শ্বাপদ এবং মাংসাশীগোষ্ঠীর অন্তর্গত। Tiger যার ইংরেজী প্রতিশব্দ, আমাদের পরিচিত সেই বাঘ সম্বন্ধে অভিধানের বক্তব্য—A large and dreaded carnivorous mamal of the cat family। আমাদের প্রবচন সৃষ্টিকর্তাদের মধ্যে কেউ কেউ এটা তীক্ষ্ন পর্যবেক্ষণসূত্রে জেনেছিলেন যে, বাঘ হচ্ছে বিড়াল

পরিবারভুক্ত ভয়ঙ্কর মাংসাশী প্রাণী; তাই বেড়ালকে 'বাঘের মাসি' বলেছেন। চিতাবাঘের মুখাকৃতিও বেড়ালের মতই। অন্যদিকে আমরা যাকে নেকড়ে বাঘ বলি সেটি কিন্তু বিড়াল পরিবারের নয়। নেকড়েবাঘ বা wolf সম্বন্ধে বলা হয়েছে—A carnivorous quadruped belonging to the dog family, and closely related to the dog, swift of foot, crafty, and rapacious, but, in general, cowardly and stealthy।

উপরিউক্ত বক্তব্যদ্বয় থেকে এটা পরিষ্কার যে আমাদের পরিচিত বাঘ বিড়াল পরিবারভুক্ত; অন্যদিকে নেকড়ে হচ্ছে কুকুরগোষ্ঠীর প্রাণী। আপাতদৃষ্টিতে এই দুই গোষ্ঠীকে চিহ্নিত করা যায় মুখাবয়বের পার্থক্যের ভিত্তিতে। বিড়াল জাতীয় প্রাণীর মুখ গোল, কুকুরগোষ্ঠীর লম্বা। কুকুরগোষ্ঠীর প্রাণীদের মধ্যে আছে নেকড়ে, কুকুর, শেয়াল, হায়েনা ইত্যাদি প্রাণী; বেড়াল-গোষ্ঠীর প্রাণীর আর একটা বড় বৈশিষ্ট্য হল, নখ উভয়শ্রেণীর থাকলেও, এরা থাবার ভেতরে নখগুলোকে গুটিয়ে রাখতে পারে বলে সেগুলোর ধার কখনও নষ্ট হয় না। এরা শিকারের ক্ষেত্রে নখ এবং থাবার উপরেই বেশি নির্ভরশীল। অন্যদিকে কুকুরশ্রেণী বেশি নির্ভরশীল তাদের শ্ব-দন্তের উপর, যদিও পায়ের ব্যবহারেও এরা পটু। এদের চোয়াল এবং দাঁত খুব শক্ত ও ধারালো। কুকুরশ্রেণীর ঘ্রাণশক্তি অত্যন্ত তীব্র, বিড়ালগোষ্ঠীর দৃষ্টিশক্তি। উভয়শ্রেণীর অন্যতম পার্থক্য জীবনযাত্রায়। বিড়ালগোষ্ঠীর প্রাণী মূলত এককভাবে বিচরণকারী, অন্যদিকে কুকুরশ্রেণীর প্রাণী প্রধানত গোষ্ঠীজীবন যাপনে অভ্যস্ত। বিড়ালগোষ্ঠীর যে বৈশিষ্ট্য, তার সবগুলিই আমাদের পরিচিত বাঘের আছে।

এবার দেখা যাক 'ঘোঘ' বা 'ঘোগ' শব্দটিকে। 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' বলেন 'ঘোঘ' 'কোক' শব্দের উচ্চারণ-বিকৃতিজাত। স্যার মনিয়ের উইলিয়মস্-এর A Sanskrit Englsh Dictionary-র মতে কোক শব্দের অর্থ wolf বা বৃক। যাস্ক তাঁর নিরুক্তে 'বৃক' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত বিশ্লেষণে বলেছেন—

—শ্বাপি বৃক উচ্যতে বিকর্তনাৎ ॥ ৮ ॥

শ্বা অপি বৃক উচ্যতে (শ্বা অর্থাৎ সারমেয়ও বৃক বলিয়া অভিহিত হয়), বিকর্তনাৎ (বিশেষরূপে বা বিবিধরূপে কর্তন করে বলিয়া)।

বৃন্ধবাশিন্যপি বৃক্যুচ্যতে ॥ ১৩ ॥

বৃন্ধবাশিনী অপি (বিকট চীৎকারিনী অর্থাৎ শিবা বা শৃগালীও) বৃকী উচ্যতে (বৃকী বলিয়া অভিহিত হয়)।

বৃন্ধবাশিনী বৃন্ধং প্রভৃতং বিকটং যথা স্যাৎ বাশ্যতে শব্দায়তে ইতি বৃন্ধবাশিনী শৃগালীত্যর্থঃ (শৃগালী—যে বিকট স্বরে চীৎকার করে); বৃকী ('বৃক' শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে) শব্দের অর্থ বৃন্ধবাশিনী অর্থাৎ শিবা বা শৃগালী। শৃগাল বাচক 'বৃকী' শব্দও বি+কৃৎ ধাতু হইতেই নিষ্পন্ন—শৃগালীও বিশেষ-রূপে বা বিবিধরূপে কর্তন করে।

এই বিকর্তন কুকুরগোষ্ঠীর সমগ্র প্রাণীরই ধর্ম। তাই বৃক বা কোক বা ঘোঘ বা ঘোগও বিকর্তনকারী; কারণ এটিও কুকুরগোষ্ঠীরই। বাইরের চেহারায় নেকড়েদের একটা সাধারণ মিল থাকলেও নানান গুণের দিক দিয়ে তারা খুবই পৃথক। সুদূর অতীতে এই পার্থক্য থেকেই মানুষ কৃত্রিম বাছাই চালিয়ে বংশগত পরিবর্তন মারফত বিভিন্ন জাতের কুকুর পায়।—বলেছেন অধ্যাপক পিওতর আলেক্সান্দ্রভিচ মান্ডেইফেল তাঁর 'প্রকৃতিবিদের কাহিনী' বইতে। অর্থাৎ, প্রাকৃতিক নিয়মেই বিভিন্ন প্রজাতির অরণ্যশ্বা-এর মধ্যে জৈবিক মিশ্রণ ঘটেছে। আর এই মিশ্রণের ফলে ঘোঘ/ঘোগ মূলত আরণ্য সারমেয় বা বৃক প্রকৃতিতে দৃষ্ট সাধারণ কুকুর থেকে স্বতন্ত্র এক সারমেয় গোষ্ঠীর প্রাণী। একই মিশ্রণের স্বীকৃতি আছে বিড়ালকে বাঘের মাসি বলার মধ্যে। নেকড়ে অথবা সাধারণ কুকুরের বৈশিষ্ট্য—এরা দলবদ্ধ ভাবে থাকে। শুধু তা-ই নয়, এরা যখন শিকার করে বা নিহত শিকারকে নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে তখন এক অদ্ভুত সামাজিক দায়িত্ববোধের রূপ তাতে ফুটে ওঠে। কোন একটা ইংরেজী সিনেমায় (আফরিকান সফরি, জাঙ্গল লাইফ বা কিং এলিফ্যান্ট) দেখেছিলাম, আজ আর মনে নেই,—বন্য কুকুর, শিকারের সময়, পুরুষগুলোই এগিয়ে গিয়ে গোল হয়ে এমনভাবে আক্রমণ করে যাতে শিকার পালাতে না পারে। নিহত পশুকে কেন্দ্রে রেখে ছোট বাচ্চারা আগে যখন খেতে থাকে তখন স্ত্রীকুকুর-থাকে দ্বিতীয় অর্থাৎ মধ্যবর্তী বৃত্তে। একেবারে বাইরের বৃত্তে বাইরের দিকে মুখ করে থাকে শিকারী পুরুষ কুকুরের দল, যাতে বাইরের কেউ শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে না পারে। বাচ্চাগুলোর খাওয়া হয়ে গেলে আসে স্ত্রী কুকুর-গুলো। ওদের খাওয়ার শেষে অবশিষ্ট খায় পুরুষরা।

শরৎচন্দ্র তাঁর শ্রীকান্ত উপন্যাসে 'নতুনদা'র নৌকা ভ্রমণ প্রসঙ্গে বলেছেন যে অঞ্চলের মানুষ দলবদ্ধ হুড়ারের (নেকড়ের) জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠতো। এই দলবদ্ধতা কুকুরগোষ্ঠীর সমস্ত প্রাণীরই বৈশিষ্ট্য।

কেবল দলবদ্ধতা নয় কুকুরগোষ্ঠীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য, এরা গর্ত খুঁড়তে ওস্তাদ। উল্লিখিত 'প্রকৃতিবিদের কাহিনী' বইতে আছে—

'মাংসে ডাক্তাররা কোনো সংক্রামক রোগের সন্ধান পেলে নিহত পশুর দেহ পুঁতে দেওয়া হত। একপাল কুকুর এসে জুটত খাদে, সহজেই খুঁড়ে বার করত। কেউ কেউ তাদের মাটি খোঁড়ার কায়দাটা লক্ষ্য করছিলেন।

'কমরেড হারিতোনভ চিঠিতে লেখেন : 'গর্ত খোঁড়ার সময় কুকুরদের মধ্যে যে শৃঙ্খলা দেখেছি, তাতে অবাক হয়ে গেছি। খুঁড়তে খুঁড়তে একটা কুকুর ক্লান্ত হয়ে পড়লে অমনি আরেকটা এসে জায়গা নেয় তার। দেখতে দেখতে গভীর হয়ে ওঠে গর্ত।...

'সত্যি, শিকারীদের প্রায়ই চোখে পড়েছে কত অনায়াসে গর্ত খুঁড়তে পারে কুকুর এবং সেটা শুধু আলগা মাটিতে নয়, অহল্যা মাটিতেও।

'মাঝে মাঝে শিকারের সময় কুকুরের তাড়ায় কোনো একটা ছোট জন্তু যখন গর্তে গিয়ে সেঁধয় কুকুর তখন তার সামনের দুই থাবা দিয়ে ক্ষিপ্রগতিতে জন্তুটার গর্ত খুঁড়তে শুরু করে।

'সে ক্লান্ত হয়ে পাশে শুয়ে পড়ে। কাছেই তৈরি থাকে দ্বিতীয়টি। এক মিনিটও সময় ব্যয় না করে সে ক্লান্তটির জায়গা নেয়।'

দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী' নাটকে নিমচাঁদ বলে 'সুড়ঙ্গ কাটতে পাল্লে ব্যাটার বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা করি।'

'ঘোঘ/ঘোগ' কোন জাতীয় কুকুর বা নেকড়ে বা কুকুর তা সঠিকভাবে বলা মুস্কিল হলেও ড. সুশীল কুমার দে তাঁর 'বাংলা প্রবাদ ছড়া ও চলতি কথা' (কলকাতা ১৩৫৯) বইতে, জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস তাঁর 'বাঙ্গালা ভাষার অভিধান'-এ বলেছেন, ঘোগ বাঘের শত্রুবিশেষ জন্তু lemur tradigradus।

'ঘোগ' আমাদের পরিচিত বাঘের তুলনায় দুর্বল হলেও বাঘের জাত-বৈরী। এরা বাঘের বাসায় লুকিয়ে বাঘের ছানা খেয়ে ফেলে। আকৃতিতে ছোট, শক্তির দিক থেকে এককভাবে কোনো কুকুরই বাঘের সামনে দাঁড়াতে পারে না ; তবু এদের সমাজজীবনে যে সহমর্মিতা বোধ, যে যৌথ প্রচেষ্টা, যে কষ্ট সহিষ্ণুতা, যে

কূটকৌশলের পরিচয় আছে, তাতে বাঘের মত বলবান শত্রুকেও এরা ভয় পায় না ; এমনকি এদের ছানাগুলোকে সুযোগ পেলেই খেয়ে ফেলে। তাছাড়া দলবদ্ধ 'হুড়ারের' জ্বালায় কেবল গ্রামবাসীরাই নয়, বাঘের ক্ষুদ্রশত্রু ঘোগ বাঘের পেছনে লেগে বাঘকে বড় বিরক্ত করে, এই হেতু বাঘও এদের বড় ভয় করে (বঙ্গীয় শব্দকোষ, ১৩৪১ দ্রষ্টব্য)। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস তাঁর বাঙ্গালা ভাষার অভিধানে আরও বলেছেন, ঘোঘ বাঘ এবং কুকুরের মাঝামাঝি এক প্রকার জন্তু। এরা ব্যাঘ্রশিশুদের একা পেলেই খেয়ে ফেলে। এইজন্য এরা বাঘের বাসায় লুকিয়ে বাসা বেঁধে থাকে। এটা করতে গিয়ে অনেক সময় বাঘের হাতে প্রাণ হারায়, তবু বাঘের শত্রুতা করতে ছাড়ে না।

রূপকথা বা লোককথায় বাঘ, সিংহ এদের নিয়ে প্রচুর কাহিনী তৈরি হয়েছে দেশে বিদেশে। এসব ক্ষেত্রে সিংহ পশুরাজ হলেও গোঁয়ারতুমি প্রসঙ্গে বাঘকেই আনা হয়েছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে। অন্যায় অবিচারের নায়ক সিংহ নয়, বাঘ। মানুষ তার অরণ্য-র সাহচর্যের জীবনে পশুচরিত্রকে ভাল করে অনুধাবন করেই বাঘকে এই আসনে বসিয়েছে। বাঙালী 'বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ' করে বেঁচে থেকেছে এককালের দক্ষিণে বিস্তৃত সুন্দরবনের, উত্তরে তরাই অঞ্চলের সুবাদে। বাঘ, কুকুর, নেকড়ে এদের সঙ্গে তার দৈনন্দিন প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল বলেই সে জেনেছে, বিড়ালগোষ্ঠীর বাঘের সঙ্গে কুকুরগোষ্ঠীর ঘোঘের চিরবৈরিতাকে, যেমন আজও আমরা দেখি কুকুর বিড়ালের ঝগড়াকে। ইংরেজরা তো অঝোরে বৃষ্টি পতনের শব্দের পরিস্থিতিকে cats & dogs বলেই অভিহিত করেছেন তাদের তৎ সম্পর্কিত প্রবচনে।

পর্যবেক্ষণসূত্রে বাঘ, ঘোঘ/ঘোগ, কোক, বৃক তথা কুকুরশ্রেণীর বৈরিতাকে কেন্দ্র করে যে প্রবচনটির জন্ম হয়েছে তার আরও একটি দিক আছে। বাঘ যেহেতু বলবত্তর প্রাণী তাই তার আছে ঘর অর্থাৎ স্থিতিশীল বাসস্থান। কিন্তু ঘোঘ দুর্বল বলেই সাময়িক আশ্রয় হিসাবে বাসা নেয় বাঘের ঘরে, চিরবৈরিতার সূত্রে। সবল স্বার্থপরের তাড়নায় তার 'ঘর' তৈরি হয়ে ওঠে না।

নিজের শক্তিমত্তার জোরেই সধবার একাদশীর গোকুল অটলের রক্ষিতা কাঞ্চনকে ছেড়ে দিতে বলে। যদিও এ নাটকে গোকুল অটল-উভয়েই মূলত বাঘ-ঘোঘের মত মাংসাশী, তবু ঘোঘ যেমন বাঘের ছানা লুকিয়ে খেয়ে নেয় তেমনি নিমচাঁদ অটলবিহারী-ঘোগগোষ্ঠী গোকুলের 'মাগ'কে বের করে নিয়ে আসার

পরিকল্পনা করে, সুড়ঙ্গ কাটার যুক্তির পথে এগোয়। কৃত্তিবাসের খরদূষণের আত্মশক্তিতে যত বিশ্বাস, তার চেয়ে বেশি আস্থা চৌদ্দ হাজার সৈন্যে, রাবণে। সেই বলে বলীয়ান হয়ে আস্ফালন করে রাম-লক্ষ্মণকে বলে ঘোঘ, আর নিজে হয় বাঘ। আস্ফালন সারই হয় পরিণতিতে। গোপাল উড়ের 'তুমি তার কোথায় লাগ জাদুমণি···মনেতে করেছ আশা···বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা, আসকে খেয়েছ যাদু ফোড় তো গণ নি।'—পদে আত্মম্ভরিতার প্রকাশ।

জামাই-বারিকের পদ্মলোচনের আস্ফালন, সে বাঘ, আর চোর হচ্ছে ঘোঘ। কিন্তু চোরের পরবর্তী শ্লেষাত্মক কথায় সম্বিৎ ফিরে আসে তার—সে নিজেও শক্তির দিক থেকে ঘোঘ ছাড়া কিছুই নয়।

'বাঘের ঘরে ঘোঘের বাসা'—এ প্রবাদের জন্ম বাঙালীর সমাজ-অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে। আস্ফালনকারী প্রবল অত্যাচারী যখন স্বপক্ষে প্রবাদটিকে ব্যবহার করে, তখন সমস্ত দিকের বিচারে empty vessel sounds much এই প্রবাদের গূঢ়ার্থই প্রকাশ পায়। কারণ বাঘ নিজের অত্যাচারী চরিত্র সম্বন্ধে সচেতন। কৃত্তিবাসী রামায়ণ, দীনবন্ধু মিত্রের সধবার একাদশীতে এইরূপের প্রকাশ। জামাই বারিকের পদ্মের সংলাপে আছে এর ব্যঙ্গ-রূপ। অন্যদিকে বামুনের মেয়ের গোলোক বাড়ুয্যের আচরণে এই অনুষঙ্গ যেভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে তার সঙ্গে কোনোটিরই তুলনা হয় না। দ্বিতীয়ত, বাঘ ঘোঘের যৌথ জীবন যাত্রার বিশিষ্ট গুণাবলী, বিশেষ করে এদের একাগ্রতার, কর্মদক্ষতার রূপও বিভিন্ন প্রসঙ্গে প্রত্যক্ষ করে।

কিন্তু নিপীড়কের বিরুদ্ধে, বৃহৎশত্রুর বিরুদ্ধে (আগেই বলেছি, সিংহকে পশুরাজ হিসাবে চিত্রিত করা হলেও মূর্খ এবং পরামর্শকারী দেখানো হয় রূপ-কথায়। অন্যদিকে বাঘকে বদমেজাজী অত্যাচারী কল্পনা করা এক্ষেত্রে প্রায়শই দেখা যায়) যখন প্রবাদটিকে টেনে আনে, তখন কিন্তু অসহায়ত্ববোধ নয়, যৌথ-শক্তিতে আত্মবিশ্বাসী, কঠোর পরিশ্রমকারী, কর্মদক্ষ, জীবনপণকারী মানুষের লাঞ্ছনাকে নীরবে সহ্য করার নয়, বরং প্রতিশোধের মনোভাবকেই প্রকাশ করে।

একদিকে অহংকার, অত্যাচার, অন্যদিকে অবিচারের বঞ্চনার বিরুদ্ধে পরিশীলিত সোচ্চার প্রকাশ—এই দ্বৈতভঙ্গী বাংলা প্রবাদ প্রবচনের যতগুলিতে আছে, এটি তাদের অন্যতম।

যৌথজীবনে যারা স্বাচ্ছন্দ্য পায়, আনন্দে দুঃখে নিজেদের মনোভাবকে যারা

উচ্চকণ্ঠে, সমবেতকণ্ঠে প্রকাশ করতে চায় এবং পারে, করায়ত্ত ভোগ্যবস্তুর সমবন্টনে, বিশেষ করে দুর্বলকে আগে ভাগ দিয়ে বলশালী করে তুলতে যারা আন্তরিকভাবে সচেষ্ট এবং অভ্যস্ত, সেই ঘোষের মত সাধারণ মানুষ যেদিন নিজের প্রবঞ্চিত জীবনের সপক্ষে প্রবচনটির মর্মার্থ অনুধাবন করে সেইমত যৌথ ভাবে কাজ করতে পারবে, সেইদিন এই অসাধারণ প্রবচনের প্রথম উদ্‌গাতার উদ্দেশ্য সফল হবে। অন্যদিকে অহংকারী এই প্রবাদের সাহায্যে অহং প্রকাশের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন না ঘটালে বৃহত্তর সমাজের চোখে তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি আরও স্পষ্ট ও স্বচ্ছ হয়ে উঠবে। সমাজের চোখে তারা হবে অবাঞ্ছিত।

গেঁয়ো যুগী ভিখ পায়না

হাতে একটু সময় ছিল। বসে বসে আবার ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের 'বাংলার লোকসাহিত্য' ১ম খণ্ড পড়ছিলাম। পড়তে পড়তে একটা জায়গায় এসে চোখ আটকে গেল।—ঐতিহাসিক স্বর্গত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় লিখিয়াছিলেন, 'গায়েনেরা ওস্তাদের মুখে শুনিয়া বা একখানা পুঁথি দেখিয়া যুগীযাত্রা মুখস্থ করে এবং গ্রামে গ্রামে গাহিয়া বেড়ায়।'

'যুগীযাত্রা' শব্দটি বারে বারে মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকলো। যাত্রা বলতে আমরা সাধারণত বুঝি পালাগান, যার বিষয়বস্তুকে মূলত অভিনয় এবং সংগে নৃত্য-গীতাদিদ্বারা একাধিক কুশীলবের সহায়তায় দর্শক-শ্রোতৃবৃন্দের সামনে উপস্থাপিত করা হয়।

কিন্তু যুগীযাত্রায় কেবল একজন গায়েন থাকেন। অন্যান্য কুশীলবদের উপস্থিতি নেই। তা না থাকুক। কিন্তু যুগীযাত্রা বলতে কী বোঝানো হয়েছে? বইয়ের পাদটীকায় দেখি-গোপীচাঁদের সন্ন্যাস, (ঢাকা, ১৩৩২), সম্পাদকীয় মন্তব্য, পৃঃ ৭৫। অর্থাৎ, 'গোপীচাঁদের সন্ন্যাস'-এর বিষয়বস্তু বা এই জাতীয় কাহিনী যুগীযাত্রায় থাকে। তাহলে যুগী কারা? এই জাতীয় বিষয়বস্তুর নির্বাচনের পেছনে তাদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উদ্দেশ্য কি?

কে. বি. দাস এবং এল. কে. মহাপাত্রের লেখা 'ফোকলোর অব ওড়িষ্যা' বই খানায় এই যুগী / যোগীদের সম্বন্ধে কিন্তু বক্তব্য আছে। এখানে বলা হয়েছে যে, যুগী / যোগীরা যে সমস্ত 'গাথা' গান করে তার অধিকাংশই মুখে মুখে তৈরি। গ্রামে যোগী শব্দটি ভিক্ষুক অর্থে ব্যবহৃত হয়। যোগাভ্যাস বা যোগ-সাধনার সংগে এই যোগীদের কোনো সম্পর্ক নেই। এরা নিজেদের দেহকে বিভিন্ন নকসায় চিত্রিত করে, বাঁ কাঁধে নেয় একটা ঝুলি, বাঁ-হাতে থাকে কুমড়োর

খোলে তৈরি পাত্র। 'কেন্দার', খঞ্জনী অথবা একটা বাঁকা লাঠি থাকে ডান হাতে। এ লাঠির বৈশিষ্ট্য আছে। হাতলের দিকটায় চোখ এবং কান আঁকা (কখনো কখনো পেতল দিয়ে তৈরী) থাকে। গলায় থাকবে তুলসী-কণ্ঠি। দেখে মনে হবে ভক্ত-প্রবর। বেশবাস সবই দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য। সহানুভূতি আদায়ের উদ্দেশ্যে। যোগীদের কাজই হলো পুরাণ-কাহিনী থেকে দান অথবা আত্মোৎসর্গের কাহিনী করুণ সুরে গেয়ে ভক্তিমতী গ্রামীন মহিলাদের মনে সহানুভূতির উদ্রেক সাধন। এবং পরিবর্তে ভিক্ষা গ্রহণ।

গ্রন্থে দুটি এই ধরনের গাথা উল্লিখিত হয়েছে।

বউলা-গাই তার তিন দিনের বাছা-বাছুরকে গোয়ালে রেখে বনে ঘাস খেতে গেল। হঠাৎ এলো এক বাঘ। বলল, তোকে খাবো। বউলা বললে, ঠিক আছে। আমায় খেয়ো। কিন্তু গোয়ালে আমার কচি বাছুর দুধ খায়নি এখনও। বড্ড খিদে পেয়েছে তার। আমি কথা দিচ্ছি তাকে খাইয়ে আবার আমি আসবো তোমার কাছে। তখন তুমি আমায় খেয়ো। অনেক কষ্টে বাঘের মনে বিশ্বাস এনে, সে গোয়ালে গিয়ে বাছুরকে দুধ খাইয়ে; ফিরে এলো বাঘের কাছে। সত্যরক্ষা করতে গিয়ে সে তার বন্ধু বান্ধব, পাড়া প্রতিবেশীর কাছে সব কথা খুলে বলেছিল। তারা বারণ করলো। তবু সবার নিষেধ না শুনে ফিরেছিল বাঘের মুখে। সঙ্গে নিয়ে এসেছিল তার কচি বাচ্চাটাকে। বাঘের মনে করুণার সঞ্চার হলো। বউলাকে সে ছুঁলো-ও না। এমন কি সেই মুহূর্তে মরদেহ ত্যাগ করলো। তার স্থান হলো স্বর্গে।

যোগীরা গোপীচন্দ্রের গানও গায়।

রাজা, বিলাসী রাজা মাণিকচন্দ্র স্ত্রী থাকতেও বৃদ্ধ বয়সে আবার পাঁচটি বিয়ে করলেন। পাঁচটি পত্নীই রূপসী যুবতী। এদের সঙ্গে প্রধানা মহিষী প্রৌঢ়া ময়নামতীর বনিবনা হচ্ছিল না। রাজা ময়নামতীকে নির্বাসন দিলে ময়নামতী রাজধানী থেকে দূরে ফেরুসা নামক স্থানে একা একা বাস করতে লাগলো। সে হলে হাড়িপা সিদ্ধার শিষ্যা। দিন যায়।

এদিকে রাজার মৃত্যুকাল উপস্থিত। ময়নামতী প্রাসাদে ফিরে নানা তুকতাক করলো রাজাকে বাঁচানোর। কিন্তু ফল হলো না।

রাজার মৃত্যুর কিছুদিন পর ময়নামতীর এক ছেলে হলো। শিশু গোপী-চন্দ্রকে সিংহাসনে বসিয়ে ময়নামতীই রাজ্য শাসন করতে লাগলো। গোপীচন্দ্র

যৌবনে পদার্পণ করলে অদুনা পদুনানাম্নী দুই পরমা সুন্দরী রাজকন্যার সঙ্গে তার বিয়ে হলো। পত্নীদের (ওড়িষ্যা-গাথায় মহিষীসংখ্যা নিরানব্বই) প্রেমে এবং প্রজাদের শ্রদ্ধায় দিন কাটছিল সুখে। এমন সময় হঠাৎ আদেশ ময়নামতীর —সিংহাসন ত্যাগ করে বারো বৎসরের জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ কর! অনেক অনুরোধ উপরোধেও কাজ হলো না। সব ফেলে রেখে হাড়িপা সিদ্ধার তত্ত্বাবধানে হীরা-গণিকার প্রলোভন কাটাতে হলো বারো বৎসর। সিদ্ধিলাভ করলো গোপীচন্দ্র সাধনায়। ফিরে পেলো মহিষীদের, রাজ্যপাট।

পূর্বোল্লিখিত বেশভূষায় যুগীরা এই ধরণের গাথা গেয়ে কোমল-প্রাণা গ্রামীণ নারীমনকে জয় করে ভিক্ষা লব্ধ অন্নে জীবন যাপন করে।

তবু, বাংলায় একটি প্রবাদে বলা হয়েছে গেঁয়ো যুগী ভিক পায় না। এই এই প্রবাদের জন্ম হলো কেন? যুগীরা তো এইসব গান গেয়ে ভিক্ষা করে খায় চিরকাল। তবু কেন বলা হলো 'ভিক পায় না'।

যোগী ভিক পায়না-প্রবাদের এই অংশটুকুই প্রমাণ করে যে, যখন এই প্রবাদের জন্ম সেই কালে যুগীরা ভিক পেতো না বা না-পাওয়া শুরু হয়েছে, কিন্তু তার পূর্ববর্তীকালে ভিক্ষা পেতো। আরও একটা কথা, প্রবাদে ভিক্ষা না পাওয়ার প্রসঙ্গে কেবল যোগী / যুগীদের কথাকেই বলা হয়েছে। অন্যদের অর্থাৎ অন্যান্য ভিখারীদের প্রসঙ্গে এ উক্তি নয়।

এবার তাহলে যোগী / যুগী কারা সে সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্ট করে নেওয়া দরকার। যোগী শব্দের অভিধানকৃত অন্যতম অর্থ সমাধিশীল, যোগযুক্ত। যোগযুক্ত বললে কি বুঝি? পাতঞ্জল দর্শনের মতে চিত্তবৃত্তি নিরোধ অর্থাৎ অন্তঃকরণ সামান্যের প্রমাণ বিপর্যয়াদি বৃত্তির লয়। অন্যমতে জীবাত্মা-পরমাত্মার যোগ। অর্থাৎ এক কথায় পার্থিব বস্তুর প্রতি মোহমুক্ত মানসিক অবস্থা যাদের হয়েছে তারাই যোগী।

এই যোগ-চিন্তার একটি রূপ পাই মহেঞ্জদারো-হরপ্পার সীলমোহরে। এর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় মুখর আমাদের বেদান্ত দর্শন বা উপনিষদ। অন্যদিকে যজ্ঞীয় ক্রিয়াকান্ড, সামাজিক বৈষম্য, অর্থনৈতিক শোষণ, বৈদিক যুগের অবক্ষয়ের কালে যখন অত্যন্ত প্রকট হলো, তখন সে যুগের বিজ্ঞতম হিন্দু বুদ্ধদেব যে মতবাদ প্রচার করে মানুষের দুঃখ মুক্তির পথ দেখালেন তা হলো চিত্তবৃত্তি-নিরোধ। আর এই চিত্তবৃত্তি নিরোধই যোগ।

কিন্তু যোগের সাধারণ অর্থ সংযুক্ত করণ। অর্থাৎ আমরা পার্থিক জীব-সমূহ বেঁচে থাকবার জন্য, সুস্থ-সুন্দর জীবনের আকাংক্ষায় সহজাত প্রবৃত্তির বশে, ইন্দ্রিয় সমূহের সাহায্যে, নিজেদের কর্মধারাকে পার্থিব অবস্থার সংগে যুক্ত-করি। সাধারণ অর্থে তা-ই যোগ। সম্পদের অসম বন্টনব্যবস্থা, সাধারণ মানুষের অপ্রাপ্তিজনিত যন্ত্রণা, আকাংক্ষাকে তীব্রতর করে তোলে। দুঃখের উদয় হয়, তীব্রতা বাড়ে। এরই হাত থেকে মুক্তির উপায় আলংকারিক অর্থের যোগ।

সেই বৈদিক অবক্ষয়ের যুগে চিত্তবৃত্তির নিরোধই দুঃখমুক্তির উপায়,—এই তত্ত্বের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে সাধারণ মানুষ বৌদ্ধধর্মকে গ্রহণ করে নি। করেছিল হিন্দু ধর্মের কাঠামোর মধ্যে, পৌরোহিত্য যে স্বার্থচিন্তা প্রণোদিত নিয়ম-শৃংখলের জাল বুনে চলেছিল, তার সর্বগ্রাসী যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্যে।

অন্যদিকে মহেঞ্জদারো-হরপ্পায় যোগী-চিন্তা, যারা সৃষ্টি, সৃষ্টিরহস্য, স্রষ্টার রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেছিল, কালের পথ বেয়ে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদেরও সেই পথে টেনে নিয়ে গেল। যোগ বা চিত্তবৃত্তি নিরোধ তাদের সাধনার অংগ হয়ে উঠলো। আর সেই চিন্তাধারা সাধারণ্যে প্রচার করবার জন্য চিরায়ত পশুকথা (বাঘ-বউলার কাহিনী), কল্পিত রাজ-কাহিনী (ময়নামতী-গোপীচন্দ্র গাথা) সাধারণ্যে তুলে ধরবার চেষ্টা করলো। পরিবর্তে দিনান্তের আহার্য সংস্থানের উপায় হিসাবে ভিক্ষাকে নিল অবলম্বন করে।

যোগীদের মুখে যে সমস্ত গাথা শোনা যেতো বা আজও সু-নিভৃত পল্লী-অঞ্চলে শোনা যায়, যার দু'টির উল্লেখ আমরা করেছি, ভিক্ষা যারা দেন সেই গ্রাম-ভারতের নারীকুলের কাছে তার একটা বিশেষ আবেদন আছে। সে আবেদন কিন্তু মোক্ষলাভের আবেদন নয়। সে আবেদন সহজ মাতৃত্বের আবেদন, সুখী গার্হস্থ্য জীবনের আবেদন। বাঘ-বউলার কাহিনীতে ক্ষমাগুণের অধিকারী হয়ে বাঘ স্বর্গে গেল কি মোক্ষলাভ করলো, ভিক্ষা যারা দেবেন সেই নারীকুলের কাছে তা বড় কথা নয়, সন্তানকে বুকে ধরে সন্তানবতী নিশ্চিন্তে বেঁচে থাকতে পারবেন (কারণ বাঘ মরেছে), গাথার শেষে সেই আশ্বাসই বড়। ময়নামতী-গোপীচন্দ্রের কাহিনী যারা জানেন বা যেটুকুর উল্লেখ এখানে করা হয়েছে, তাতেই দেখতে পাবেন, কামুক রাজা মানিকচন্দ্র বৃদ্ধ

বয়সে ময়নামতীকে তাড়িয়ে দিয়ে আবার পাঁচটি তরুণীর পানি-পীড়ন করেছেন। ময়নামতীর মধ্যে একদিকে আছে ঘরের স্বপ্ন, অন্যদিকে প্রতিহিংসার জ্বালা। প্রথমটি পূর্ণ হয় নি। সে হাড়ি সিদ্ধার শিষা হয়েছে। দ্বিতীয় জ্বালা মিটিয়েছে তরুণ পুত্রকে অদুনা পদুনার কাছ থেকে (ওড়িষ্যা কাহিনীতে নিরানব্বুই রাণী) ছিনিয়ে ধর্মের নামে, যোগ-সাধনার নামে পথে বের করে। নিজে যে স্বামীসুখে বঞ্চিতা, সেই বঞ্চনার জ্বালা গোপীচন্দ্রের তরুণীবধূরাও বুঝুক, এই প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার পথ সে খুঁজেছে। আবহমান কালের শাশুড়ীরা যে যন্ত্রণা নিজেদের জীবনে ভোগ করে, তারই প্রতিশোধ তোলে তারা বউদের ওপর। গ্রাম-ভারতের নারীকুলের এ-ই জীবন। শিক্ষার, অর্থাৎ সংস্কার-মুক্ত শিক্ষার সংগে অর্থনৈতিক মুক্তি না এলে এ চিত্র শাশুড়ী-বৌয়ের, সহজে মোছবার নয়। যাক সে কথা। ঘরে ঘরে এমন অসংখ্য অদুনা পদুনা আছে, ছিলও মধ্য যুগীয় গ্রামভারতের বিভিন্ন প্রান্তে, যারা বহুতর জ্বালা সহ্য করে জীবন কাটিয়েছে। গল্পে গাথায় যখন নারীরা স্বামীপুত্র ফিরে পায়, তখন সেই কাহিনীর মধ্যে দিয়ে তাদের বেদনার রস-বিমোক্ষণ (cathersis) ঘটে। উজাড় করে ভিক্ষা দেয় গায়ককে, যোগীকে। দিয়ে এসেছেও।

কিন্তু গল্পের মধ্যে গাথার কাহিনীতে যে চিত্র, জীবনে তা নেই। আসবার ক্ষীণতম আলোক রেখাও যখন তারা দেখতে পায় না, বরং অত্যাচারের মাত্রা, পুরুষ-শাসিত সমাজ দিনের পর দিন বাড়িয়েই চলে, কৌশলগত রূপান্তর ঘটায়, আর অন্যদিকে যোগী-নামধেয় ভিক্ষুকের দল চিত্তবৃত্তি নিরোধের মোড়ক পরিয়ে ধর্মকথার নামে ঠকিয়ে চলে, মৃত্যুর পরের অলৌকিক স্বর্গধামের নিরবাচ্ছিন্ন সুখের চিত্র আঁকে, তখন তাদের প্রতি শ্রদ্ধা দিনের পর দিন কমতে কমতে একদিন শূন্যাতে এসে দাঁড়ায়। লেবু আরও কচলাতে থাকলে তা তেঁতো হ'তে শুরু করে। তখনই যোগীর স্বরূপ প্রকাশ পায়। ঐতিহ্যের পথ বেয়ে বেরিয়ে আসেন দুর্বাসারা।—'উচ্ছন্নে যাবি বৃন্দাবন—উচ্ছন্ন যাবি। ছোটলোক হয়ে পয়সার জোরে ব্রাহ্মণকে কষ্ট দিলে নির্বংশ হবি।...' বৃন্দাবন উর্দ্ধশ্বাসে কাঁদিতে কাঁদিতে তারিণীর শ্রীচরণে আসিয়া পড়িল। তারিণী লাথি মারিয়া পা ছাড়াইয়া লইয়া পিশাচের হাসি হাসিয়া কহিলেন, সন্ধ্যে আহ্নিক না করে জল গ্রহণ করিনে। কেমন, ফলল কিনা। নির্বংশ হলি কিনা !...এমন সময় শাস্ত্রজ্ঞ ঘোষাল মহাশয় পাশের বাড়ি হইতে খড়ম পায়ে দিয়া খট খট করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সমস্ত শুনিয়া হাষ্টচিত্তে বলিলেন, শাস্ত্রে আছে কুকুরকে প্রশ্রয় দিলে মাথায় ওঠে। ছোট লোককে শাসন না করলে সমাজ উচ্ছন্ন যায়। এমনি করেই কলিকালে ধর্মকর্ম, ব্রাহ্মণের সম্মান লোপ পাচ্ছে—তারিণী···কহিল,...সেদিন পুকুর পাড়ে দাঁড়িয়ে পৈতে হাতে করে বলেছিলাম, নির্বংশ হ। খুড়ো, আহ্নিক না করে জল জল গ্রহণ করি নে! এখনও চন্দ্র সূর্য উঠেছে, এখনও জোয়ার-ভাটা খেলচে!

অনুষঙ্গ ভিন্ন হলেও প্রায় সব ধর্মের স্বার্থান্ধ পৌরোহিত্যের চিত্রই এই।

যোগী ভিক পায় না। কিন্তু প্রবাদে আছে 'গেঁয়ো' যোগী ভিক পায় না। গেঁয়ো বলতে এখানে গ্রামীন নয়, পরিচিত বা নিজস্ব পরিবেশের। কিন্তু কেন গেঁয়ো যোগী / যুগী ভিকু পায় না? আবার ফিরে আসি ঐতিহাসিক স্বর্গত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয়ের কথায়—গায়েনেরা ওস্তাদের মুখে শুনিয়া বা একখানা পুঁথি দেখিয়া যুগীযাত্রা মুখস্থ করে এবং গ্রামে গ্রামে গাহিয়া বেড়ায়।

মুখস্থ করা যুগীযাত্রা বলে অতীত সমাজের কথা। তাতে সমাজ বিবর্তনের কথা থাকে না। তাই যে যাত্রা গেঁয়ো যোগীরা গায় তাতে বর্তমান জীবনের আদর্শ, চিত্র, আশা আকাংক্ষার প্রতিফলন ঘটে না বলেই, সমকালীন যুগের মানুষের কাছে তার আবেদন নেই। ভিক্ষা ও তাই জোটে না।

কিন্তু এই বিচারে সবাইকেই কি মাপা যায়? সবাই কি গেঁয়ো যুগী? তা নয়। তবু নতুনকে নতুন দৃষ্টিকোণে দেখতে চাই না। মাঝে মাঝে মনে হয় বিচার বুদ্ধিকেও আমরা হারিয়ে ফেলেছি কিনা! একদিকে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে জীবন যাত্রার পথ আর মান পালটাচ্ছে দ্রুত। অন্যদিকে যুগীরা গেয়ে চলেছে সেই নকল করা পুরোনো পুঁথির যুগীযাত্রা। এই দোদুল্যমান অবস্থায় বিচার শক্তি যেন আমাদের চক্ষুকে তন্দ্রালু করে তুলছে। পুরাতনের ঘোলা আবর্তে খুঁজছি স্বচ্ছ পানীয় জল। নতুন চিন্তার ভগীরথ যারা, তাদের শঙ্খ ধ্বনিকেও আমরা স্বকর্ণে শুনতে পাই না, চাই না হয়তো সংস্কার করতে, তাই বিদেশীরা যখন আমাদের চোখে আর কানে তাদের বিচারের ওষুধ ঢেলে দেন, তখন আমাদের দৃষ্টি আর শ্রুতি তাদের দিকে নিবদ্ধ হয়; আমরা হৈ হৈ করি। নিজেদের বিবেক-বুদ্ধি, চৈতন্যকে জাগ্রত করার চেষ্টা আজও করছিনা।

আসলে আমরা নিজেরাই কেমন যেন গেঁয়ো যুগী হয়ে যাচ্ছি। এ যুগের সমাজ-সমস্যাকে যুগোপযোগী ভাবে তুলে ধরতে পারছিনা। কারণ, বুঝবার

মত মানসিকতা অর্জন এবং গ্রহণের প্রতি ঔদাসীন্য। প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করে নিজেরই কাছে—আমরা কি আজও গেঁয়ো যুগী হয়ে থাকবো ? মনুষ্যত্বের ভিক কি আমাদের যুগ-শিক্ষার কাছ থেকে মিলবে না ? যুগ-সমস্যাকে, তার স্বরূপে উপলব্ধি করে, সার্থক সমাধানের উপায়কে কি যুক্ত করে, প্রকৃত অর্থেই যোগী হয়ে উঠবো না ? না, যুগী হয়েই থাকবো আরও বহুকাল।

মরা গরু বামুনকে দান

কয়েকটি প্রায়-সমবয়সী যুবক বসে বসে সময় কাটাচ্ছিল একটি পার্কে গল্পগুজব হাসিঠাট্টার মধ্য দিয়ে। আমি নিষ্কর্মা প্রৌঢ় অদূরে একটা বেঞ্চিতে বসে। শুনছিলাম ওদের আলাপ আলোচনা। ওদের কথাবার্তা থেকে একটা কথা স্পষ্ট হয়ে উঠছিল যে; ওরা শিক্ষিত-বেকার। মাঝে মাঝে চলছিল ওদের ধূমপান।

একটি ছেলে সিগারেট ধরিয়ে টানছিল। অন্য একজন সেটি চেয়ে নিল একটু বাদে। এমনি করে দু'তিন হাত ঘুরে যখন সেটি প্রায় শেষ, তখন পড়লো গিয়ে আর একটি ছেলের হাতে। আকৃতির হ্রস্বতা হেতু ছেলেটি ওটাকে ধরতে পারলো না প্রথমে। পড়ে গেল মাটিতে। কষ্ট করে তুলে মুখে দেবার আগে এমন ভঙ্গিতে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে উঠলো—মরা গরু বামুনকে দান !, যে সবাই হো হো করে হেসে উঠলো। আমিও তার জোয়ারে ভেসে গেলাম। যদিও তা সরবে নয়। অন্য একটি ছেলে বললো—আমাদের কপালে এর বেশি কি জুটবে বল ! আবার হেসে উঠলো সবাই। সে হাসি ওদের এবং সমস্ত সমাজেরই কান্নার রূপান্তর মাত্র।

ওদের উচ্চ হাসির খোরাক—'মরাগরু বামুমকে দান,' কেন জানিনা, বর্তমান সামাজিক সমস্যার কথা চিন্তা করতে না দিয়ে আমার মনকে ঠেলে নিয়ে চলল অতীত দিনের দিকে। ভাবতে লাগলাম, আধুনিক এবং নব্যশিক্ষায় শিক্ষিত কয়েকটি বেকাব যুবকের মুখে উচ্চারিত হলো এমন একটি শব্দগুচ্ছ, যার মধ্যেকার চিত্রকল্পের সঙ্গে এ যুগের শহুরে জীবনের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনে যোগাযোগ নেই।—মরাগরু বামুনকে দান।

ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করলেও এ যুগের ঐতিহ্যবাহী ব্রাহ্মণ-পুত্ররা ধর্মীয় জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত নয় মূলত সামাজিক চিন্তাধারার বিবর্তনের ফলেই। কবে কোন অল্প বয়সে চিরায়ত ধারার প্রতি শ্রদ্ধাশীল অভিভাবকরা উপনয়ন-সংস্কারে আবদ্ধ করার চেষ্টা করেন পুত্র বা পুত্রস্থানীয় বালককে। আনুষ্ঠানিক উৎসবের

পর ক্রিয়াকান্ডগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রায়শ যায় হারিয়ে উপনয়নপ্রাপ্ত কিশোরের মধ্য থেকে। তাই এককালের ব্রাহ্মণের আচরণীয় এবং তাদের জীবিকার সামাজিক চিরায়ত ধারা সম্বন্ধে এযুগের নগরজীবনে অভ্যস্ত ব্রাহ্মণবংশীয়রা, বিশেষ করে তরুণ সম্প্রদায় প্রায় কিছুই জানে না বললেই চলে।

আমাদের বাল্যকৈশোরে গ্রামীন জীবনে ব্রাহ্মণকে দেখেছি পুরোহিত, গণক বা ভিক্ষোপজীবী হিসাবে। বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্তকে আদালতে তার পেশার কথা জিজ্ঞাসা করা হলে সে অনেক কথা কাটাকাটির পর বলেছে, লিখুন ব্রাহ্মণ-ভোজনের নিমন্ত্রণ গ্রহণ। পৌরোহিত্যবৃত্তিতে পূজাপার্বণ, শ্রাদ্ধাদি, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন ইত্যাদি কাজে পুরোহিতের প্রাপ্য—দক্ষিণা, ভোজ্য এবং পরলোকগত আত্মার উদ্দেশে প্রদত্ত বস্তুসমূহ। বা পূজায় দেবদেবীর পরিধেয়রূপে চিহ্নিত বস্ত্রাদি অথবা ঘটাচ্ছাদনের গামছা ইত্যাদি। এ ছাড়া পূজার ফলমূল। পুরোহিতের প্রাপ্য এবং প্রাপ্ত এই সব দ্রব্যসামগ্রীর দিকে তাকালেই উদ্দেশ্য এবং উদ্দিষ্ট এদের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে ধরা দেয়।

প্রথমেই আসা যাক অন্যতম উপকরণ হিসাবে দেয় ভোজ্যের কথায়। ভোজ্য তা-ই, যা ভোজন করবেন ব্রাহ্মণ তার করণীয় কাজের শেষে। যেহেতু তিনি আমার হয়ে উদ্দিষ্ট দেবতার কাছে প্রার্থনা করেছেন, পূজা বা শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পাদন করেছেন আমারই মঙ্গল কামনায়, তাই পরিশ্রমসাধ্য কাজের শেষে তিনি ভোজন করবেন অত্যন্ত ক্ষুধার্ত অবস্থায়। তাই ভোজ্য নিবেদন।

কিন্তু নিবেদিত ভোজ্যের দ্রব্যসামগ্রীর দিকে তাকালে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অশ্রুসংবরণ কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। অল্প কিছু সেদ্ধ বা আতপ চালের পাশে দেখা যাবে একটা বেগুন বা কাঁচাকলা, একফালি কুমড়ো, দু'টি কাঁচা বা শুকনো লংকা, একটু ডাল আর এক চামচ নুন। দিনান্তে পরিশ্রমের পর পুরোহিতের এই যে খাদ্য যজমান নির্দিষ্ট করলেন, তা খেয়ে কোনো মানুষেরই, হোন তিনি সংযমী ব্রাহ্মণ, পেট ভরে না। শুধু তাই নয়, ক্ষেত্রবিশেষে ভোজ্যের দ্রব্যাদি দেখলে ভোজনের স্পৃহা উবে যায়। খাদ্যগুণের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম।

এবার আসি দেবদেবীর বস্ত্র বা ঘটাচ্ছাদনের গামছা অথবা দেবদেবীর অর্ঘ্য-প্রসাদীয় দ্রব্যসামগ্রীর কথায়। যে ধুতি শাড়ি বা গামছা দেওয়া হয়, তা অর্থনৈতিক দিক থেকে সমাজের দরিদ্রতম শ্রেণীর মানুষের ব্যবহার্য বা তদুপযোগী হলেও, তাদের লজ্জা নিবারণের উপায় হিসাবে গ্রহণযোগ্য হলেও

যে দেবদেবীর জন্য নির্দিষ্ট তা হয়ে থাকে, তারা যদি অত্যন্ত দয়াপরবশ হয়ে একবার সেগুলির দিকে তাকান, অংগাভরণ হিসেবে তা গ্রহণ করেন, হলপ করে বলতে পারি, তাদের শ্রীঅংগের আর দেব-দেবশ্রী থাকবে না। তারা সেগুলির দিকে তাই ফিরেও তাকান না। ক্ষেত্রবিশেষে তাদের লজ্জা নিবারণও কষ্টসাধ্য কেন, অসম্ভব হবে—এ ভয় তাদেরও আছে। গামছা নামীয় যে বস্তুটি দেওয়া হয় তা দিয়ে দেবতা-মানুষ তো দূরের কথা, শিশুরা পুতুল খেলায়ও ব্যবহার করতে চাইবে না। পুজোয় আয়না চিরুণী আলতা সিঁদুর-কৌটো ইত্যাদি যা দেওয়া হয়, তার দিকে তাকালে প্রসাধনচিন্তা মাথায় উঠে যায়; চক্ষু শিবনেত্র প্রাপ্তির অবস্থায় পৌঁছোয়। পুরুষদেবতার পাদুকা-ছত্র এমন আকৃতিবিশিষ্ট যে তাদের গায়ে লেবেল এঁটে না দিলে সনাক্ত করাও কেবল দুঃসাধ্য নয়, অসাধ্য হয়ে পড়ে। শ্রাদ্ধ দ্রব্যাদি সম্বন্ধেও একথা প্রযোজ্য।

এই অবজ্ঞার কারণ কি? দেবতাকে বা পরলোকগত পিতৃপুরুষদের প্রতি অবহেলা প্রদর্শনই কি এর জন্য দায়ী? তা নয়, আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বলে, এর কোন কিছুই দেবতা বা পিতৃপুরুষের কাজে লাগে না। এগুলি পুরোহিতের কুক্ষিগত হয়। আমার অর্থনৈতিক অবস্থার দিকে না তাকিয়ে দেবতার/পিতৃপুরুষের সন্তুষ্টি বিধানের নামে, বলা যেতে পারে সেই গৃহ্য-সূত্রের কাল থেকে যে নিয়মাবলী পুরোহিত সম্প্রদায় নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, তা থেকে বিচ্যুত হবার, মুক্ত হবার কোনো চেষ্টার লক্ষণই কোনো কালের পৌরোহিত্য দেখাল না এবং উপহৃত দ্রব্যসামগ্রী যখন থেকে পুরোহিত-কবলিত হতে থাকলো তখন থেকেই এই অবজ্ঞা। এর অন্যতম কারণ, আমার অর্থনৈতিক সামর্থ্যের অপ্রতুলতা, অন্যদিকে পৌরোহিত্যের পরভোজী, শোষক মনোবৃত্তি। এই মনোবৃত্তি পৌরোহিত্য-বৃত্তিধারীকে যে কোন পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে, তার ছোট ছোট খণ্ডচিত্র এঁকেছেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'অশনি-সংকেত' উপন্যাসে।—

'নতুন-গাঁ'-এর একমাত্র ব্রাহ্মণ পরিবারের কর্তা গংগাচরণ চক্কোত্তি কাপালী গোয়ালাদের মধ্যে একমাত্র পণ্ডিত ব্যক্তি। তিনি পাঠশালা খুলে ছাত্র পড়িয়ে জীবিকা নির্বাহ করেন বিশ্বাস মশায়ের দৌলতে। সেই বিশ্বাস মশাই একদিন সকালে এসে উপস্থিত গংগাচরণের পাঠশালা তথা বাড়িতে।

—একটা কথা ছিল। আমার বাড়িতে কাল আপনি সমস্কৃতো বলেছেন

বাড়ীর মেয়েরা সব শুনেচে। আমার একটা গাই গরুর আজ মাসাবধি হোল দড়ি গলায় আটকে অপমিত্যু ঘটেচে। সবারই মন সেজন্যে খারাপ। আমার নাতির অসুখ সেই থেকে সারচে না—জ্বর আর সর্দি লেগেই আছে—বুঝলেন ?... এখন কি করা যায় ? কাল রাত্তিরে আমার পরিবার বললে—ওনার কাছে যাও, উনি পন্ডিত লোক, একটা হিল্লে হবে।...

হুঁ—

ওর হাবভাব দেখে বিশ্বাসমশায় ভয় পেয়ে গেলেন। খুব গুরুতর কিছু ঘটবার সূত্রপাত নাকি তাঁর সংসারে ? শাস্ত্রজানা ব্রাহ্মণ, কি বুঝেচে কি জানি ? আর কিছু বলতে তাঁর সাহস যোগাল না।

গঙ্গাচরণ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে—কিছু খরচ করতে হবে। বিপদে ফেলেছে।

বিশ্বাসমশায় উদ্‌বেগের সুরে বললেন—কি রকম ? কি রকম ?

—গোবধ মহাপাপ। এ ত বড় পাপ যে—

বিশ্বাস মশায় বাধা দিয়ে বললেন—কিন্তু এতো আমরা ইচ্ছা করে করিনি ? মাঠে বাঁধা ছিল, দড়ি কি করে গলায় আটকে—

—ওই একই কথা। গোবধ ওকেই বলে—মহাপাপ।

—এখন কি করা যায় তাহোলে ?

—স্বস্ত্যয়ন করতে হবে, সামনের অমাবস্যার দিন যোগাড় করতে হবে সব। টাকা পনেরো-কুড়ি খরচ হবে।

বিশ্বাসমশায় উদ্বিগ্ন সুরে বললেন—কি কি লাগবে একটা ফর্দ করে দিন না ঠাকুরমশাই।

গঙ্গাচরণ গম্ভীরভাবে বললে—দেখে শুনে ফর্দ করতে হবে। একটা গুরুতর ব্যাপার, আপনার নাতির অসুখ সারা-না-সারা এর ওপর নির্ভর করছে। যা-তা করে দিলেই তো হবে না ? দাঁড়ান একটু আসচি—

গঙ্গাচরণ বাড়ির মধ্যে ঢুকতেই দেখলে অনঙ্গ-বৌ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ওদের কথাবার্তা সব আড়াল থেকে শুনচে।

স্বামীকে দেখে বললে—ও কে গো ?—কি হয়েছে ?

গঙ্গাচরণ স্ত্রীকে হাতছানি দিয়ে ভেতরের উঠোনে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলল—বড় খদ্দের। উনি হোলেন বিশ্বেসমশায়। তোমার কাপড় আছে ক'খানা ?

—আমার ?

—আঃ, তাড়াতাড়ি বল না ? তোমার নয়তো কি আমার ?

—আমার আটপৌরে শাড়ী আছে দু'খানা, আর একখানা, তিনখানা। তোরাঙ্গর মধ্যে তোলা ভালো শাড়ী আছে দু'খানা।

—কি নেবে বলো। ভালো শাড়ী না আটপৌরে ?

—ভালো শাড়ী একখানা হোলে বড্ড ভালো হয় ; কস্তা পেড়ে, এই—এই রকম জলচুড়ি দেওয়া, বাসুদেবপুরে চক্কত্তি-গিন্নীর পরণে দেখে সেই পর্যন্ত বড্ড মনটার ইচ্ছে—হ্যাঁগা, কে দেবে গা ?

—আঃ, একটু আস্তে কথা বলতে পারো না ছাই ? দাঁড়িয়ে রয়েছে বাইরে। আর শোনো, গাওয়া ঘি আছে ঘরে ?

অনঙ্গ ঠোঁট উল্‌টে তাচ্ছিল্যের সুরে বললে—গাওয়া ঘি! বলে ভাত পায় না; মুড়ীকি জলপান—

গঙ্গাচরণ বাইরে এসে বললে—এই যে বিশ্বাসমশায়, বসিয়ে রাখলাম। কিন্তু এসব কাজ ভেবে চিন্তে করে দিতে হয়—শুনে নিন—ভালো লাল পাড় শাড়ী একখানা, গাওয়া ঘি আধসের—ওটা—তিন পোয়াই ধরুন। চিনি পাঁচ পোয়া, পাকা কলা এক ছড়া, সন্দেশ পাঁচ পোয়া, গামছা দু'খানা, পেতলের থালা একখানা, ঘটি একটা, ধুনো এক পোয়া···ওঃ ভুলে গিয়েছি, মধুপর্কের বাটি একটা, আসন একটা—

বিশ্বাসমশায় মন দিয়ে সব শুনে বললেন—আর সব নতুন দেবো, কিন্তু ও থালা ঘটি কি নতুনই দিতে হবে ? আপনার বাড়ী থেকে না হয় দিন, কিছু দাম ধরে দিলে হয় না ?

—তা হয়। তবে খুঁৎ না রাখাই ভালো। আপনি নতুনই দেবেন।

—দিন ঠিক করে দিন—

—সামনের অমাবস্যায় হবে, ও আর দিন ঠিক কি। বলেছি তো। দক্ষিণে লাগবে দু'টাকা।

বিশ্বাসমশায় অনুরোধের সুরে বললেন—টাকা খরচের জন্যে আপত্তি নেই—যাতে নাতিটি আমার—ঠাকুরমশাই—সেরে ওঠে—

প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়ে উঠলেন তিনি।

গঙ্গাচরণ আশ্বাসের ভঙ্গীতে বললে—হুঁঃ, গোবধ! বলে কত কত শক্ত

কান্ডের জন্যে শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করে এলাম। কোনো ভয় নেই, যান আপনি।

অনঙ্গ স্বামীর কৃতিত্বে খুশি না হয়ে পারলো না যেদিন গঙ্গাচরণ বিশ্বাস-মশায়ের বাড়ী থেকে একরাশি জিনিসপত্র বহন করে বাড়ী নিয়ে এল। একগাল হেসে বললে—দেখি শাড়ীখানা? বাঃ, চমৎকার কস্তাপেড়ে—গাওয়া ঘি? কতটা?

—তা আছে পাকি তিনপোয়া। বাড়ীর তৈরী খাঁটি ঘি।

... ...

একদিন একজন লোক এসে গঙ্গাচরণকে বললে—আমাদের গাঁয়ে একবার যেতে হচ্ছে পন্ডিতমশায়—

—এসো, বসো। বাড়ী কোথায়?

—কামদেবপুর, এখান থেকে ঠিক তিন ক্রোশ।...আমাদের গাঁয়ের আশে পাশে বড় ওলাউঠোর ব্যায়রাম চলচে। আপনাকে যেয়ে আমাদের গাঁ বন্ধ করতে হবে।

গঙ্গাচরণ 'গাঁ বন্ধ করা' কথাটা প্রথম শুনলো।...

কাঁচা লোকের মত গঙ্গাচরণ তখনই বলে উঠলো না, 'হ্যাঁ, এখুনি করে দেবো, তাতে আর কি' ইত্যাদি। সে গম্ভীরভাবে তামাক টেনে যেতে লাগলো, উত্তরে 'হ্যাঁ' কি 'না' কিছুই বললে না।

লোকটি উদ্বিগ্নসুরে বললে—ঠাকুরমশায়, হবে তো আমাদের ওপর দয়া?

গঙ্গাচরণ স্থিরভাবে বললে—তাই ভাবছি।

—কেন পন্ডিতমশায়? এ আপনাকে হাতে নিতেই হবে—

—বড্ড শক্ত কাজ। বড্ড শক্ত—...

—তবে কি হবে না?

গঙ্গাচরণ নীরব। দু'মিনিট।

—পন্ডিতমশায়?

—বাপুহে অমন বকবক কোরো না। মাথা ধরিয়ে দিলে যে বকে। দাঁড়াও, ভাবতে দাও—

লোকটা ধমক খেয়ে চুপ করে রইল...।...গঙ্গাচরণ নিজেই খানিকটা চিন্তার পর বললে—কুলকুন্ডলিনী জাগরণ করতে হবে, বড্ড শক্ত কথা। পয়সা খরচ

করতে হবে। পারবে?

লোকটা এবার উৎসাহ পেয়ে বললে—আপনি যা বলেন পন্ডিতমশাই।… হিন্দু-মোছলমানে মিলে চাঁদা তুলে খরচ যোগাবো…কত খরচ হবে বলুন।

গঙ্গাচরণ মনে মনে হিসেব করবার ভঙ্গি করে কিছুক্ষণ পরে বললে—সর্বসাকুল্যে প্রায় ত্রিশটাকা খরচ হবে—ফর্দ করে দিচ্ছি নিয়ে যাও।…

গঙ্গাচরণ বাড়ীর মধ্যে ঢুকে স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করলে। সংসারের কি কি দরকার?…স্বামীস্ত্রীতে পরামর্শ করে একটা ফর্দ খাড়া করলে…

বাইরে এসে বললে—ফর্দ লিখে নাও—আলোচাল দশ সের, পাকা কলা দশ ছড়া, গাওয়া ঘি আড়াই সের, সন্দেশ আড়াই সের, কাপড় চাই তিনখানা শাড়ী, কস্তাপেড়ে, তিন ভৈরবীর, আর প্রমাণ ধুতি-চাদর ভৈরবের—আরও ধরো—হোমের তাম্রকুন্ড।

উল্লিখিত দু'টি চিত্রেই গঙ্গাচরণ চক্কত্তির পরিবারের অর্থনৈতিক যে চিত্র ফুটে উঠেছে, তাতে সে দারিদ্র্যের হাত থেকে মুক্ত হবার জন্য সরলবিশ্বাসী মানুষদের ওপর আর্থিক চাপ সৃষ্টিতে এতটুকু কুন্ঠা বা দ্বিধাবোধ করে না। তার চরিত্রের এই দিক ফুটে উঠল কেন? এর উত্তর পাওয়া যাবে কাহিনীর প্রথম দিকে।—একদিন দীনু তীওরের দেওয়া মাছ হাতে বাড়িতে এসে গঙ্গাচরণ দেখল বড়ছেলে পটল বেগুনক্ষেতে বেড়া দিচ্ছে। তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল গঙ্গাচরণ, ব্রাহ্মণের ছেলে বাঁশ-কঞ্চি হাতে নিয়ে থাকে না রাতদিন! না! ব্রাহ্মণের ছেলে হয়ে কি কাপালীর ছেলের মত দা-কুড়ুল হাতে নিয়ে থাকবি দিন রাত? না, ওসব শিক্ষে ভালো না। ব্রাহ্মণের ছেলে, ওরকম কি ভালো?

কায়িক পরিশ্রম, তা কৃষিই হোক আর কাপালীর কাজই হোক—ব্রাহ্মণ ওকাজ করবে না। এ-ই চিন্তাধারা!

'ইছামতী' উপন্যাসের 'নীলমণি সমাদ্দার করেন কি? স্ত্রী আন্নাকালী দু'বেলা খোঁচাচ্ছেন—চাল নেই ঘরে। কাল ভাত হবে না, যা হয় করো।' নীলমণি এলেন কানসোনা গ্রামের হাবু বাগ্দির বাড়ি। হাবু উঠে এসে নীলমণি সমাদ্দারকে অভ্যর্থনা করলে।…বললে—ইদিকি কনে এয়েলেন?

ততক্ষণে নীলমণি সমাদ্দার মনে মনে একটা মতলব ঠাউরে ফেলেছেন। বললেন—তোমার কাছেই।

—কি দরকার ?

—কাল রাত্তিরি একটা খারাপ স্বপ্ন দ্যাখলাম তোর ছেলেডার বিষয়ে, নারায়ণ বাড়ী আছে ? তাকে ডাক দে।

নারায়ণ এলে—এসো নারায়ণ, একটা খারাপ স্বপ্ন দেখে তোমার কাছে এ্যালাম। তোমাদের আপন বলে ভাবি, পর বলে তো কখনো ভাবিনি। স্বপ্নটা হাবুর ছেলে বাদলের সম্বন্ধে। যেন দ্যাখলাম……

—কি দ্যাখলেন ?

—সে আর শুনে দরকার নেই। আজ আবার অমাবস্যে শুক্কুরবার। ওরে বাবা! বলেচে তদর্ধং কৃষিকর্মণি। সর্বনাশ। সে চলবে না।…

—তা হলি এর বিহিত কি খুড়োমশাই ?

—আরে সেই জন্যিই তো আসা। তোমরা তো পর নও। নিতান্ত আপন বলে ভেবে এল্যাম চেরডা কাল। আজ কি তার ব্যত্যয় হবে ? না বাবা। তেমনি বাপে আমায় জম্মো দ্যায় নি।

—তাহলি এর একটা বিহিত কত্তি হবে আপনারে। মোদের কথা বাদ দ্যান, মোরা চোকিও দেখিনে, কানেও শুনিনে। যা হয় কর আপনি।

—কিন্তু বড্ড গুরুতর ব্যাপার। ষড়ঙ্গ মাতৃসাধন করতি হবে কিনা। আজ কি বার ? রও। শুক্কুর শনি, রবিবার হোলো দ্বিতীয়ে। শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়ে। ঠিক হয়ে গিয়েছে—দাঁড়াও, ভেবে দেখি—…হয়েছে। যাবে কোথায় ?

—কি খুড়োমশাই।

—কিন্তু বলবো না। খোকার কপালে ঠেকিয়ে দুটো মাসকলাই আমারে দাও দিকি।…—এখন যাই, বুধবার অষ্টোত্তরী দশা। ষড়ঙ্গ হোম করতি হবে এই মাসকলাই দিয়ে। নিঃশ্বেস ফ্যালবার সময় নেই।

পথে নেমে নীলমণি সমাদ্দার হনহন করে পথ চলতে লাগলেন। মাছ গেঁথে ফেলেচেন, এই করেই তিনি সংসার চালিয়ে এসেছেন।'

কিন্তু কেন গঙ্গাচরণ চক্কোত্তি বা নীলমণি সমাদ্দারের ছলকে প্রবঞ্চনার পথে নামতে হলো কেবলমাত্র অন্নসংস্থানের জন্য ? এর জন্য দায়ী কে ?

এর উত্তর পেতে হলে যেতে হবে মহাভারত অথবা স্মৃতিশাস্ত্র বা তারও আগে, বা রামায়ণের পাতায়। তার আগে আর্যসভ্যতা ভারতীয় জনজীবনকে যে শ্রেণীবিন্যস্ত করেছে সে সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। গীতায় শ্রীকৃষ্ণের

মুখে বলা হয়েছে-'চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ।' আর্যসভ্যতা যখন মোটামুটিভাবে ভারতে স্থিতিশীল হয়েছে তখন বা তার আগেই গুণ এবং কর্মানুযায়ী সমস্ত জনগোষ্ঠীকে বর্ণাশ্রম প্রথায়—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এই চার শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। এ ভাগের প্রাথমিক পর্যায়ে উদ্দেশ্য ছিল মানুষের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা সমূহকে ব্যক্তি এবং সমাজের প্রয়োজনে কাজে লাগাবার জন্য সেগুলির বিকাশ সাধনের স্বাভাবিক আর উপযুক্ত পথ দেওয়া। আর চারটি বর্ণে বিভাগের মধ্যেই সে যুগের প্রয়োজনকে বিন্যস্ত করা হয়েছে। যেহেতু জীবনের লক্ষ্য সে যুগে ব্রহ্ম-সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন, তাই ব্রহ্মবিদ্যায় পারদর্শীরা ব্রাহ্মণ, সমাজের উচ্চতম কোটির মানুষ। বেঁচে থাকবার জন্য, সমাজকে বিরুদ্ধ-শক্তির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য, সামাজিক নিয়ম কানুনের যথাযথ পালনের দিকে লক্ষ রাখার প্রয়োজনে চাই দক্ষ যোদ্ধা এবং প্রশাসক। তাই ক্ষত্রিয়ের উদ্ভব। পশুপালন, কৃষি, শিল্পকর্মে যাদের প্রবণতা অধিক —তারা বৈশ্য। আর কিছু লোক সমাজে চিরকাল ধরেই থাকে, যারা এর কোনো কর্মেই নৈপুণ্য অর্জনে অসমর্থ; অন্যের আদেশ শিরোধার্য করে অদিষ্ট হয়ে কাজ করে যেতে পারে, কিন্তু নিজে থেকে কিছু করার মত বুদ্ধিবৃত্তির অভাব। এরাই শূদ্র।

সামাজিক প্রয়োজনে ক্ষমতার তারতম্য অনুসারে এ বিভাগ জন্মসূত্রেই (বংশাগতি তত্ত্বকে স্বীকৃতি দিলে) মানুষের মধ্যে আগেও ছিল, আজও আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। এভাবে একটি জনগোষ্ঠীকে ভাগ করা মোটেই দূষণীয় নয়। কিন্তু যেদিন এই শ্রেণীবিভাগ সমাজ-কৌলীন্যের প্রতীক হয়ে দেখা দিল, তখনই নেমে এলো অভিশাপ। কূটকৌশলী বুদ্ধিমান শ্রেণী বংশ-পরম্পরায় নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্য যেদিন গুণ এবং কর্মের বিচারকে উপেক্ষা করে বর্ণবিভাগকে জন্মসূত্রে নিয়ন্ত্রিত করলো, সেইদিনই নেমে এলো সামাজিক অভিশাপের কলঙ্ক। ফল ফললো অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই।

চতুর্বর্ণের যেকোনো পরিবারেই সন্তান সন্ততির জন্ম হোক না কেন, সব সন্তানই সমান মেধা বা একই ধরণের প্রবণতা নিয়ে জন্মায় না—এটা প্রমাণিত সত্য। মানব-চরিত্রে এবং প্রবণতায় আছে বৈচিত্র্য। ফলে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেও সকলেই ব্রহ্ম-বিদ্যালাভে আকাংক্ষিত হবে না। অথচ ব্রাহ্মণের বৃত্তি নির্ধারিণ আগেই হয়ে গেছে। বেদপাঠ, যজন-যাজন এগুলিই তার করণীয়। এই

কাজের পথেই তাকে জীবিকা উপার্জন করতে হবে। কিন্তু সহজাত প্রবণতা এবং প্রবৃত্তির বশেই যার ভালো লাগে না, তাকেও সমাজ-নির্দেশ মেনে নিয়ে কেবলমাত্র বেঁচে থাকবার তাগিদেই, গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যেই একাজ করতে হচ্ছে। অনিচ্ছুক বা অনাগ্রহী মন যে কাজকে বাধ্য হয়ে গ্রহণ করে, তার প্রতি সুবিচার করা সে মনের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই ব্রহ্ম-বিদ্যালাভ বা বেদ-বিদ্যায় পারদর্শী হওয়া সকলের পক্ষে সম্ভব হলো না। অপাত্রে দায়িত্ব এবং কর্তব্য অর্পিত হলে যা হয়—এক্ষেত্রেও তার ব্যত্যয় ঘটলো না। শাস্ত্রাচারে, তার অধ্যয়নে এলো শিথিলতা।

অন্যদিকে সামাজিক বিবর্তনে, ব্রহ্ম-জ্ঞান বা পরা-বিদ্যার চেয়ে ঐহিক-জ্ঞান-বিজ্ঞান বা অপরাবিদ্যা সুস্থ, সুন্দরতর জীবন যাপনের জন্য অধিকতর কাম্য বলে সমাজ-মানসিকতা, তার চিন্তাধারা গ্রহণ করতে থাকলো। ফলে জন্মের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট হয়ে ব্রাহ্মণকুলে জাত সন্তান সন্ততিদের মধ্যে দেখা দিল ক্ষেত্রবিশেষে বিদ্রোহ, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হতাশা।

এই হতাশার হাত থেকে মুক্তির কোনো পথ স্মৃতিশাস্ত্রগুলি রাখেনি। কোন বর্ণের মানুষ কোন ধরণের বৃত্তিতে নিজেকে নিয়োজিত রাখবে, তা এই সমস্ত স্মৃতির অনুশাসনে নির্দিষ্ট। কেবল তা-ই নয়, অন্যবৃত্তি গ্রহণকারীর জন্য বিভিন্ন ধরণের শাস্তি, বিশেষ করে প্রায়শ্চিত্তের বিধান এরা করেছে। ফলে কোনো মানুষই স্বাভাবিক অবস্থায় বৃত্তি-পরিবর্তনে সাহসী হতো না। পৌরোহিত্য তথা ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র-রচিত এইসমস্ত স্মৃতিশাস্ত্র বিভিন্ন বর্ণের মানুষকে তো বটেই, নিজেদেরও স্ব-রচিত জালে গুটিপোকার মত আটকে ফেলেছিল। তাই একদিকে পরলোক এবং সমাজের ভয়, অন্যদিকে আভিজাত্যের মোহরূপ রেশম-সূত্রের জাল থেকে বেরিয়ে আসতে পারছিল না এরা।

ব্রাহ্মণের বৃত্তি যে যজন যাজন, পৌরোহিত্যের দক্ষিণা আর বিদায় গ্রহণ, এগুলি সবার ভাগ্যে সমান জোটা সম্ভব নয়—প্রকৃতিগত এবং শিক্ষার তারতম্যের জন্যই। ব্রাহ্মণবংশে জাত অল্প বা অশিক্ষিতদের ক্ষেত্রে ভিক্ষা এবং কমলা-কান্তের ভাষায় 'ব্রাহ্মণ ভোজনের নিমন্ত্রণ গ্রহণ' ছাড়া আর উপায় রইল না। এর পরিণতি যে কি মর্মান্তিক তার চিত্র আছে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ে পথের পাঁচালী উপন্যাসে।—

'সকালে উঠিয়া সে (অপু) তাহাদের গ্রামের আর সকলের সঙ্গে পাশের

গ্রামের এক আদ্য-শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণে গেল।...নানা গ্রামের ফলারে বামুনের দল পাঁচ ছয় ক্রোশ দূর হইতেও হাঁটিয়া আসিয়াছে। এক-এক ব্যক্তি পাঁচ ছয়টি করিয়া ছেলেমেয়ে সংগে করিয়া আসিয়াছে; প্রত্যেকের পাতে চারিখানি করিয়া লুচি দিয়া যাইবার পর পরিবেশনকারীরা বেগুন ভাজা পরিবেশন করিতে আসিয়া দেখিল কাহারও পাতে লুচি নাই,—সকলেই পার্শ্ববর্তী চাদরে বা গামছায় লুচি তুলিয়া বসিয়া আছে।...ছোট ছেলে অতশত না বুঝিয়া পাতের লুচি ছিঁড়িতে যাইতেছে—তাহার বাপ বিশ্বেশ্বর ভট্‌চায্‌ ছোঁ মারিয়া ছেলের পাত হইতে লুচি উঠাইয়া পাশের চাদরে রাখিয়া বলিল—ওগুলো রেখে দাও না! আবার এখুনি দেবে, খেও এখন।...

ছাঁদার পরিমাণ লইয়া কর্মকর্তাদের সংগে ব্রাহ্মণদের তুমুল বিবাদ! কে একজন চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল—তাহোলে সেখানে ভদ্দর লোকেদের নেমন্তন্ন করতে নেই। স'পাঁচ গণ্ডা লুচি এ একেবারে ধরা-বাঁধা ছাঁদার রেট্‌—বল্লাল সেনের আমল থেকে বাঁধা রয়েছে। চাইনে তোমার ছাঁদা, কন্দর্পো মজুমদার এমন জায়গায় কখনও—

কর্ম-কর্তা হাতে-পায়ে ধরিয়া কন্দর্প মজুমদারকে প্রসন্ন করিলেন।

অপুও এক পুঁটুলি ছাঁদা বহিয়া আনিল। সর্বজয়া তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া হাসিমুখে বলিল—ওমা, এ যে কত এনেছিস—দেখি খোল তো? লুচি, পানতুয়া, গজা—কত রে! ঢেকে রেখে দি, সকালবেলা খেও এখন।'

এ চিত্র বর্তমান যুগের।

বৈদিক আর্যরা মূলত পশুপালক। গো-ধন তাদের বড় সম্পদ হয়ে উঠেছিল এক সময়। বিভিন্ন ক্রিয়াকান্ডে অন্যান্য দ্রব্যের চেয়ে গোধন প্রাপ্তি যে এদের সবচেয়ে ঈপ্সিত হয়ে উঠেছিল তার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায় ঋগ্বেদ থেকে শুরু করে মহাভারতের মধ্য দিয়ে প্রাচীন এবং মধ্যযুগীয় বিভিন্ন সংস্কৃত সাহিত্যে, শাস্ত্রে, আমাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান সম্পর্কিত বিভিন্ন গ্রন্থে। কিন্তু আগেই বলেছি, সবার ভাগ্যে এই দান জুটতো না। ফলে ভিক্ষাবৃত্তি এদের সম্বল হলো। কবে থেকে ব্রাহ্মণরা ভিক্ষুক? এর প্রাচীন প্রমাণ পাওয়া যায় বাল্মীকি-রামায়ণে। রাম পিতৃসত্য পালনের জন্য বনগমনে উদ্যোগী হয়ে প্রার্থীদের মনোবাঞ্ছা পূরণ করছেন। এমন সময়—ত্রিজট নামে গর্গগোত্রীয় এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ছিলেন, তিনি বনে ভূমি খনন করে (হয়তো বনজ মূল সংগ্রহ করে) জীবিকা-

নির্বাহ করতেন। ইনি জীর্ণ শাটীতে (শাড়ি) দেহ আবৃত করে তাঁর তরুণী ভার্যা ও বহু শিশু সন্তানদের নিয়ে রামের কাছে প্রার্থী হলেন। রাম পরিহাস করে বললেন, আমার অনেক ধেনু আছে, আপনি এই দন্ড যতদূর নিক্ষেপ করতে পারবেন ততদূর পর্যন্ত সব ধেনু আপনার। ত্রিজট কটিদেশে শাটী জড়িয়ে দন্ড ঘুরিয়ে সবলে নিক্ষেপ করলেন। সরযূর পরপারবর্তী গোষ্ঠে দন্ড পতিত হল। রাম বললেন, আপনি ক্রুদ্ধ হবেন না, আমি পরিহাস করে আপনার শক্তি পরীক্ষা করছিলাম। গোষ্ঠের সমস্ত ধেনু ও বৃষভ পেয়ে ত্রিজট আনন্দিত হলেন এবং রামকে বহু আশীর্বাদ করে চলে গেলেন।

ছোট্ট এই বর্ণনা থেকে রামায়ণের যুগেই ব্রাহ্মণের অধঃপতনের চিত্র সুপরিস্ফুট। পতনের অন্যতম কারণ সামাজিক দৃষ্টিকোণের পরিবর্তনও। জপতপ হোম যজন যাজন যখন তার আধ্যাত্মিক মূল্য হারিয়ে গতানুগতিকতায় পর্যবসিত হলো, তখন থেকেই ব্রাহ্মণের দারিদ্র্য এবং ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ।

সে যা-ই হোক, ব্রাহ্মণ বহুদিন ধরে সমাজের পরগাছা হতে বাধ্য হয়ে যেখানেই দানের গন্ধ পেতো, আহূত, রবাহূত বা অনাহূত হয়েও অনেক সময় সেখানে দারিদ্র্যের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে উপস্থিত হতো। অন্যদিকে দান, বিশেষ করে গোদান করলে অক্ষয় পুণ্যলাভ হয়, এই ধরণের ধ্যান ধারণা মানুষের মনে দৃঢ়মূল হয়ে গেছে (গরুই তখন অর্থনৈতিক অবস্থার মূল মানদন্ড)। এই চিন্তার বশবর্তী হয়েই দশরথ-পুত্র রামচন্দ্র দরিদ্র বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ত্রিজটকে গো-বৃষভ দান করেন।

দাতার পুণ্যলোভ যখন প্রবল হয় তখন সে নাম কেনবার দিকে ঝোঁকে। বেশি সংখ্যক লোককে দান করলে দাতা হিসাবে নাম বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়বে —এটা তো কম কথা নয়! তবু একথা সত্য যে প্রত্যেক ব্যক্তিরই সম্পদের সীমা আছে। অথচ দাতা হিসাবে নাম কেনবার আকাংক্ষা অসীম। এ দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান একটিমাত্র পথেই সম্ভব। আর তা হলো অল্প মূল্যে বহুসংখ্যক অকেজো বা প্রায় অকেজো প্রাণী কেনা বা নিজ অধিকার-ভুক্তগুলি থেকে সেই ধরণের গরু বাছাই করে দান করা।

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর কাছে গরু সম্পদ কেন? স্বল্প পরিসরে এ আলোচনা একেবারে অবান্তর হবে না বলেই মনে হয়। যাযাবর, পশুপালক, বর্বর আর্যদের কাছে গোমাংস আহার্য, গোদুগ্ধ পানীয়, প্রাথমিক

স্তরে তার চর্বি (মেধ) হোমে আহুতি এবং দীপে জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত (সুপ্রাচীন সাহিত্যে দধি বা মাখনের উল্লেখ নেই। দই না হলে মাখন বা ঘি তৈরী করা সম্ভব নয়), চামড়া গৃহস্থালীর আসবাব পত্র, পরিধেয় এবং তাঁবু তৈরির কাজে লাগতো। হাড়, দাঁত ইত্যাদি দিয়ে তৈরি হতো অস্ত্র, অলংকার। তাই পশুপালনমূলক অর্থনীতির যুগে গো-ই সম্পদ। এবং একই কারণে গো-দান পুণ্যকর্মরূপে চিহ্নিত।

কোন ধরণের গরু দানের যোগ্য? যেগুলির সন্তানাদি হয় নি, প্রজনন, বংশ বৃদ্ধির ক্ষমতা যাদের মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বর্তমান, তারাই সম্পদ। দানের যোগ্য। কিন্তু এই ধরণের গুরু বা বাছুর কিনতে যে পরিমান অর্থের প্রয়োজন, সেই মূল্যেই অকেজো গরু বহুসংখ্যক কিনে অধিকসংখ্যক প্রার্থী ব্রাহ্মণকে দিলে দানের পুণ্য এবং নাম দুই-ই বেশি হবে—এই হীন কৌশল অবলম্বন উপনিষদের যুগেই যে শুরু হয়ে গিয়েছিল তরে প্রমাণ আছে 'কঠ'—উপনিষদে।

আমরা নচিকেতার সশরীরে যমলোকে গমনের উপনিষদ-কথিত কাহিনী জানি অনেকেই। কিন্তু জানিনা পূর্ণভাবে, তার জীবনে এই পরিস্থিতি ঘটলো কেন। তাই কঠ-উপনিষদের প্রথম অংশ আক্ষরিক অনুবাদের মধ্য দিয়ে তুলে ধরছি এখানে। এখান থেকেই বুঝতে পারবেন 'মরা / কানা গরু বামুনকে দান' এই প্রবাদের জন্ম কেমন করে হলো।

এই উপনিষদের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম বল্লীতে আছে—বাজশ্রবস্ নামক মুনি যজ্ঞফল কামনা করে পুরাকালে বিশ্বজিৎ যজ্ঞ সম্পাদন পূর্বক সেই যজ্ঞে নিজের সর্বস্ব দান করেছিলেন। সেই বাজশ্রবস্ মুনির নচিকেতা নামে এক পুত্র ছিল। ॥ ১। ১। ১ ॥ যজ্ঞ সম্পাদনের পরে ঋত্বিক ও সদস্যগণকে দক্ষিণা দেওয়ার উদ্দেশ্যে যখন গাভীসকল বিভিন্ন স্থানে নেওয়া হচ্ছিল তখন সাধুচিত্ত কুমার নচিকেতার হৃদয়ে শ্রদ্ধার উদ্রেক হল এবং শ্রদ্ধাবশত তিনি মনে করলেন ॥ ১। ১। ২ ॥ এইসব গাভী জন্মের মত জলপান করেছে, আর করবে না; জন্মের মত তৃণভোজন করেছে, আর করবে না; জন্মের মত এদের দুগ্ধ দোহন করা হয়েছে, আর হবে না। এরা ইন্দ্রিয়শক্তিহীন এবং সন্তানোৎপাদনে অসমর্থ। এই প্রকারের গাভী যে যজমান দক্ষিণা স্বরূপ দান করেন তিনি মৃত্যুর পর অনন্দ নামক আনন্দহীন লোকসমূহে গমন করেন ॥ ১। ১। ৩ ॥

অর্থাৎ যে গাভীগুলি যজ্ঞের দক্ষিণাস্বরূপ দেওয়া হচ্ছিল, সেগুলি ছিল

অতিবৃদ্ধ। তাই সংগত কারণেই প্রজননের মাধ্যমে সম্পদ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় তথা নিষ্ফলা তথা কানা মৃত / মরা। বাজশ্রবস্ যজমান। তিনি 'বিশ্বজিৎ' যজ্ঞ করেন। উদ্দেশ্য—দান করে নাম কিনবেন, বিশ্বকে জয় করবেন। পুণ্য এবং নামের লোভে তিনি শাস্ত্র বিরুদ্ধ, শ্রদ্ধাহীন দানে তৎপর। এই ধরণের দানে পুণ্য হওয়া দূরে থাকুক বরং পাপ হয়, এ বোধও তিনি হারিয়ে ফেলেছেন।

আমাদের প্রশ্ন, এই পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য দায়ী কে? উত্তর—প্রথম পর্যায়ে ব্যক্তি তথা পারিবারিক সম্পদ সম্পর্কে ধারণা বা বোধের উন্মেষ, দ্বিতীয় পর্যায়ে পৌরোহিত্য। আদিম সাম্যবাদী জীবনযাত্রা থেকে সরে এসে যেদিন মানুষের মনে সম্পদ সম্পর্কে ধারণা জন্মালো, যেদিন সে পরিবার-একক সৃষ্টি করলো সেই দিনই এই নীচ-মানসিকতার বীজ উপ্ত হলো তার মনে। সেই উপ্ত বীজকে পারলৌকিক চিন্তা, স্বর্গসুখ বা নরক বাসের আনন্দ / বিষাদানুভূতির জলসিঞ্চন করে অংকুরিত হয়ে বাড়তে সাহায্য করেছে ধীরে ধীরে। অবশ্য একথা ঠিক যে পরলোক-চিন্তা এবং ঐহিক সুখ ভোগের আকাংক্ষা—এই দুই চিন্তার মিশ্র ফসল এই ধরণের দান। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র ভারতীয় আর্য-সভ্যতার অবসানের শেষে, মধ্যযুগীয় চিন্তাধারার উন্মেষ পর্বে কোন ধরণের আর্থ-সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের শিকার কেমন করে হতে বাধ্য হয়েছিল তার আলোচনা আগেই করেছি। ফলে নিজে কায়িক পরিশ্রম না করে অন্যের শ্রম-লব্ধ সম্পদ করায়ত্ত করার কৌশল উদ্ভাবন করতে বাধ্য হয়েছে নিজের অসহায়ত্বের জন্য। জন্ম সূত্রে চতুরাশ্রম প্রথার সৃষ্টির সময় সে একবারও ভাবেনি বা ভাবতে পারে নি যে কি বিষবৃক্ষ সে রোপণ করলো। এই বিষবৃক্ষের শাখা থেকে যে বুমেরাং সৃষ্ট হবে তা যে নিজের বুকেই ফিরে এসে বিঁধবে তা তার ভাবনার মধ্যেই আসে নি। সে ভাবে নি যে অনাগত ভাবী প্রজন্মসমূহ এই ধরণের অমানবিক কাজে নির্দ্বিধায় লিপ্ত হবে, মরা গরু বামুনকেই দান করবে, যেমনটি ঘটেছে বাজশ্রবসের ক্ষেত্রে।

ব্রাহ্মণকে গোদ্দানের এই বিধান সমাজের উপর দুই দিক থেকে বিপরীত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। একদিকে যে ব্রাহ্মণসম্প্রদায় একদিন নব নব বিদ্যার দ্বার উদ্ঘাটন করতো তাদের করে তুলেছে ভিক্ষোপজীবী, পর-মুখাপেক্ষী, প্রার্থী, অন্যদিকে দানকে কেন্দ্র করে দাতার মনে ছলনা সৃষ্টির অবকাশ। আজকের ব্রাহ্মণ-বংশোদ্ভূত অনেকেই যজন-যাজন ক্রিয়া বা ব্রাহ্মণ ভোজনের নিমন্ত্রণ গ্রহণ

বা 'ছাঁদা বাঁধা' কাজগুলিকে প্রসন্ন মনে গ্রহণ করেন না।—এরও সাক্ষ্য দেয় অপুর শ্রাদ্ধ বাড়ি থেকে খাবার নিয়ে আসার চিত্রের অন্য একটি দিক।

সর্বজয়া খুশির সঙ্গে (ছাঁদার) পুঁটলিটা ঘরে লইয়া গেল।

খানিক পরে অপু সুনীলদের বাড়ী গেল। উহাদের ঘরের রোয়াকে পা দিয়াই শুনিল, সুনীলের মা সুনীলকে বলিতেছেন—ওসব কেন বয়ে আনলি বাড়ীতে? কে আনতে বলেচে তোকে? সুনীলও সকলের দেখাদেখি ছাঁদা বাঁধিয়াছিল, বলিল—কেন মা সবাই তো নিলে—অপুও তো এনেচে।

সুনীলের মা বলিলেন—অপু আনবে না কেন—ও ফলারে বামুনের ছেলে! ও এর পর ঠাকুর-পুজো করে ছাঁদা বেঁধে বেড়াবে,—ওই ওদের ধারা। ওর মা-টাও অমনি হ্যাংলা। ঐজন্যে আমি তখন তোমাদের নিয়ে এ গাঁয়ে আসতে চাই নি। কু-সঙ্গে পড়ে যত কু-শিক্ষে হচ্ছে। যা, ওসব অপুকে ডেকে দিয়ে আয়—যা, না হয় ফেলে দিগে যা। নেমন্তন্ন করেচে নেমন্তন্ন খেলি—ছোট লোকের মত ওসব বেঁধে আনবার দরকার কি!

অপু ভয় পাইয়া সুনীলদের ঘরে ঢুকিল না। বাড়ী ফিরিতে ফিরিতে ভাবিল—যাহা তাহার মা পাইয়া এত খুশি হইল, জ্যেঠাইমা তাহা দেখিয়াই এত রাগিল কেন?

সমাজ-পটভূমির পরিবর্তন হওয়ার ফলে এই যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তাকে অনুধাবন করতে না পারলে, সমস্যার মর্মমূলে প্রবেশ করতে না পারলে 'মরাগরু'ই দারিদ্র্য-পীড়িত, হতাশাক্লিষ্ট পুরোহিত দাবী করতে থাকবেন আরও বহুদিন ধরে ধর্মের নামে, পারলৌকিক ক্রিয়ার নামে। অন্য দিকে আজকের জীবনযাত্রায় অর্থহীন ক্রিয়াকান্ড করতে বাধ্য হয়ে যজমানও 'মরাগরু' দিতে থাকবে। কোনো ক্ষেত্রের জীবন-যন্ত্রণা কমবে না। বরং সংস্কারের বশবর্তী হয়ে প্রাচীন ধারাকে আঁকড়ে থাকার মধ্য দিয়ে এক কালের সমাজ-পটভূমিতে এদের মূল্য কি ছিল, আজ কেন তা অর্থহীন এ ধরণের চিন্তা করার মানসিকতাও হারিয়ে ফেলবে। সমাজ-বিবর্তনের ঐতিহাসিক ধারাকে জানবে না। অথচ বলেই চলবো—আমাদের অতীত কত সুন্দর ছিল, মুনি ঋষিরা কত মহান ছিলেন!

আজ প্রবাদের মূলে যে গো এবং ব্রাহ্মণ ছিল তারা অন্যান্য বস্তু এবং মানুষ দ্বারা স্থানচ্যুত। এখন যেকোনো প্রার্থীকে দানের নামে ছলনা করলেই বলি 'মরাগরু বামুনকে দান।' প্রবাদটির আধুনিক প্রয়োগে আছে বক্তার বিস্ময়,

হতাশা বোধ আর প্রচ্ছন্ন বেদনা বা অনুকম্পার মনোভাব।

বর্ণাশ্রম নয়, অর্থনৈতিক-শ্রেণীবিভক্ত বর্তমান সমাজে আলোকোজ্জ্বল উৎসব-গৃহের বিলাস-সজ্জার পাশে, উৎসব শেষে, বালতির তলা কেচে যখন পথের 'ভিখারীগুলো খেয়ে বাঁচুক' বলে তাদের দানের নির্দেশ দেন, ভদ্রমানুষের ভুক্তাবশিষ্ট খাদ্যনামীয় অখাদ্যগুলিকে গৃহস্বামী। তখন 'দরিদ্র-নারায়ণসেবা'র এই রূপ দেখলেও আলোচ্য প্রবাদের কথা-ই মনে পড়ে।

কাল চির বহমান। জীবন ও সমাজ এগিয়ে চলে। কিন্তু বিশেষ যুগ-পটভূমিতে এক একটা ঘটনা ঘটে, যা বহুদিন ভবিষ্যৎ-মানুষ মনে রাখে। ঘটনার নির্যাসকে সংহত করে জন্ম নেয় প্রবাদ।

আষাঢ়ে গল্প

বঙ্কিমচন্দ্রের অনবদ্য-সৃষ্টি ফুলমণি নাপিতানীকে নিশ্চয়ই আপনাদের মনে আছে। সেই যে,—জমিদার পরাণ চৌধুরীর গোমস্তা দুর্লভ চক্রবর্তীর যে অনুগৃহীতা, অথবা দুর্লভ চক্রবর্তী যার অনুগৃহীত; এবং যে দুর্লভের প্ররোচনায়, প্রফুল্লর মায়ের মৃত্যুর পর রাত্রিতে তার ঘরের দরজা খুলে দিয়ে প্রফুল্লকে দেবীচৌধুরানীতে রূপান্তরিত হতে সাহায্য করেছিল।

অপহরণের পরের দিন ফুলমণির দিদি তাকে জাগিয়ে প্রফুল্লর কথা যখন জিজ্ঞেস করল, 'ফুলমণি তখন এক আষাঢ়ে গল্প ফাঁদিল। ফুলমণি প্রফুল্লের বিছানায় রাত্রি তৃতীয় প্রহরের সময়ে তার মাকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছিল। পরক্ষণেই ঘরের ভিতর একটা ভারি ঝড় উঠিল—তারপর আর কেহ কোথাও নাই। ফুলমণি মূর্চ্ছিতা হইয়া দাঁতকপাটি লাগিয়া পড়িয়া রহিল।' ইত্যাদি। ফুলমণি উপন্যাসের উপসংহারকালে দিদিকে বিশেষ করিয়া সাবধান করিয়া দিল, "এসকল কথা কাহারও সাক্ষাতে বলিস না—দেখিস আমার মাথা খাস।"

দিদি বলিলেন, "না গো। একথা কি বলা যায়?" কিন্তু কথিতা দিদি-মহাশয়া তখন চাল ধুইবার ছলে ধুচনি হাতে পল্লী-পরিভ্রমণে বাহির হইলেন এবং ঘরে ঘরে উপন্যাসটি সালঙ্কার ব্যাখ্যা করিয়া, সকলকে সাবধান করিয়া দিলেন যে, দেখ, একথা প্রচার না হয়। কাজেই ইহা প্রচারিত হইয়া রূপান্তরে প্রফুল্লের শ্বশুরবাড়ী গেল। রূপান্তর কিরূপ? পরে বলিব।'

পাঠক নিশ্চয়ই দেবীচৌধুরানী উপন্যাসের প্রথম খণ্ডের দশম পরিচ্ছেদের উল্লিখিত অংশটিকে ভোলেননি? এবং ভোলেননি প্রকৃত ঘটনাটি।

আর তা যদি মনে থেকে থাকে, তাহলে একথাও স্বীকার করতে বাধ্য হবেন যে, প্রকৃত ঘটনা ফুলমণি তার দিদির কাছে বলে নি। সে একটা ভৌতিক পরিবেশ মিশ্রিত মিথ্যা কাল্পনিক কাহিনী সৃষ্টি করে নিজের দিদিকে বুঝিয়েছিল।

দিদিও বোনের নিষেধ না শুনে, শ্রুত-কাহিনীতে আপন মনের রঙ মিশিয়ে পল্লবিত করে এমনভাবে প্রচার করেছিল যাতে তা প্রফুল্লর শ্বশুরবাড়িতে পেঁছুল। কী রূপে তা পেঁছেছিল তা দেবীচৌধুরানীর পাঠকমাত্রেই জানেন। এবং বর্তমাম-প্রসঙ্গে তা অবান্তর বলে পাঠকের দৃষ্টি অন্যদিকে ফেরাতে চাই।

ফুলমণির মিথ্যা-ভাষণকে বঙ্কিমচন্দ্র সোজাসুজি "এক আষাঢ়ে গল্প" আখ্যায় ভূষিত করলেন। কারণ, বাংলাভাষায় প্রচলিত এই প্রবাদটি কাল্পনিক কাহিনী, মিথ্যা কথা—এই অর্থেই প্রচলিত। শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বঙ্গীয় শব্দকোষ-এ একে careless chat বলেছেন। অদ্ভুত গল্প অর্থেও প্রবাদটি ব্যবহৃত হয়।

আলোচ্য প্রবাদটি বঙ্কিম-পূর্বযুগ থেকেই বাংলাভাষায় যে ব্যবহৃত হচ্ছে তার প্রমাণ, বহু-প্রচলিত জেনেই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর লেখায় এটিকে ব্যবহার করেছেন। আমাদের প্রশ্ন—মিথ্যাভাষণই হোক, আর কাল্পনিক কাহিনীই হোক, তাঁর বক্তব্য-টিকে প্রকাশ করতে গিয়ে প্রবাদটির প্রবক্তা 'আষাঢ়' এবং 'গল্প' এই শব্দ দুটিকে বেছে নিলেন কেন?

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের মতে, 'পূর্ব্বে বাঙ্গালার ছেলেমেয়েরা বৃদ্ধাদিগের নিকট বসিয়া বহুবিধ অদ্ভুত ও আনন্দজনক গল্প শুনিয়া আষাঢ়ের দীর্ঘদিবস-গুলি কাটাইত।' বঙ্গীয় শব্দকোষও বলেন, আষাঢ়ে গল্প—আষাঢ়ে বাদলের দিনে ঘরে আবদ্ধ ছেলেপিলেদের কাছে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের উপকথা। "রবীন্দ্রনাথ দুঃখ করে বলেছেন, 'আষাঢ়ে গল্প সে কই আমাদের নিতান্তই ঘরের জিনিষ।"

রবীন্দ্রনাথ যে গল্পকাহিনীকে "আমাদের নিতান্তই ঘরের জিনিষ" বলে অভিহিত করেন, তাকে জ্ঞানেন্দ্রমোহন মনে করেন, বাংলার ছেলেমেয়েরা আগেকার দিনে সেগুলি "আষাঢ়ের দীর্ঘ দিবসগুলিতে" শুনে সময় কাটাত।

'আষাঢ়ের বাদলের দিনে ঘরে আবদ্ধ ছেলেপিলেদের কাছে বৃদ্ধবৃদ্ধাদের উপকথা' বলবার এই রীতি কি বাংলার একান্ত নিজস্ব সম্পদ? না কি গল্প-বলার এ এক সাধারণ রীতি?

মনে পড়ে কালিদাসের অমরকাব্য 'মেঘদূতম্'-এর কথা। এই কাব্যের স্বাধিকার-প্রমত্তঃ কশ্চিৎ যক্ষঃ-এর মনোবেদনার কথা বলতে গিয়ে কবির মনে পড়ল, যক্ষ, কান্তা-বিরহ-গুরুণা বর্ষভোগ্যেন ভর্তুঃ শাপেন অস্তংগতমহিমা জনকতনয়া-স্নানপুণ্যোদকেষু স্নিগ্ধচ্ছায়া-তরুষু রামগির্যাশ্রমেষু বসতিং চক্রে।

তস্মিন্নদ্রৌ কতিচিদবলা-বিপ্রযুক্তঃ স কামী।
নীত্বা মাসান্ কনকবলয়-ভ্রংশরিক্তপ্রকোষ্ঠঃ ॥

নববিবাহিত যক্ষ নবপরিণীতা বধূর কথা চিন্তা করতে গিয়ে, নিয়োগকর্তা প্রভুর কর্তব্যে অবহেলা করে যে অপরাধ করেছে, তৎকালে প্রচলিত তার সমুচিত ফল লাভ করে সে রামগিরি-আশ্রমে নির্বাসিত হয়েছে। নির্বাসন-দণ্ডকে মাথা পেতে নিয়ে, তার যন্ত্রণা সে নীরবে ভোগ করেছে। একটি কথাও বলে নি। তার সেই নির্বাক-মনের বেদনার ভাষা প্রকাশিত হয়েছে—'কনকবলয়-ভ্রংশরিক্ত-প্রকোষ্ঠঃ'-এই শব্দগুচ্ছে।

কিন্তু, এই অবস্থা তো একদিনে হয়নি। হয়েছে 'কতিচিৎ মাসান্ নীত্বা'। বেশ কয়েক মাস নির্বাসন ভোগের ফলে সে এত রোগা হয়েছে যে, হাতের বালা কখন খুলে পড়ে গেছে, তার বিন্দু বিসর্গও সে জানতে পারে নি।

টীকাকার বলেছেন যে, এই 'কতিচিৎমাসান্' হচ্ছে আটমাস। আটমাস ধরে নির্বাসন দন্ড ভোগ করেছে। একটি কথাও বলেনি সে। হয়তো বলবার মত মানসিক শক্তিও তার ছিল না। অথবা, এটাই স্বাভাবিক যে, নির্জন রামগিরি পর্বতে কথা বলার মত লোক পায়নি বলেই কোনো কথা বলে নি সে। কিন্তু, যে মুহূর্তে আষাঢ়স্য প্রথমদিবসে মেঘমাশ্লিষ্ট-সানুং।

বপ্রক্রীড়া-পরিণতগজপ্রেক্ষণীয়ং দদর্শ ॥—সেই মুহূর্তেই তার বিরহ-বেদনার কথা বলতে শুরু করল। কাছে তো লোক নেই। তা হোক। মেঘ তো আছে। তাকে দিয়েই চলবে। তাই,

স প্রত্যগ্রৈঃ কুটজ-কুসুমৈঃ কল্পিতার্ঘ্যায় তস্মৈ।
প্রীতঃ প্রীতি-প্রমুখ-বচনং স্বাগতং ব্যাজহার ॥

বনকুসুমের অর্ঘ্যে মেঘের স্তুতি করে শুরু করল তার বক্তব্য।

আষাঢ়ের প্রথম দিনেই মুখ খুলল যক্ষের। সে আরম্ভ করল তার জীবনের রূপকথা বলতে। অর্থাৎ, আষাঢ়ে রূপকথা বা উপকথা বলার ট্র্যাডিশন বাংলার একান্ত নিজস্ব সম্পদ নয়, বঙ্গেতর প্রদেশেও আছে।

কিন্তু, যক্ষ না হয় নিজের জীবনের বেদনার রূপকথা 'আষাঢ়স্য প্রথমদিবসে' বলতে শুরু করেছিল, আর তা বলেছিল মেঘকে! মেঘ তো আর যক্ষের কথা কালিদাসকে বলে দেয় নি! সে বলেনি যে, মেঘকে সে নিজের দুঃখের কথা আষাঢ়ের প্রথম দিবসে বলতে শুরু করেছিল।

কিন্তু, কালিদাস যক্ষের সেই বিরহ-যন্ত্রণার কথা, তার জীবনের উপকথা যে 'মেঘদূতম্'-কাব্যে লিখলেন, তার রচনা কবে শুরু করেছিলেন ? উত্তর খুঁজতে গিয়ে মনে পড়ে—

হায়রে কবে কেটে গেছে কালিদাসের কাল।
পণ্ডিতেরা বিবাদ করেন লয়ে তারিখ সাল।

এক্ষেত্রে কিন্তু বিবাদের প্রয়োজন নেই। রবীন্দ্রনাথ মেঘদূত-কাব্যের রচনারম্ভের তারিখ নিয়ে কোনো বিবাদের অবকাশ রাখেন নি। তিনি তাঁর 'মানসী'-কাব্যের 'মেঘদূত'-কবিতায় সোজাসুজিই বললেন,—

কবিবর, কবে কোন বিস্মৃত বরষে
কোন পুণ্য আষাঢ়ের প্রথম দিবসে
লিখেছিলে মেঘদূত!

রবীন্দ্রনাথের মতে কালিদাস তাঁর মেঘদূত রচনা করেছিলেন কবে কোন 'আষাঢ়ের প্রথম দিবসে।' কালিদাসের কাল নিয়ে পণ্ডিতরা বিবাদ করেন। অর্থাৎ, কে জানে—কত শতাব্দী কেটে গেছে মেঘদূত-রচনার প্রথম-আষাঢ়ের দিনটির পর। আবার কালিদাস যে কুবের-যক্ষ যক্ষপ্রিয়ার কাহিনী অবলম্বন করে মেঘদূত রচনা করলেন, তাদের জীবনকথাও বহু শতাব্দী ধরে তদানীন্তন জনজীবনে রূপকথার মতই চলে আসছিল। তা নইলে কালিদাস তাদের পেলেন কোথায় ? এক কথায় বলা যায়, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আষাঢ়ে রূপকথা বলার যে ট্র্যাডিশন সর্বভারতীয় জনজীবনে চলে আসছে, কালিদাস তাকেই তাঁর অমরকাব্য 'মেঘদূতম্'-এ স্থায়ী রূপ দিয়ে বিশ্বজ্জন সমাজে প্রতিষ্ঠিত করলেন। আর, এই সত্যকে যদি মেনে নেওয়া যায়, তবে কালিদাসের অমরকাব্য মেঘদূত-ও একটি কাব্যকারে আষাঢ়ে গল্প।

আমরা মেঘদূতকে একটি আষাঢ়ে গল্প বলায় অনেকেই হয়তো বর্তমান লেখকের প্রতি যে সদুক্তি বর্ষণ করতে চাইবেন, তা হল, এ লেখক কেবল ক্ষমার অযোগ্য অপরাধই করেনি, এ ব্যক্তি অনুকম্পারও অনুপযুক্ত।

এ কথা শিরোধার্য করেও আবার বলছি—মেঘদূত একটি আষাঢ়ে গল্প। গল্প বলছি এই জন্য যে কাব্যাকারে লিখিত হলেও মেঘদূত একটি দীর্ঘ গল্প। রামগিরি পর্বত থেকে শুরু করে অলকাপুরী পর্যন্ত মেঘের যে পথরেখা কালিদাস অঙ্কিত করেছেন, সেই পথের দুপাশে গল্প রসিকের উপভোগ্য অসংখ্য জীবন-

রসকথা ছড়িয়ে আছে। 'পূর্বমেঘ' আর 'উত্তরমেঘ'-এর পথ ধরে কেবল যক্ষের মেঘই চলছেনা ; চলেছেন কাব্য-রসের আস্বাদন করতে করতে, যুগ যুগ ধরে গল্পরস-পিপাসু অসংখ্য পাঠক বা শ্রোতৃবৃন্দও।

কুবের-পুরীতে থাকবার সময় ছুটি কাটাতে যক্ষ নিশ্চয়ই অলকাপুরীতে তার বাড়িতে যেতো! যাবার সময় পথের দুপাশের প্রকৃতি-পরিবেষ্টিত যে মানুষ এবং তাদের তদানীন্তন যে কীর্তি-সমূহকে সে প্রত্যক্ষ করেছিল, তারা ছিল কালিদাসের সমকালীন লোককথায়। সেই লোককথাকে স্বাঙ্গীকৃত করে কালিদাস তাকে ধরে রাখলেন কাব্যের আধারে। মেঘদূতে তাই, কাব্যাকারে বিধৃত সে-কালের লোককথা, রূপকথা, উপকথা বা গল্প।

আট মাসের বিরহী-জীবনে যেসব স্মৃতিকথা ক্ষণে ক্ষণে যক্ষের মনে ভেসে উঠত, তাদেরই সুসংহত প্রকাশ সে ঘটিয়েছিল আষাঢ়ের প্রথম দিনের মেঘকে দেখে, গল্পাকারে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'আষাঢ়ের প্রথম দিবসে' সেই-চিরায়ত লোক-কথাকে কাব্যরূপ দিলেন কালিদাস।

তাই বলছিলাম, মেঘদূত একটি আষাঢ়ে গল্প।

২

আষাঢ়ে গল্প বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের কাছ থেকে কেবল বাংলার ছেলেপিলেরাই আষাঢ়ের দীর্ঘ বাদলা দিনে শোনে—একথা ঠিক নয়। মেঘদূত-এর একত্রিংশত্তম শ্লোকে সমকালীন লোককথাকে অবলম্বন করে যক্ষের মুখে কালিদাস বলছেন।

প্রাপ্যাবন্তীনুদয়নকথাকোবিদগ্রামবৃদ্ধান্
পূর্বোদ্দিষ্টানমনুসর পুরীং শ্রীবিশালাং বিশালম্।
স্বল্পীভূতে সুচরিতফলে স্বর্গিনাং গাং গতানাং
শেষৈঃ পুণ্যৈর্হৃতমিব দিবঃ কান্তিমৎখণ্ডমেকম্ ॥ ৩১

—এরপর তুমি যাবে অবন্তীদেশে ; এখানকার গ্রামবৃদ্ধেরা উদয়ন-কাহিনীতে সুদক্ষ—সেখান থেকে যাবে সম্পদে ও সৌন্দর্যে বিশাল 'বিশালা' (উজ্জয়িনী, অবন্তীর রাজধানী) নগরীতে। তোমার মনে হবে, বহু পুণ্যফলে যাঁরা স্বর্গে গিয়েছিলেন তাঁরা সবটুকু পুণ্য ক্ষয় হবার আগেই ফিরে এসেছেন পৃথিবীতে এবং আসবার সময় স্বর্গের সৌন্দর্যময় এক অংশ সঙ্গে এনেছেন।

আলোচ্য শ্লোকের প্রথম-চরণের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ বলেছেন, 'ভাই! তারপরই তুমি গিয়া অবন্তীতে পড়িবে। সে স্থানে

'অন্ভুতার্থা বৃহৎকথা'র বড় প্রচার। সেই প্রদ্যোতের দুহিতার বৎসরাজ উদয়ন-কর্তৃক হরণের গল্প লইয়া গ্রামবৃদ্ধগণ বড় ব্যস্ত। এখানে দশজন, ওখানে পাঁচজন বসিয়া গ্রাম্য গোষ্ঠীবন্ধনে এ ব্যাপার লইয়া সর্বদাই কত গল্পগুজব হয়।

'উদয়ন কথা' গুণাঢ্য-রচিত 'বৃহৎকথা' নামক শ্লোকাত্মক রচনার অন্তর্গত। 'বৃহৎকথা' এই নামটিই প্রমাণ করে যে, এটি বহুকাল ধরে লোক-প্রচলিত বহু কথা বা উপাখ্যানের একটি সংকলন গ্রন্থ। পৈশাচীভাষায়, খ্রীষ্টয় প্রথম বা দ্বিতীয় শতক থেকে শুরু করে চতুর্থ শতক পর্যন্ত এর রচনাকাল বলে পন্ডিতরা অনুমান করেছেন। এ অনুমান যদি সত্য হয়, তবে বলতে হবে হবে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের অনেক, অনেক—আগে থেকে প্রচলিত বহু লোককথা বৃহৎকথা গ্রন্থে স্থানলাভ করেছে। আর, তা কেমন করে বিস্তৃতি লাভ করেছে তার প্রমাণ পাওয়া যায় শ্রীবিদ্যাভূষণের উদ্ধৃত ব্যাখ্যার—'এখানে দশজন ওখানে পাঁচজন বসিয়া গ্রাম্য গোষ্ঠী-বন্ধনে এ ব্যাপার লইয়া সর্বদাই কত গল্পগুজব হয়।'—এই বাক্যটিতে। এ গল্প গুজবের প্রকৃতি কি, সেগুলিতে রূপান্তর কেমন করে ঘটে, তা আমাদের প্রথম দিকে উদ্ধৃত দেবীচৌধুরাণী উপন্যাসের ফুলমণির 'দিদিমহাশয়া'র আচরণকে ব্যাখ্যা করলেই বোঝা যাবে।

যা-ই হোক, 'বৃহৎকথা'র উদয়নকথা নিয়ে যারা গল্পগুজব করেন তারা কারা? কালিদাস তাদের সম্পর্কে বলেছেন, 'উদয়নকথা-কোবিদগ্রামবৃদ্ধ।' কথা-কোবিদ। শব্দটির অর্থ কী? উল্লিখিত শ্লোকের টীকায় মল্লিনাথ বলেছেন, 'ওকস্য বেদ্যস্থানস্য বিদাঃ কোবিদাঃ।' ওক-শব্দের অর্থ বাসস্থান, সদ্ম, গৃহ। অর্থাৎ, নিজেদের বাসস্থান, গৃহ, পরিবেশ-সম্পর্কিত জ্ঞাতব্য বিষয়ে যাঁরা বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি, তাঁরাই কোবিদ। মেঘদূতের কোবিদরা উজ্জয়িনীতে বসে উদয়নকথা আলোচনা করেন। অর্থাৎ, গুণাঢ্য তাঁর বৃহৎকথায় যে লোক-কাহিনীগুলি ধরে রেখেছেন, কালিদাসের যুগেও সেগুলি অবন্তীর কোবিদদের মুখে মুখে ফিরত। প্রমাণ, মেঘদূতের আলোচ্য শ্লোকটি।

কেবল বাঙালী পাঠকের কাছেই নয়, সর্বভারতীয় জনগণের কাছে 'বৃহৎকথা' আজ একটি নাম মাত্র। পৈশাচীভাষায় রচিত এ গ্রন্থ বহুকাল আগেই হারিয়ে গেছে মহাকালের অতলে। দন্ডীর 'কাব্যাদর্শে' (১। ৩৮), বাণভটের 'হর্ষচরিতে'র প্রারম্ভিক শ্লোক (১৭) 'কাদম্বরীতে', সোমদেবের যশস্তিলক চম্পূ, ধনপালের 'তিলকমঞ্জরী', দন্ডীর 'দশকুমার চরিত', সুবন্ধুর 'বাসবদত্তা', ভাসের 'স্বপ্নবাস-

বদত্তা' ও 'প্রতিজ্ঞা যৌগন্ধ-নারায়ণ', শ্রীহর্ষের 'রত্নাবলী' ও 'প্রিয়দর্শিকা' এবং কালিদাসের 'মেঘদূতে'র 'পূর্বমেঘে'র আলোচ্য ৩১ সংখ্যক শ্লোকে ক্ষীণ অথবা পীন ধারায় বেঁচে আছেন গুণাঢ্য।

বাঙালী পাঠক বৃহৎকথাকে না জানলেও সোমদেবের 'কথাসরিৎসাগর'কে চেনেন। সোমদেব নিজেই স্বীকার করেছেন এবং নিজ গ্রন্থ সম্বন্ধে বলেছেন, 'পৈশাচীভাষায় নিবন্ধ বৃহৎকথা-গ্রন্থের সার সংগ্রহ পূর্বক এই গ্রন্থ রচনা করিতেছি।' কথাপীঠ, কথামুখ, লাবাণক, নরবাহন দত্তের জন্ম, চতুর্দারিকা, মদনমঞ্চকা, রত্নপ্রভা, সূর্যপ্রভা, অলংকারবতী, শক্তিযশা, বেলা, মদিরাবতী, মহাভিষেক, পঞ্চ-লম্বক, সুরতমঞ্জরী, পদ্মাবতী ও বিষমশীল,—এই যে আঠারোটি লম্বকে কথাসরিৎসাগর রচিত। তার লাবানক-নামক লম্বকের ষোড়শ তরঙ্গে মগধরাজ প্রদ্যোৎসিংহের কন্যা পদ্মাবতীর বিবাহের বিষয় কথিত আছে।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ বলেছেন, প্রদ্যোতের কন্যার বৎসরাজ উদয়ন কর্তৃক হরণের গল্প নিয়ে অবন্তীর কোবিদগণ গল্প করেন। কিন্তু কথাসরিৎসাগর-অনুসারে, উদয়ন পদ্মাবতীকে হরণ করেন নি। মন্ত্রী যৌগন্ধনারায়ণের কূট-কৌশলে প্রতারিত রাজা প্রদ্যোৎসিংহ কন্যা পদ্মাবতীকে উদয়নের হস্তে অর্পণ করেন। হরণ যাকে উদয়ন করেছিলেন তিনি উজ্জয়িনীরাজ চন্ডমহাসেনের কন্যা, উদয়নের অন্যতমা প্রিয়তমা মহিষী বাসবদত্তা।

প্রথমে আমরা কথাসরিৎসাগর-বর্ণিত উদয়ন-বাসবদত্তা বিবাহ প্রসঙ্গের উল্লেখ করছি; পরে পদ্মাবতী-উদয়ন-পরিণয়। আমাদের উদ্দেশ্য গল্প বলা নয়, এই দুই কাহিনীতে আষাঢ়ে গল্পের উপাদান খোঁজা।

উজ্জয়িনীরাজ চন্ডমহাসেনের অলোক-সামান্য রূপবতীকন্যা যৌবনপ্রাপ্ত হলে বৎসরাজ উদয়নের মহামন্ত্রী যৌগন্ধনারায়ণ মহারাজের কাছে বাসবদত্তার পাণিগ্রহণের প্রস্তাব রাখলেন। কিন্তু, উজ্জয়িনীর সঙ্গে বৎসরাজ্যের দীর্ঘ বৈরিতা। উদয়ন চন্দ্রমহাসেনের বিরুদ্ধে যখন যুদ্ধযাত্রায় প্রস্তুত হচ্ছিলেন, তখন মন্ত্রীর কথায় তাঁর মনে বাসবদত্তা-লাভের আকাংক্ষা তীব্র হল।

কিন্তু, বাসবদত্তা-লাভের পক্ষে অন্তরায় আছে। কারণ দীর্ঘ বৈরিতা। উদয়ন বাল্যে নাগরাজ বাসুকির অগ্রজ বসুনেমিকে এক ব্যাধের কবলে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করায় সে উদয়নকে একটি বীণা প্রদান করে। উদয়ন তখন থেকেই বীণাবাদন-পারদর্শী হিসাবে বিস্তৃত খ্যাতি লাভ করেন। পরে উদয়ন

রাজা হলে, তাঁকে শত্রু জেনেও, চণ্ডমহাসেন উপযুক্ততম পাত্র বিবেচনা করে, কৌশলে উদয়ন-বাসবদত্তার পরস্পরের প্রতি অনুরাগ-সৃষ্টির জন্য একটি পরিকল্পনা করে, বৎসরাজের কাছে এই বলে দূত প্রেরণ করেন যে, উদয়নের কাছে বাসবদত্তা বীণাবাদন-শিক্ষাভিলাষিণী। উদয়ন যেন আমন্ত্রণ গ্রহণ করে উজ্জয়িনীতে আসেন। উদয়ন এতে অপমানিত বোধ করে নিজের এক দূতকে উজ্জয়িনীতে এই বলে প্রেরণ করেন যে, বাসবদত্তা যদি বীণাবাদন শিখতে চান, তবে তাঁর পিতা যেন কন্যাকে বৎস-রাজধানীতে প্রেরণ করেন। এ প্রস্তাবও চণ্ডমহাসেনের মনঃপূত না হওয়ায় আপাতত নীরব হলেন। কিন্তু মনে মনে অভীষ্টপূরণের পরিকল্পনা করতে লাগলেন। এবং তারই ফলে রাজাদেশে এক ঐন্দ্রজালিকের দ্বারা নির্মিত হল এক কৃত্রিম হস্তী। ঐন্দ্রজালিকের বিদ্যার গুণে হস্তিবর রক্ষিপুরুষদের সহায়তায় উপস্থিত হল বিন্ধ্যাটবীতে।

রাজা উদয়নের বনরক্ষীরা এই 'ভয়ংকর বনগজ'-এর সংবাদ রাজধানীতে পেঁছে দিলে উদয়ন স্বয়ং তার নিধনের জন্য অগ্রসর হয়ে বীণা বাজাতে বাজাতে একাকী যখন বহুদূরে এসে পেঁছুলেন, তখন সহসা হস্তি-উদর থেকে কিছু সংখ্যক বীরপুরুষ নির্গত হয়ে উদয়নকে পরাজিত ও বন্দী করে নিয়ে গেল উজ্জয়িনীতে। রাজসমীপে নীত হ'লে চণ্ডমহাসেন সসম্মানে উদয়নকে নিজের কৌশলের কথা ব্যক্ত করে নিজ কন্যার বীণাবাদন-শিক্ষকরূপে গ্রহণ করলেন। চণ্ডমহাসেনের উদ্দেশ্য সফল হল—শিক্ষক-উদয়ন এবং ছাত্রী-বাসবদত্তার পরিচয় এবং অনুরাগ নিবিড়তর হতে লাগল।

অতঃপর বৎসরাজ-মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ এবং সেনাপতি রুমন্বান্ কী কৌশলে উজ্জয়িনী-পুরীতে গিয়ে উদয়নের যোগ-সাজসে বাসবদত্তাকে অপহরণ করে এনে উভয়ের পরিণয় সম্পাদন, চণ্ডমহাসেনের উদয়ন-সৌহার্দ্য ইত্যাদির ব্যবস্থা করলেন, লোককথা হিসাবে তা যেমন কৌতূহলোদ্দীপক তেমনি আকর্ষণীয়।

এই কাহিনীর উদয়ন-হরণ অংশে যে ঐন্দ্রজালিক-হস্তীর কথা আছে, তা আমাদের গ্রীক-কাহিনী ট্রয়ের যুদ্ধে ব্যবহৃত অশ্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। জানিনা দু'টি কাহিনীতে এত সাদৃশ্য কেমন করে থাকল। তবে একথা ঠিক যে, উজ্জয়িনীরাজ চণ্ডমহাসেনের নিখুঁত পরিকল্পনায় বীর উদয়ন যেমন প্রতারিত, তেমনি ভারতীয় জনগণের কাছে লোককথা হিসাবেও তা অভিনব। তাই, গল্পরসের এত আকর্ষণ কোবিদবৃন্দদেরও কাহিনী-কথনে উদ্বুদ্ধ করে।

উদয়ন-বাসবদত্তার প্রেম-মিলন মূলত পারস্পরিক, যদিও এই মিলন ঘটুক এ ইচ্ছা উজ্জয়িনীরাজ চণ্ডমহাসেনের ছিল। অন্যদিকে, মগধাধিপতি প্রদ্যোৎসিংহের একমাত্র কন্যা পদ্মাবতীর পাণিপীড়ন উদয়নের দিক থেকে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক। এ কথা ঠিক যে পরে বাসবদত্তার মত পদ্মাবতীও উদয়নের হৃদয়-বিজয়িনী মহিষীরূপে নিজের স্থান করে নিতে পেরেছিল।

কথাসরিৎসাগরের 'লাবানক' নামক তৃতীয় লম্বকের পঞ্চদশ তরঙ্গে দেখি 'যৌগন্ধরায়ণ প্রভৃতির রাজ্য-জয়ে মন্ত্রণা।' কিন্তু রাজ্যজয় শত্রুতা সাধনের মধ্য দিয়ে বা যুদ্ধের পথে নয়। কৌশল অবলম্বন করাই মন্ত্রী এবং সেনাপতির সিদ্ধান্ত। উপায় হিসাবে স্থিরীকৃত হল, ছলনার পথে উদয়নের সঙ্গে মগধেশ্বর প্রদ্যোৎসিংহের কন্যা পদ্মাবতীর বিবাহ-সম্পাদন। তা যদি সম্ভব হয়, তবে যেহেতু প্রদ্যোৎসিংহ অপুত্রক, তাই মগধও এক সময় উদয়নের করতলগত হবে। উপায় ?

এ পথে প্রধান অন্তরায় উদয়নের সঙ্গে বাসবদত্তার বিবাহ-সংবাদ। প্রদ্যোৎসিংহ নিশ্চয়ই সপত্নীর সঙ্গে ঘর করতে আদরিণী একমাত্র কন্যাকে উদয়নের হস্তে সমর্পণ করবেন না। এমন কৌশল অবলম্বন করতে হবে, যাতে রাজগৃহ দাহে বাসবদত্তা অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য হয়েছেন—এই মিথ্যা সংবাদ প্রচারিত হয়ে মগধে পৌঁছোয়। সে ক্ষেত্রে উদয়নের পক্ষে পদ্মাবতী এবং ভবিষ্যতে মগধের বন্ধুত্বলাভ, এবং ভবিষ্যতে সেখানকারও অধিপতি হওয়ার পথে বাধা থাকবে না।

বাসবদত্তা এবং উদয়নকে সঙ্গে নিয়ে মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ মগধের নিকটবর্তী লাবানক প্রদেশে গিয়ে শিবির সংস্থাপন করে মৃগয়ার ব্যবস্থা করলেন। উদয়ন একদিন মৃগয়ায় বেরুলে যৌগন্ধরায়ণ, রুমণ্বান্ প্রভৃতি রাজমহিষী বাসবদত্তার কাছে সমস্ত পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে তাঁর সম্মতি আদায় করলেন। এবং সেইমত অন্য একদিন রাজার নির্গমনের পর মন্ত্রী ও সেনাপতি বাসবদত্তাকে (সকলেই ছদ্মবেশে) নিয়ে কেমন করে মগধরাজ-পুরীতে পদ্মাবতীর নিকট উপস্থিত হয়ে ধীরে ধীরে পরিকল্পনার জাল গুটিয়ে আনলেন—শিবিরে আগুন লাগিয়ে, সে এক রোমাঞ্চকর উপকথা।

মেঘদূতের উদয়ন-কথা কোবিদবৃদ্ধরা অবসর সময়ে সেই মধুস্মৃতিমাখা রোমাঞ্চকর কাহিনী বলবে এতে বৈচিত্র্য কিছু নেই। আলোচনা-প্রসঙ্গে'

দু'-একটি কথা যা মনে হচ্ছে এইখানে তা বলে নিয়ে মূল প্রসঙ্গে আসবো। প্রথমত শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ বলেছেন, অবন্তীর লোকেরা 'প্রদ্যোতের প্রিয় দুহিতার বৎসরাজ উদয়ন কর্তৃক হরণের গল্প' করতেন। প্রদ্যোৎসিংহ মগধের রাজা, অবন্তী বা উজ্জয়িনীর নন। উজ্জয়িনীরাজের নাম, কথাসরিৎ-সাগর অনুসারে চণ্ডমহাসেন। উদয়ন এঁরই কন্যা বাসবদত্তাকে হরণ করে-ছিলেন। কোবিদবৃন্দরা যদি 'ওকঃ'-কথাই বলেন তবে প্রদ্যোৎ নয়, চণ্ডমহা সেনের কন্যাহরণের কথাই বলতেন বলে মনে হয়। দ্বিতীয়ত আমার একটি ইতিহাস সম্পর্কিত চিন্তার কথা এখানে উল্লেখ করছি। বাংলায় এক সময় দু'টি রাজবংশের 'পাল' এবং 'সেন'রাজারা রাজত্ব করতেন। 'পাল' এই উপাধি প্রাচীন আসীরীয়ায় দেখা যায়—অসীরীয়ায় বনিপাল, নিম্ম্রি পাল ইত্যাদি। এখনও পাঞ্জাব প্রদেশে নামের শেষে 'পাল' আছে এমন বহুলোক বাস করেন। পশ্চিমবঙ্গে একসময় যিনি পরিবহন (?) মন্ত্রী ছিলেন তিনি জ্ঞানসিং সোহন পাল (এঁরা পাঞ্জাব প্রদেশের অধিবাসী বলে শুনেছি), যাঁকে নিয়ে এখন খবরের কাগজে প্রায়ই লেখালেখি হয় সেই স্বরাজ পালও পাঞ্জাবের। আসীরীয় সভ্যতায় যে রাজাদের নামের উল্লেখ করলাম, ভারতীয় তথা বাংলার 'পাল' বংশের সঙ্গে এঁদের কোনো রক্ত-সম্পর্ক আছে কিনা তা ভেবে দেখা যেতে পারে। অন্যদিকে বাসবদত্তার পিতার নাম চণ্ডমহাসেন। ইনি উজ্জয়িনী অর্থাৎ, মধ্য ভারতের রাজা। এঁরা বা এঁদের কোনো বংশধররা বাংলার সেন বংশের প্রতিষ্ঠাতা কিনা তা চিন্তার বিষয় হতে পারে। তৃতীয়ত, উদয়ন-পদ্মাবতী পরিণয় উপাখ্যানে দেখি বাসবদত্তা (অবন্তিকন্যা) ছদ্মনামে পদ্মাবতীর কাছে আছেন। একদিন পদ্মাবতীর অনুরোধে 'অবন্তিকা একগাছি মালা তৈয়ারী করিয়া তাঁহার গলায় পরাইয়া দিলেন। পদ্মাবতী মালা গাঁথিবার নৈপুণ্য দেখিয়া আশ্চর্যান্বিতা হইলেন।' 'পদ্মাবতীর মাতা মালা দেখিয়া, বিস্মিত হইলেন।' আজও মধ্য এবং দক্ষিণ ভারতের মহিলারা যে নৈপুণ্যের সঙ্গে পুষ্পসজ্জা, মাল্যরচনা করেন, তা বিস্ময়ের উদ্রেক করে।

উদয়য়নের সঙ্গে পদ্মাবতীর বিবাহের পর বৎসরাজ নব-পরিণীতা বধূসহ লাবানক প্রদেশের শিবিরে উপস্থিত হলেন। 'বৎসরাজ পদ্মাবতীর মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিলেন—তাঁহার কপালে অতি সুন্দর তিলক রহিয়াছে। তিলক দেখিয়া বৎসরাজের সন্দেহ হইল। তিনি জিজ্ঞাসিলেন—প্রিয়ে! এ

তিলক তোমায় কে আঁকিয়া দিয়াছে? পদ্মাবতী বলিলেন—আমার পিত্রালয়ে অবন্তিকা নামে এক ব্রাহ্মণকন্যা ছিলেন, আমার বিবাহ দিনে তিনি আমায় এই তিলক আঁকিয়া দেন।' 'পদ্মাবতীর কথা শুনিয়া বৎসরাজ ভাবিলেন—এই অবন্তিকা আর কেহই নহে, এ নিশ্চয় সেই বাসবদত্তা। কারণ, এরূপ তিলক রচনা করিবার আর কাহারও ক্ষমতা নাই।'

আজও অবন্তিকারা তথা মধ্য-দক্ষিণভারতীয় রমণীকুল পুষ্পসজ্জার মতই ললাটে বিচিত্রবর্ণ এবং নকসার তিলকরচনায় সর্বভারতী ক্ষেত্রে অদ্বিতীয়। বৃহৎকথা, কথাসরিৎসাগরের অনেক কাহিনী আজ প্রচলিত অর্থে আষাঢ়ে গল্পে পর্যবসিত হলেও মধ্য-দক্ষিণভারতীয় মহিলাদের এই লোকশিল্পগুলি উদয়নের যুগের মতই অম্লান, ভাস্বর ও দ্যুতিময়।

কিন্তু মনে রাখা দরকার যে কালিদাসের যুগেও এইসব লোক-কাহিনীর কোনোটিই প্রচলিত অর্থে আষাঢ়ে গল্প হয়ে যায়নি। এরা (মল্লিনাথের ব্যাখ্যা-অনুসারে) কোবিদদের বংশপরম্পরায় প্রাপ্ত পূর্বপুরুষদের জীবনকথা। পরবর্তীকালের বিভিন্ন কোবিদের বাচনভঙ্গীর রঙ লেগে তার অংশবিশেষে কেবল গ্রহণ বর্জনের কাজ চলেছে মাত্র।

৩

এমনি করে পৃথিবীর কত প্রদেশের কত জনগোষ্ঠীর কত কোবিদ, সভ্যতার ঊষা লগ্ন থেকে, পূর্বপুরুষদের কত জীবনকথা বলে চলেছেন আবহমানকাল ধরে। জীবনসংগ্রামে বিজয়ী হবার জন্য যে শ্রমদান করে চলেছেন, তারই মধ্যে দুঃখ-বেদনা-আনন্দের মুহূর্তে প্রতিদিনই তো তারা বলে চলেছেন—কোনো ঋতুতেই তো এই জীবন-কথা বলা থেমে থাকে না। তবে কেন 'আষাঢ়' শব্দটিই জুড়ে গেল এই ধরণের কাহিনীর সঙ্গে?' 'গল্প'-ই বা এরা কেন?

'আষাঢ়'-শব্দটির যে বিভিন্ন অর্থ অভিধানে পাওয়া যায় তাদের মধ্যে আছে —দ্বাদশ মাসের তৃতীয় মাস, মলয় পর্বত, ব্রতীর ধারণীয় পলাশদণ্ড, একটি ইন্দ্রোৎসব।

বিভিন্ন অভিধানের মতে এবং প্রচলিত রূপে ব্যবহারিক দিক থেকে বাংলা ভাষায় এর তাৎপর্য দুটি। প্রথমটি 'আষাঢ় মাস'। প্রাগাধুনিক কালে এই মাসে বলা গল্প, তাই আষাঢ়ে গল্প। দ্বিতীয়টি—কাল্পনিক, মিথ্যা, এমন কি ক্ষেত্র বিশেষে অদ্ভুত অথবা অবাস্তব, ভৌতিক গল্প।

কিন্তু আমরা যাকে কাল্পনিক অর্থাৎ অসম্ভব, অবাস্তব বলি, তা বর্তমানের বিচারে অবাস্তব হতে পারে। তবু, একথা স্বীকার করতেই হবে যে, সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে কত ঘটনা, কত ইতিহাস, কত সুখ-বেদনা অতীতের অতলে তলিয়ে গেছে। তাদের অনেকগুলিই হয়তো আজ অবিশ্বাস্যের স্তরে চলে গেছে। তবু এদের অধিকাংশই ছিল বাস্তব এবং সত্য। যেমন ধরা যাক—'মিথ্যা' এই শব্দটিকে। এর ব্যুৎপত্তি √মিথ্+য+আপ্। এই মিথ্ ধাতু থেকে যে মিথ বা মিথস্ শব্দটিও উৎপন্ন এবং মিথস্ শব্দটির অর্থ পারস্পরিক আদান প্রদান,—'মিথ্যা' এই শব্দটির প্রচলিত, বহুকাল-প্রচলিত অর্থ থেকে তা কি বোঝবার উপায় আছে? সে আজ 'অসত্য'—কারণ যে মিথঃ-কথার যুগে শব্দটির সৃষ্টি তাকে আমরা পেছনে, অনেক পেছনে ফেলে এসেছি।

ঠিক এমনি করেই আষাঢ় শব্দটি আজ মূলত বৎসরের তৃতীয় মাসের নাম হিসাবে প্রচলিত। তবু লোকোক্তিতে শব্দটি যে 'মলয়-পর্বত'—এই নাম রূপে স্বীকৃত, তা সংস্কৃত অথবা বাংলাভাষার যে কোন অভিধান খুললেই দেখতে পাওয়া যাবে। এককালে তাহলে হয়তো, 'আষাঢ়ে গল্প' বললে মলয়-পর্বতের নিকটবর্তী প্রদেশের গল্প বোঝাতো।

এখন দেখা যাক, মলয় বলতে অভিধান কী বোঝাতে চান। শ্রীজ্ঞানেন্দ্র মোহন দাস তাঁর 'বাঙ্গালা ভাষার অভিধান'-এ বলছেন।—

মলয়—তামিল (মালয়ালাম) ভাষায় মলৈ অর্থ পাহাড়। ভারতের সপ্ত-কুলাচলের অন্যতম। ঘাট পর্বতমালার দক্ষিণভাগ বলিয়া অনুমিত। মৈসুরের (মহীশূর) দক্ষিণে ত্রিবাঙ্কুরের পূর্বসীমারেখারূপে অবস্থিত। ভবভূতি ইহাকে কাবেরী নদীদ্বারা বেষ্টিত বলিয়াছেন। কালিদাস এই পর্বতশ্রেণীর নাম দিয়াছেন মলয় এবং দর্দ্দুর। দর্দ্দুর মৈসুরের দক্ষিণপূর্ব সীমা হইয়া ঘাটপর্বত শ্রেণীর অংশরূপে অবস্থিত। (২) মালাবার দেশ Malabar (৩) নন্দন কানন।

তাহলে, এককালে হয়তো বঙ্গদেশীয় জনগোষ্ঠী আষাঢ় বললে মলয় বা মালাবার অর্থাৎ দক্ষিণ ভারতের অংশবিশেষ বুঝতো। শব্দার্থের বিস্তৃতিতে সমস্ত দক্ষিণভারত।

পণ্ডিতরা বলেন, আর্যসংস্কৃতির বিস্তৃতির পূর্বে বঙ্গদেশে দ্রাবিড়-প্রভাব

ছিল ব্যাপক। আর তখনই হয়তো বাংলা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী আষাঢ় অর্থে মলয়পর্বত-সন্নিহিত ভূভাগকে বোঝাতে চাইত। আরও একটি কথা।—আজও বৈদিক সংস্কৃতি বাংলা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর উচ্চকোটিতে স্থানলাভ করলেও সাধারণ্যে কিন্তু আর্যেতর প্রভাবই বেশি। বৈদিক, বৈদান্তিক সাহিত্যের সঙ্গে যতখানি, তার চেয়ে অনেক বেশি পরিচয় আছে, গ্রাম-বাংলার মানুষের, কালিদাসের হেঁয়ালির সঙ্গে। এই হেঁয়ালির কতখানি আর্য আর কতখানি আর্যেতর সংস্কৃতি থেকে গৃহীত তা গবেষণাসাপেক্ষ ব্যাপার। তবু আর্যেতর সংস্কৃতির প্রভাব যে অনেকখানি, তা অস্বীকার করা যাবে না।

মেঘদূতের কালিদাস উত্তরভারতকে যতখানি চেনেন, দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে পরিচয় তার চেয়ে কম নিবিড় নয়। মেঘদূত উচ্চকোটির বিদগ্ধ মানুষের কাছে অন্তরঙ্গভাবে পরিচিত হয়েছে। যে বৃহৎকথার পরোক্ষ-উল্লেখ তিনি মেঘদূতে করেছেন, তার অনেক কাহিনীই দক্ষিণ ভারতীয়। আর সেগুলি বিকৃত বা অবিকৃতভাবে গ্রাম-বাংলার সাধারণ মানুষের কাছে গল্পচ্ছলে পরিচিত। তার জন্য দায়ী, আমরা বলতে পারি, বঙ্গ-সংস্কৃতির সঙ্গে দ্রাবিড়-সংস্কৃতি অন্তরঙ্গতা। সেই অন্তরঙ্গ পরিচয়ের যুগেই হয়তো, বৃহৎকথার অনেক গল্প আষাঢ়ে গল্প (মলয় পর্বত-সন্নিহিত গল্প) রূপে পরিচিত ছিল। আর, এই যুক্তিকে স্বীকৃতি দিলে বলতে হয়, 'আষাঢ়ে গল্প' এই প্রবাদের জন্ম বঙ্গে দ্রাবিড়-সংস্কৃতির বিস্তারের যুগে। এর অর্থ ছিল 'মলয়'-অঞ্চলের মানুষের জীবন-কথার গল্প।

আষাঢ় শব্দের অন্য একটি অর্থ পেয়েছি আমরা পলাশদন্ড, ইন্দ্রোৎসব। ইন্দ্রধ্বজ নির্মাণের জন্য যেসব বৃক্ষ নির্দিষ্ট আছে তার অন্যতমটি পলাশ। পলাশ দন্ড বা আষাঢ় দন্ড গ্রহণ করতেন এক সময় যোগীরা। দীনবন্ধু মিত্র তাঁর লীলাবতী নাটকে ললিতের মুখে যোগী-র বর্ণনা দিয়েছেন।

> অথবা হইল যোগী করিব সম্বল
> বাঘছাল, অক্ষমালা, বিভূতি, কপাল,
> করঙ্ক, আষাঢ়দন্ড, জটাবিলম্বিত,…।

ইন্দ্রধ্বজোৎসব, ইন্দ্রের পূজা। ইন্দ্রপূজা একসময়ে দক্ষিণ ভারতেও প্রচলিত ছিল। প্রত্যেক পূজোৎসবে যেমন, এখানেও তেমনি পূজক-জনগোষ্ঠীর বিশেষ কামনা বাসনা লুক্কায়িত ছিল। প্রচলিত অর্থে ইন্দ্র মেঘবাহন দেবতা।

তাই জীমূতবাহন নামে পরিচিত। এই জীমূতবাহনের ব্রত পালন করেন বাংলার নারীকুল আশ্বিন মাসের কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে ; ব্রতের নাম জীতা-ষ্টমী। মেয়েলি ব্রতের প্রত্যেকটিতেই একটি করে ব্রতোৎপত্তির কাহিনী থাকে। জীতাষ্টমীর ব্রতকথাও তার ব্যতিক্রম নয়। ব্রতকথার পেছনে যদি ক্ষীণসূত্রেও কোনো ঐতিহাসিক সত্য থাকে, তাহলে বলতে হবে, এ উপাখ্যানটির উৎসস্থল মদ্র-দেশ। ঐতিহাসিকের, অভিধানকারের মতে এবং প্রাচীন সাহিত্যে মদ্রদেশ পাঞ্জাবের অন্তর্গত ইরাবতী ও চন্দ্রভাগা নদীর মধ্যবর্তী প্রাচীন দেশ। কিন্তু চলিত কথায় আমরা যখন মদ্রদেশবাসী বলি তখন কিন্তু দক্ষিণের মাদ্রাজ বা তন্নিকটবর্তী অঞ্চলের মানুষদেরই বোঝাই, পাঞ্জাবের অধিবাসীদের নয়। তাই ব্রতকথার কাহিনীতে মদ্রদেশ বলতে দক্ষিণ ভারতের অংশ বিশেষকে বোঝানো হয়েছে, এই অর্থই অধিকতর সমীচীন বলে মনে করি। ব্রতকথাটি এই রকম।

মদ্রদেশের রাজা ধর্মধ্বজ। তাঁর সব আছে, নেই পুত্রসন্তান। স্বপ্নে রাণী শুনলেন, এক মহাপুরুষের মুখে, জীমূতবাহনের পুজো করলে পুত্রলাভ হবে। রাজ-পুরোহিতকে ডাকিয়ে রাজা স্বপ্ন বৃত্তান্তের ব্যাখ্যা এবং পুজো-পদ্ধতি জানতে চাইলেন। পুরোহিত বলতে লাগলেন।

একদিন ভৃগুমুনি দেবল ঋষি পুলহকে জিজ্ঞেস করলেন, মহামুনে! কোন ব্রত করলে নারীকুল পুত্রবতী হয়? পুলহ বললেন—ত্রেতাযুগে চম্পক নগরে ইন্দ্রভানু রাজার রাজত্বে এক ধার্মিক ব্রাহ্মণের বিধবা কন্যা তেজবতী পিতৃগৃহে থাকে। ইন্দ্রভানুর পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে আতপ চালের প্রয়োজন হলে তিনি ঢ্যাড়া পিটিয়ে দেন যে, এই বর্ষায় যে তাকে আতপ চাল তৈরি করে দেবে, রাজা তাকে সোনার কুষ্মান্ড দেবেন। তেজবতী চাল তৈরীর প্রতিশ্রুতি দিলে রাজা কুষ্মান্ড পাঠিয়ে দিলেন। আর তেজবতী চাল শুকোনোর জন্য সূর্যের স্তব করতে লাগলেন। সূর্য বিধবা তেজবতীর সঙ্গে সহবাস শর্তে চাল শুকিয়ে দিলেন।

শয্যা রচনা করে তেজবতী বাইরে গেলে কামোত্তেজিত সূর্যের রেতঃস্খলন হল; আর তাই থেকে জন্ম নিল পুঁই শাক। দ্বাদশীর দিন সেই শাক খেয়ে (দেবমাহাত্ম্যে!) তেজবতী গর্ভবতী হল। তেজবতী যে পুত্রের জন্ম দিল তার নাম জীমূতবাহন। বয়ঃপ্রাপ্ত জীমূতবাহন পিতৃপরিচয় জানতে চাইলে বলা হল সূর্য তোমার পিতা। মায়ের সঙ্গে জীমূতবাহন গেল পিতার কাছে।

সূর্য প্রথমে অস্বীকার করলেও, পরে তেজবতীর অভিশাপের ভয়ে পূর্বকৃত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ জীমূতবাহনকে পুত্ররূপে স্বীকার করে নিলেন। সেই সংগে এই বর দিলেন যে, কুলনারীরা পুত্রকামনায় প্রথমে দেবমাতা অদিতির পূজা করে, পরে তেজবতীর সংগে জীমূতবাহনের পূজা করবে।

এ-ও আশ্বিনে ব্রতের ছলে কথিত ইন্দ্রধ্বজ (এই ব্রতে ইক্ষু লাগে) কেন্দ্রিক আষাঢ়ে গল্প (আষাঢ় শব্দের অন্যতম অর্থ ইন্দ্রোৎসব)। আরও লক্ষণীয় যে এই কাহিনীমূলক ব্রতকথাটিও কিন্তু মদ্রদেশের (মলয়পর্বত অঞ্চলের, দক্ষিণ ভারতের) বলেই কথিত। মদ্রদেশকে এখানে বলার কারণ আগেই বলেছি।

এ ছাড়া, আগেই দেখেছি, দক্ষিণ ভারতীয় ভাষায় মলয় বা মলে শব্দের সাধারণ অর্থ পর্বত। সভ্যতাগবী তথাকথিত সভ্য নরকুল যখন নগর বা গ্রামবাসী, তখন ভারতের একটা বৃহৎ জনগোষ্ঠীর এক বৃহৎ অংশ মলে বা মলয়বাসী। অরণ্য-পর্বতের এই জনগোষ্ঠীর জীবনকথা তথা আশা-আকাংক্ষা-দুঃখ-বেদনার অনেক কাহিনী পুরাণকথা, ব্রতকথা বা লোককথার মধ্য দিয়ে, আষাঢ়ে গল্প যারা শোনে, সেই জনগোষ্ঠীর কাছে এসেছে। এবং তাদের চিন্তা কল্পনার জগৎকে প্রভাবিত করেছে, করে চলেছে, করবে। তাই আমরা বলতে পারি,—সাধারণভাবে মলয়ে অর্থাৎ পর্বতে অর্থাৎ আষাঢ়ে বসবাসকারী জন-গোষ্ঠীর কাছ থেকে প্রাপ্ত তাদের জীবন-কথার গল্পও আষাঢ়ে গল্প।

দ্রাবিড় সভ্যতা বিস্তারের পর বঙ্গের রাজনৈতিক তথা সামাজিক পট-পরিবর্তন ঘটল। এদেশে আর্যপ্রভাব বিস্তৃত হল। কিন্তু 'আষাঢ়ে গল্প' থেকে গেল। কিন্তু থাকলো না প্রবাদটির মূল অর্থ। নতুন পটভূমিতে 'আষাঢ়' মাসের নাম এই অভিধায় চিহ্নিত হল। অরণ্য-পর্বতের অধিবাসীরা প্রকৃতির যে আদিম অবস্থার মধ্যে বাস করতেন বা করেন তার মধ্যে কঠোর জীবন-সংগ্রামসূত্রেই, দৈনন্দিন দুঃখ-বেদনার সংগে জড়িয়েই, জন্ম নিয়েছিল ভূত-প্রেত-দত্যি-দানোর কাহিনীগুলিও।

বৃহৎকথা বা কথাসরিৎসাগর বা এই জাতীয় গল্পগুলির মূল লোককথা সমূহ থেকে গেল বৃহত্তর জনজীবনে। প্রবাদটি অর্থান্তরিত হতে হতে উঠে এলো উচ্চকোটির মানুষের মুখে। আজ গ্রাম-বাংলার সাধারণ মানুষ যখন বলেন—গাঁজাখুরি গল্প, দম-দেওয়া গল্প, তখন শিক্ষিত সমাজ তাকেই বলে আষাঢ়ে গল্প; আলোচ্য প্রবাদটির ব্যবহার জনসাধারণের কথাবার্তায় প্রায় শোনাই যায় না।

মিথ্-ধাতু থেকে উৎপন্ন মিথস্ বা মিথঃ বা Myth বা 'মিথ্যা'-শব্দগুলি যেমন অর্থান্তরিত হয়ে গেছে, ঠিক তেমনি আষাঢ়ে গল্পও অর্থানুষঙ্গ বদলে ফেলেছে।

এবার মাস হিসাবে আষাঢ়কে ব্যুৎপত্তির দিক থেকে দেখা যেতে পারে। এই শব্দটির সঙ্গে পূর্বাষাঢ়া এবং উত্তরাষাঢ়া শব্দ দুটি যুক্ত। জ্যোতির্বিজ্ঞানের মতে, 'আষাঢ় শব্দটি সহ্ ধাতু থেকে উৎপন্ন। তাহলেও শব্দটির অর্থ অসহনীয়। নামকরণেই এই অসহনীয়তা কিসের জন্যে জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় তা বলা দুরূহ। তবে এমন হতে পারে যে, আর্দ্রা নক্ষত্রে যখন বাসন্ত বিষুবন ছিল, তখন পূর্বাষাঢ়া নক্ষত্রে শারদ বিষুবন অর্থাৎ বর্ষার অবসান। বর্ষা, সুতরাং ঝড়, ঝঞ্ঝা, বিদ্যুৎ, বাত্যা—নিঃসন্দেহে অসহনীয় অবস্থা। সেই অবস্থার অবসানের কথা মনে করেই কি নক্ষত্রটির নামকরণে অসহনীয়তার উল্লেখ?

আষাঢ় শব্দটির সঙ্গে কেবল সৌর বৎসর নয়, নক্ষত্রের দিক থেকে শারদ-বিষুবনের সম্পর্কও এর আছে। তাই বলা যেতে পারে যে, আষাঢ় থেকে আশ্বিন পর্যন্ত বৎসরের এই চারটি মাস মোটামুটি ভাবে এমন প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাস যে, এ সময়ে খেটে খাওয়া মানুষ ঘর থেকে বেরুতে পারে না। কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় প্রেমে আবদ্ধ সে। তার সহ-শ্রমিকদের সঙ্গে রক্ত আর ঘাম ঝরিয়ে আট মাস প্রকৃতিকে বিভিন্ন ভাবে চষে তারা খাদ্য উৎপাদন করে। কিন্তু যে মুহূর্তে 'আষাঢ়ে পূরিল মহী নব জলধরে' সেই মুহূর্তে তার রূপ গেল পালটে। কর্মক্ষেত্রে বিশেষ করে শ্রমদানের ক্ষেত্রে প্রকৃতি তার সঙ্গে অসহ-যোগিতা করছে। শ্রমজীবী মানুষ তখন প্রকৃত প্রস্তাতে কর্মহীন, বেকার।

কিন্তু তার এ বেকারত্ব ক্ষণস্থায়ী। প্রথম আষাঢ়ের দুর্যোগ কেটে গিয়ে মাটির আসে রস-সঞ্চারী রূপ। নতুন উদ্যমে চলে তার মাঠের কাজ আর পরিকল্পনা। এদের ঘিরেই তার জীবনকথা, গল্পা কথা।

এবার আমরা আষাঢ়ে 'গল্প' শব্দটিকে দেখতে চাই। অভিধানকারের মতে বাংলা গল্প শব্দটির উৎপত্তি সংস্কৃত জল্প্ ধাতু থেকে। জল্প্ ধাতুর অর্থ বৃথা বাক্যব্যয়। জল্প্ থেকে গল্প শব্দের উৎপত্তি অস্বাভাবিক না-ও হতে পারে। কিন্তু জল্প্ ধাতুর অর্থে বাক্যব্যয় এই শব্দের সঙ্গে 'বৃথা'-এই বিশেষণটিকে একটু বুঝে নেওয়া প্রয়োজন। বৃথা অর্থে বুঝি মূল্যহীন। শ্রমজীবী মানুষের কাছে সময়ের মূল্য অনেকখানি। প্রকৃতি কৃপণা। তার

বুক থেকে জীবনরস সংগ্রহ করতে হলে বৃথা বাক্যব্যয় না করে শ্রমদান করতে হয়—এটাই জীবনঅভিজ্ঞতা। তাই আপাতত জল্প বা গল্পকে 'বৃথা' মনে হতে পারে, কিন্তু যা করছি, যে উদ্দেশ্য নিয়ে করছি, করে যে ফল পাচ্ছি, তা সহ-মর্মীর কাছে অকপটে ব্যক্ত করতে পারলে একদিকে যেমন মনের ভার লাঘব করতে পারছি, নিজের অভিজ্ঞতার কথা অন্যকে বলে পরামর্শ চাইতে পারছি, তেমনি অন্য সহকর্মী বন্ধুর জীবন-অভিজ্ঞতালব্ধ কথা থেকে নিজেকে এবং সমষ্টিগত ভাবে বৃহত্তর সমাজকে লাভবান করতে পারছি। গল্প বা জল্প-এর সার্থকতা খানেই। আর এই তাগিদ থেকেই সভ্যতার উষালগ্নে এদের জন্ম হয়েছিল। এই দিক থেকে এরা কেউ 'বৃথা' নয়।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস গল্প শব্দটির সঙ্গে ইংরেজী gup শব্দটির সাদৃশ্য লক্ষ করেছেন। অক্সফোর্ড অভিধানের মতে শব্দটি হিন্দুস্থানী-ভাষা-মূলে। অন্য দিকে গ্রামবাংলার সাধারণ মানুষ গল্প শব্দটিকে ব্যবহার না করে বলেন গপ্প। হিন্দুস্থানী গপ্, ইংরেজী gup, গ্রাম বাংলার উচ্চারিত শব্দ গপ্প পরিশীলিত হয়ে 'গল্প' শব্দটির জন্ম দিয়েছে বলে মনে হয়। আমরা বলতে পারি, গল্পের স্রষ্টা শ্রমজীবী মানুষ, উচ্চকোটিরা নন। তাই গল্প, গপ্প হয় নি; গপ্প থেকে গল্প-শব্দের উৎপত্তি। তার গপ্ বা গপ্প সাধারণ মানুষের আশা-আকাংক্ষা দুঃখ-বেদনার কথা। গল্পের রাজপুত্র রাজকন্যা রাজত্ব এরা এই খেটে খাওয়া মানুষদের আশা-আকাংক্ষার মূর্তিমান রূপ। কিন্তু কালের হস্তাবলেপনে এদের অর্থ এবং ভাবানুষঙ্গ বদলে গেছে। যেমনটি ঘটেছে ইংরেজী gossip শব্দের বেলায়। শব্দটির প্রচলিত অর্থ to chat, to tell idle tales। মূলে কিন্তু এই ধরণের কাছাকাছি অর্থও এর ছিল না। শব্দটির জন্ম God এবং ইংরেজী sib শব্দের সংমিশ্রণে। sib শব্দের অর্থ relation, related। অর্থাৎ related in the service of God। এই প্রাচীনতম অর্থ থেকে এলো Godfather or Godmother। তা থেকে a friend or neighbour or an intimate companion। সমাজ জীবন পরিবর্তিত হতে হতে চলেছে; শব্দের অর্থান্তরও ঘটছে সঙ্গে সঙ্গেই। পরে অর্থ দাঁড়াল an idle teller or carrier of tales; mere tattle, groundless rumour। ক্রিয়াপদে বর্তমান-প্রচলিত অর্থ।

গল্প শব্দটির ক্ষেত্রেও অর্থান্তরে কোন ব্যতিক্রম হয়নি। মূলে যা ছিল

শ্রমজীবী মানুষের শ্রমলব্ধ জীবন-অভিজ্ঞতার কথা, তাই হয়ে দাঁড়াল পরিবর্তিত সমাজ পরিস্থিতিতে কাল্পনিক কাহিনী।

যা বলছিলাম। প্রথম আষাঢ়ের 'মেঘৈমে'দুরমম্বরম্' যেদিন ধরিত্রীকে নবজলধারা সিঞ্চনে রসবতী করে তোলে, তখন চলে খেটে খাওয়া মানুষের নতুনতর সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতি। ঝড়-ঝঞ্ঝা, বজ্র-বিদ্যুৎ এদের অস্ত্র রূপে ব্যবহার ক'রে প্রকৃতি যখন অসহযোগিতায় নির্মম হয়ে দেখা দেয়, তখনও মানুষের জীবন সংগ্রামের নবতর পরিকল্পনা রূপ নেয় নবতর আষাঢ়ে গল্পে। অতি-পুরাতন পূর্বপুরুষের জীবন-সংগ্রামের চিত্র ভীড় করে আসে তার মানসপটে।

স্মৃতিকে তো মুছে ফেলা যায় না। বরং 'হেথা সুখ গেলে' স্মৃতি একাকিনী বসে দীর্ঘশ্বাস ফেলে শূন্যগৃহে। আষাঢ়ে গল্পের অনেকগুলিই আজ সেই অতীত স্মৃতির দীর্ঘশ্বাস। তাই আষাঢ়ের শেষ দিকে আশ্বিন পর্যন্ত কর্মহীন দিনগুলিতে প্রতিটি শ্রমিকই হয়ে পড়েন 'কথা কোবিদবৃন্দ।' আর সেই সব কথা তার জীবন ও জীবিকাকে ঘিরে। জীবনের আশা-আকাংক্ষা, পাওয়া না-পাওয়ার আনন্দ-বেদনাকে ঘিরে। বর্ষণমুখর দিনগুলিতে মূলত, সেই কথাগুলিই আষাঢ়ে গল্প হয়ে বেরিয়ে আসে সহমর্মী মানুষের কাছে। গড়ে ওঠে যুগ-যুগান্তের লোককথা।

আষাঢ়ে-গল্প তাই অলস, কর্মহীন বৃদ্ধের কাছে অথবা অতীতের সঙ্গে যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে যাওয়া আধুনিক সভ্যতার মানুষের কাছে রূপকথা বা উপকথা, মিথ্যা, অলীক-কল্পনার কথা হলেও শ্রমজীবী মানুষের কাছে তারা জীবনকথা, জীবনসংগ্রামে লিপ্ত মানুষের বঞ্চনার কথা, বঞ্চনার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ মরণপণ সংগ্রামের ব্যথা-সুন্দর রূপেরই কথা।

কেবল রূপান্তর নয়, অর্থান্তরের মধ্য দিয়ে 'আষাঢ়ে গল্প' তাই, সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে জীবনের জয়গান গেয়ে এগিয়ে চলেছে।

গাছ-মুক্‌খু

দুই বন্ধু চলেছে মাঠে কাজ করতে। হঠাৎ আকাশ কালো করে মুষলধারে বৃষ্টি। একটা বড় গাছের তলায় দাঁড়ালো ওরা দুজন। অদূরেই ঘন জঙ্গল। অন্যান্য গাছের সঙ্গে বড় বড়, বিরাট বিরাট পাতা-ওয়ালা কচুগাছ। পাশেই বিভিন্ন গৃহপালিত পশু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজছে বৃষ্টিতে। যেখানে ওরা দুজন দাঁড়িয়ে তার বেশ কিছু দূরে এক ধাঙড়-পল্লী। অনেক শূকর পোষে ওরা। এটা দুজনেরই জানা। যে সব পশু ওদের পাশে দাঁড়িয়ে তার মধ্যে দুটো একটা শুয়োরও ছিল। পাশেই সেই বড় বড় পাতা-ওয়ালা কচুর বন। ওদেরই একটা বড় কচুর পাতা নড়ছে একটু একটু।

হঠাৎ একজন অন্য জনকে জিজ্ঞেস করলো, আইচ্ছ্যা, কও চেন দেহি, কচু পাতাডার তলায় কয়ডা শুয়্যোর অ'ইবে?

দ্বিতীয়ের উত্তর—একশোডা তো হইবেই?

আরে দূ'র একশোডা অ'ইতে পারে?

হেইলে পঞ্চাশডা!

না, হেইও অ'ইবে না।

একডা তো না অ'ইয়াই যায় না।

দূ'র আকাড মুক্‌খু, একডা শুয়্যোর কত্তো বড়! কচুপাতার তলায় থাকতে পারে!

হেইলে পাতাডা নল্‌লে ক্যান্‌?

গল্পটি শুনেছিলাম আমার বাল্যের-অভিভাবক-শিক্ষক ৺হরনাথ পাইন মহাশয়ের মুখে। তিনি ছিলেন বরিশাল জেলার 'দুধল' গ্রামের লোক।

কচুপাতাটা কেন নড়বে, যদি না একটিও শুয়োর তার তলায় না আশ্রয় নিয়ে থাকে সেই অবিশ্রান্ত মুষলধারে বৃষ্টিঝরা দিনে? এই প্রশ্নের সমাধান

তার পক্ষে কেন সম্ভব নয়, তা বোঝাতে গিয়ে বন্ধুটি তাকে যে বিশেষণে ভূষিত করেছে তাই থেকেই তার বুদ্ধিবৃত্তির দৌড় কতটা তা বোঝা যাবে।

সেই ছোটবেলার গল্পরস, মাস্টার মশায়ের বাচনভঙ্গী এমন এক পরিবেশের সৃষ্টি করতো যে তাতেই হাসিতে খুশিতে আত্মহারা হয়ে থাকতাম। তাছাড়া, সেই বয়সে, যখন যুক্তিবাদী মনের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটেনি, তখন মূর্খামির চূড়ান্ত বোঝাতে গিয়ে কেন হামেশাই 'আকাঠ' শব্দটি ব্যবহার করা হতো, বা এখনও হয়, তা চিন্তা করার মত মানসিকতাই গড়ে ওঠে নি। ফলে আকাট আকাঠ শব্দটা নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রশ্নই আসে নি।

কিন্তু আজ এই পরিণত বয়সে শব্দের তাৎপর্যপূর্ণ ব্যবহার কেন হয়, এই ব্যবহার কতকাল থেকে মানুষ, জীবনের কোন অভিজ্ঞতা-লব্ধ সত্যকে অবচেতন-ভাবে প্রকাশ করে চলেছে—এই সব কথা চিন্তা করতে ভাল লাগে। তাই অতি মূর্খ বলতে গিয়ে কেন আকাঠ—এই বিশেষণটি ব্যবহার করা হয় এ বিষয়ে ভাবতে ইচ্ছে করছে।

অকাট/আকাট শব্দ দুটি মূলে কাঠ বা কাষ্ঠ শব্দজাত। একথা চিন্তা করতে অসুবিধা হয় না। কিন্তু শব্দটির উৎপত্তি কেমন করে হলো?

বাঙ্গালা ভাষার অভিধানের মতে আকাট [আ (পরিণত বা সাদৃশ্য অর্থে+ কাট, কাষ্ঠ block) বা কট=শব, "কটঃ শবে"—মেদিনীকোষ। বা অ (অভাব অর্থে) কট্ (গতি)+অ=যে কাষ্ঠ বা শবে পরিণত, তদ্বৎ যার গতি নাই, সুতরাং জড়বৎ। কাষ্ঠবৎ স্থূল বা জড়বুদ্ধি ; নিরেট মূর্খ : মহামূর্খ ; হিতাহিত বিবেচনাশূন্য। কোন ব্যবহারিক প্রয়োগ নেই। অন্যদিকে বঙ্গীয় শব্দকোষের বক্তব্য—আকাট বিং [অ (সদৃশ) কাষ্ঠ-মূল (?)] কাষ্ঠবৎ নীরস, অর্থাৎ বিদ্যারসহীন ; মূর্খ ; কাণ্ডজ্ঞানহীন ; শ্রী হরিচরণ কয়েকটি ব্যবহারিক প্রয়োগ দেখিয়েছেন। যেমন, আকাট বাঁঝা বা বাঁঝিয়া—কাষ্ঠে যেমন ফল হয় না, তদ্রূপ যে নারীর সন্তানসম্ভাবনা একান্ত অসম্ভব ; নিরেট বাঁঝা। আকাট বাঁঝিয়া প্রসব হইল, ছেলে চায় পায়রার দুধ (বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯১৪)। আকাট মারা কাষ্ঠের ন্যায় জলবিন্দু-শূন্য হওয়া। দেবতা আকাট মেরে রয়েছে, এক ফোঁটা জল নেই।' আকাট-মূর্খ—নিরেট মূর্খ ; হস্তিমূর্খ। অসুখে আকাট মেরে থাকা—অসুখে নিরম্বু উপবাস করা।

দুটি অভিধানেই স্বীকৃত যে আকাট/অকাট শব্দের মূলে আছে কাষ্ঠ বা কাঠ। block কিন্তু কাষ্ঠ নয়—এটির অর্থ টুকরো বা খণ্ড। block of wood block, of stone।

শ্রী হরিচরণ আকাট বাঁঝার যে উদাহরণ দিয়েছেন সেখানে দেখা যায়, অসম্ভব ব্যাপার। অর্থাৎ বিশেষ প্রয়োগে অকাট অর্থ অসম্ভব, নীরস, নির্দয় (দেবতা আকাট মেরে রয়েছে), নিরম্বু। এই সমস্ত বিশেষ অর্থে প্রয়োগ-চিন্তা-বৈচিত্রের অগ্রগতির সংগে সংগে হয়েছে—একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। কাষ্ঠের/কাঠের সংগে জলশূন্যতার একটা সম্পর্ক রয়েছে ঠিকই। কিন্তু তা গভীর চিন্তা-সাপেক্ষ।

একদিন কথায় কথায় ক্লাশে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে প্রবাদটি প্রসংগে আলোচনা করেছিলাম। রেশ ক্লাশ রুমের বাইরেও শেষ হয়নি। পাশেই আসছিলেন আমার সহকর্মিনী। তাঁর বাপের এবং শ্বশুরের বাড়ি দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায়। তাঁকে বলতেই তিনি বললেন, আমাদের এই অঞ্চলে কিন্তু কথাটি গাছমুক্খু, আকাট মুক্খু নয়।

সংগে সংগেই মনে হলো সেই অতি পুরাতন এবং চিরসত্য কথাটি—উচ্চতর সাহিত্য তার ভাষা এবং ভাব, উভয় সম্পদই সংগ্রহ করে লোক-জীবন থেকে। প্রসংগতই মনে পড়ে প্রমথ চৌধুরীর মন্ত্রশক্তি গল্পে ঈশ্বর পাটনির একটি শব্দকে—'এতো কাজিয়ে নয়, আপোষে খেলা।' 'কাজিয়ে শব্দটি পশ্চিমবঙ্গের কথ্য ভাষায় ব্যবহৃত হয় না। অথচ প্রথম চৌধুরীর মত কৃষ্ণনাগরিক পূর্ব-বঙ্গের কথ্য ভাষায় ঝগড়া-অর্থে ব্যবহৃত 'কাইজা'কে অভিশ্রুতিতে রূপান্তরিত করে উচ্চকোটির সাহিত্য সৃষ্টিতে প্রয়োগ করেছেন।

সাধারণত আকাট মুক্খু শব্দটি ব্যবহৃত হলেও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার আঞ্চলিক ভাষায় ওটি আকাট/অকাট নয়,—কাঠ বা গাছ মুক্খু। অর্থাৎ মূলে শব্দটি গাছ/কাঠ মুক্খু, তাই থেকে আকাট/অকাট মুক্খু শব্দের সৃষ্টি।

এখন প্রশ্ন গাছ বা কাঠের সঙ্গে মূর্খতার সম্পর্ক কী? সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যায় মহাকবি কালিদাসের জীবনকে ঘিরে যে লোককথার সৃষ্টি হয়েছে সেটিকে। লোককথা লোক-জীবন যাত্রার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়; অংশবিশেষ অবলুপ্ত হয়, নতুন সংযোজন ঘটে। এটাই ধর্ম।

যা-ই হোক, এখনও স্কুলপাঠ্য (তৃতীয় শ্রেণীর) বইয়ে সে গল্পটি আংশিক-

ভাবে আছে। আমরা ছোট বেলায় গল্পটি যে ভাবে শুনেছি এখানে তা-ই বলছি।

সে অনেককাল আগের কথা। ভারতবর্ষের কোনো এক রাজ্যের রাজকন্যা নানা শাস্ত্রে পারদর্শিনী হয়ে উঠলো। ধীরে ধীরে তার বিয়ের বয়স হলো। রাজা স্বয়ম্বর সভার আয়োজন করতে চলেছেন। এমন সময় রাজকন্যা বললো, সে তাকেই পতিত্বে বরণ করবে যে তাকে তর্কে পরাজিত করতে পারবে। বিদুষী-কন্যার ইচ্ছা! রাজা মত দিলেন।

একে একে বিভিন্ন রাজ্য থেকে রাজপুত্র, পণ্ডিতরা এলো। কিন্তু কেউই রাজকন্যার সঙ্গে তর্কে পেরে উঠছে না। হেরে গিয়ে অপমান-রক্তিম মুখে ফিরে যাচেছ সবাই। এমনি করে একদিন অনেক পরাজিত পণ্ডিত পথে জড়ো হয়ে পরামর্শ করলো—রাজকন্যার অহংকার ভাঙতে হবে। অপমানের প্রতিশোধ নিতে হবে।

ফন্দি আঁটতে আঁটতে ওরা চলেছে—যে করেই হোক, অত্যন্ত এক গণ্ডমূর্খের সঙ্গে রাজকন্যাকে কৌশলে বিয়ে দিয়ে অপমানের প্রতিশোধ তুলতে হবে। এমন সময় বনের পাশ দিয়ে যাবার পথে দেখল, একটি লোক গাছে উঠে গাছের ডালা কাটছে। ডালের মাঝখানে বসে তার গোড়ার দিকটা কেটে চলেছে। পণ্ডিতরা দেখল এমন মূর্খ আর হয় না। ওরা তাকে ডাকাডাকি করে গাছ থেকে নামাল। জিজ্ঞেস করল—

রাজকন্যা বিয়ে করবি ?

হ্যাঁ।

আমাদের সঙ্গে চল। কিন্তু একটা কথা। রাজবাড়িতে রাজকন্যা তোকে যদি কোনো প্রশ্ন করে তবে তুই কথা বলবি না। কেবল ইশারা করবি। যা বলবার আমরা বলবো।

সভায় এসে পরাজিত পণ্ডিতরা সমবেতভাবে রাজকন্যাকে বলল, ইনি আমাদের গুরুদেব। সম্প্রতি মৌনব্রত অবলম্বন করেছেন। এঁর সঙ্গে তর্কযুদ্ধ করুন। ইনি ইঙ্গিতে আপনার প্রশ্নের জবাব দেবেন। উনি কী বলছেন তা আমরা বুঝিয়ে দেবো আপনাকে। রাজকন্যা রাজি হলো। এবার প্রশ্ন। রাজকন্যা একটি প্রসঙ্গ টেনে কালিদাসের দিকে একটা আঙুল বাড়িয়ে দিল। কালিদাস ভাবলো, রাজকন্যা আমার একটা চক্ষু আঙুল দিয়ে ফুটো করে দিতে চায়। কালিদাস সঙ্গে সঙ্গে দু'টো আঙুল এগিয়ে দিল রাজকন্যার দিকে। ভাবখানা

এমন, তুমি যদি আমার একচোখ নষ্ট কর, তবে দু' আঙুলে আমি তোমার দুটো চোখই শেষ করবো।

ইতিমধ্যে পণ্ডিতরা এমন ভাবে দু' আঙুলের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করলো যাতে রাজকন্যা পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হলো। কারণ তার প্রশ্নের উত্তরও হবে দুই, এক নয়। পণ্ডিতদের কৌশল সার্থক হলো। কালিদাসের সঙ্গে রাজকন্যার বিয়ে হয়ে গেল।

বাসর রাত। রাজবাড়ির চোখ ঝলসানো ঐশ্বর্যে সাজানো বাসর ঘর। বিরাট খাটে মশারি টাঙানো। কালিদাস তো ঘরে ঢুকে অবাক। ঘরের ভেতরে ঘর। যে ঘরে সে ঢুকেছে, তার তো দরজা আছে! কিন্তু তার স্ত্রী রাজকন্যা যে স্বচ্ছ বেড়ার ঘরের ভেতরে শুয়ে, তার তো কোনো দরজা নেই! জানালা না হয় না-ই থাকলো। কিন্তু আরও অবাক কাণ্ড—রাজকন্যা ওঘরের ভেতরে ঢুকলো কোন পথে? কালিদাস খাটের চার পাশে ঘুরতে লাগলো দরজা খুঁজে পাবার আশায়। নাঃ। কোনো দিকেই দরজা নেই।

এদিকে রাজকন্যাও ঘুমের ভান করে দেখতে লাগলো তার স্বামীর কাণ্ডকারখানা। সন্দেহের দোলায় দুলতে লাগলো রাজকন্যার মন। এ কেমন লোক? তবে কি...?

এমন সময় বাইরে একটা উট দেখা গেল। পরীক্ষার জন্য চোখ খুলে রাজকন্যা জিজ্ঞেস করলো—ওটা কি যায়? কালিদাস তখনো ঘুরছে মশারির দরজা আবিষ্কারের আশায়। সেই অবস্থায় প্রথমে বলল উট্র, পরে উষ্ট। রাজকন্যা বুঝে নিল কেমন করে ঠকেছে সে পণ্ডিতদের কূটকৌশলে। কালিদাস তখন রাজাকন্যার পায়ের কাছে। রাজকন্যা দুঃসহ মানসিক যন্ত্রণায় ভুগছে তখন। কালিদাসকে বাঁ পা দিয়ে এক লাথি মেরে বলল, 'মেকুর (বিড়াল), বেরিয়ে যা ঘর থেকে।' স্ত্রীর বাঁ পায়ের লাথিতে পৌরুষ আহত হল কালিদাসের। সে বেরিয়ে এক পুকুর পাড়ে উপস্থিত হলো। জলে ঝাঁপ দিতে যাবে, এমন সময় সরস্বতী তার হাত ধরে বাধা দিলেন। বর দিলেন, 'তুমি অদ্বিতীয় কবি হবে।' সেই বরে জন্ম হলো কবি-কালিদাসের।

রাজকন্যা যে শব্দটি (মেকুর) বলে তাঁকে গালি দিয়েছিল, তাকে অক্ষয় করে রাখবার জন্য প্রতিটি অক্ষরকে আদ্যক্ষর করে রচনা করলেন তিন অমর কাব্যগ্রন্থ—মে (ঘদূতম্,) কু (মারসম্ভবম্) এবং র (ঘুবংশম্)।

কালিদাস-সম্বন্ধে এ এক লোককথা। এ ধরণের লোককথা বাল্মীকির নামেও প্রচলিত। বাল্মীকি-কাহিনীতে বাল্মীকি সরস্বতীর বরলাভের আগে দস্যু-রত্নাকর। কালিদাসের ক্ষেত্রে তিনি বোকা কাঠুরে। অর্থাৎ ভারতের এই দুই মহাকবি জন মানসে কতখানি প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিলেন তার প্রমাণ, উভয়ের ক্ষেত্রেই দু'টি লোককথা জুড়ে দিয়েছে জনজীবন। অন্যদিকে আরও একজন লেখক পৃথিবী বিখ্যাত হয়ে আছেন তাঁর অমর সাহিত্য মহাভারতের জন্য। কিন্তু তাঁর ক্ষেত্রে এ ধরণের লোককথা সৃষ্টির অবকাশ হয়নি। এর প্রধান কারণ, মহাভারত কাব্য নয়, তার লেখকও কবি নন, যে অর্থে বাল্মীকি বা কালিদাস কবি। কেবল এখানেই পার্থক্য নয়। আরও একটি বড় পার্থক্য এই যে, বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করেছিলেন লোককথা সংগ্রহ করে। উদ্দেশ্য অযোধ্যার পথে পথে লব এবং কুশকে দিয়ে তা গাওয়ানো। এবং সার্থকও হয়েছিলেন, তার প্রমাণ রামায়ণের বালকাণ্ডেই আছে।

'অনন্তর ভ্রাতৃযুগল কুশ ও লব, পাঠ ও গীতকালে একান্ত শ্রুতি-সুখকর, দ্রুত, মধ্য ও বিলম্বিত এই ত্রিবিধ প্রমাণ সম্মত ষড়্‌জাদি সপ্তস্বর যুক্ত, তাললয়ানুকূল এবং শৃঙ্গার-হাস্য-করুণ-রৌদ্র-বীর প্রভৃতি রসবহুল মহাকাব্য রামায়ণ শিক্ষা করিতে লাগিলেন এবং অনতিদীর্ঘকালমধ্যে সেই ধর্মসংক্রান্ত উপাখ্যান (ইতিহাস নয়) কণ্ঠস্থ করিয়া ব্রাহ্মণ, তপোধন ও সাধুসমাজে সবিশেষ অভিনিবেশ সহকারে শিক্ষানুরূপ গান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।'

শুধু কুশ লবের কণ্ঠেই গীত হয়নি, এ কাহিনী পরবর্তী 'কবিগণের একমাত্র অবলম্বন' হয়েছিল। তা ছাড়া, 'একদা ঐ দুই ভ্রাতা অযোধ্যার রাজমার্গে রামায়ণ গান' করেছিল বলেই জনমানসে স্রষ্টা-বাল্মীকি শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিলেন; পেয়েছিলেন সাধারণ মানুষের অকুণ্ঠ ভালবাসা। তাই সেই প্রিয় কবিকে সমকালীন জীবনযাত্রায় অত্যন্ত সাধারণ মানুষ, এমন কি দস্যু-রত্নাকর বলে চিহ্নিত করতেও কুণ্ঠিত হয় নি। বাল্মীকি লোক-কবি ছিলেন সমকালে। কারণ লোককাহিনীকে ভিত্তি করে, সাধারণ্যে গেয়ে প্রচারের জন্যই "রাবণবধ নামক সীতাচরিত-সংক্রান্ত স্বকৃত সমগ্র রামায়ণকাব্য অধ্যয়ন করাইতে লাগিলেন" কুশ ও লবকে।

সে যুগের লোক-কবি, লোকসঙ্গীত বিশেষজ্ঞ বাল্মীকি তাই সাধারণ্যে এত প্রিয়। অন্য দিকে কালিদাস বিক্রমাদিত্যের সভাকবি হলেও যখন মেঘদূতম্

রচনা করলেন তখন কিন্তু তিনি লোক-কাহিনীই বেছে নিলেন। যক্ষের বিরহ-বেদনার কথা লোককথা। আর এই লোককাহিনী বর্ণনার সময় তিনি কথা-কোবিদ্ বৃদ্ধদের ভোলেন নি। আর ভোলেন নি বলেই কালিদাস জন-মানসে এত প্রোজ্জ্বল। আর তারই জন্য তাঁর অজানা জীবন কাহিনীকে মূর্ত করে তোলার জন্য লোককথার সৃষ্টি করলো সাধারণ মানুষ।

লোকায়ত কালিদাস-কাহিনী যা আজও সাধারণ্যে প্রচলিত, যা স্কুলপাঠ্য পুস্তকে আজও প্রচারিত, তার অর্থনৈতিক দিকের বৈশিষ্ট্য এই যে কবি-খ্যাতি লাভের পূর্বে কালিদাস ছিলেন কাঠুরিয়া। বৃক্ষ ছেদন যার জীবিকার একমাত্র উপায়। সেই কালিদাস যখন কাঠ কাটছিলেন তখন তার্কিক পণ্ডিতদের দৃষ্টিতে তিনি মূর্খ। কারণ ডালে বসে তিনি তার গোড়ার দিকটাকেই কাটছিলেন। আমাদের প্রশ্ন, এটা কি মূর্খামি? কাঠুরিয়াদের কাঠ, বিশেষ করে গাছ বা গাছের ডাল কাটা যারা লক্ষ করে দেখেছেন তারা জানেন কাটারি দিয়ে ডালের উপরে বসে তাকে কাটা কি অসুবিধাকর বা শ্রমসাধ্য ব্যাপার। তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কাঠুরিয়া শ্রম লাঘব এবং সময় সংক্ষেপের জন্য কর্তিতব্য গাছের ডালার সেইদিকে প্রথ্য অবস্থায় বসে, যেখানে তার দেহের ওজন চাপ সৃষ্টি করে কাটবার কাজটাকে সহজ করে তুলতে পারে। এতে কাটারি চালানো সহজ হয়। এমন কি এটাও হয়তো লক্ষ করেছেন যে একাধিক কাঠুরিয়া থাকলে যে কাটছে সে যখন আগায় বসে কাটতে থাকে তখন অন্যরা দড়ি দিয়ে ডগার দিকটা বেঁধে টানতে থাকে নীচের দিকে। আর যে কাটছে সে-ও মাঝে মাঝে কিছুটা কাটা ডালের উপর দাঁড়িয়ে নাচতে থাকে চাপ-সৃষ্টির জন্য।

পণ্ডিতদের পক্ষে শ্রমজীবী মানুষের এই কৌশলের প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করা সহজ নয়। দিন আনে, দিন খায় যে মানুষ, তারা দিনান্তে একমুষ্টি উদর-পূর্তির অন্নসংস্থানের জন্য কি ধরণের ঝুঁকি নেয়, তা জিম করবেটের শিকার কাহিনী অথবা সমুদ্রে মাছ-ধরা ধীবরদের জীবনচিত্রের দিকে তাকালেই দেখতে পাবেন।

গল্পের কালিদাস পণ্ডিতদের বিচারে গাছ মুক্খু বা কাঠ মুক্খু। কারণ তারা দেখেছে তাদের গা-বাঁচানো মানসিকতা নিয়ে। মাঝে বসে গোড়ার দিকটা কাটায় বিপদের ঝুঁকি আছে ঠিকই। তবু ক্ষুধা-ক্লিষ্ট শ্রমজীবী

মানুষ এটাই করে দু'গ্রাস অন্নের সাশ্রয়ের জন্য। সময় ও শ্রম বাঁচাবার জন্য। চিরকালের কাঠুরে-কালিদাসেরা তাই গাছ মুক্খু।

এই গাছ মুক্খু কালিদাসদের কাছে রাজকন্যারা কল্পলোকের অধিবাসিনী। কালিদাসদের ঘরই নেই তার আবার মশারি। ও জিনিস ওরা দেখেনি। তাই ঘরের মধ্যে দরজা বিহীন ঘর দেখে অবাক হয়ে ঝাপ (দরজা) খোঁজে। এই ধরণের কালিদাসের দল উটকেই চেনে, উষ্ট্র সংস্কার করা অর্থাৎ সংস্কৃত উচ্চারণ। কালিদাসেরা প্রকৃতি জনের ভাষায় কথা বলে; প্রাকৃতই তাদের মাতৃভাষা। ওই প্রাকৃতকে sophisticate করেই সংস্কৃতের জন্ম। সংস্কৃত ভেঙে প্রাকৃত নয়। তবু পন্ডিতম্মন্যা রাজকুমারী উষ্ট্র না শুনে রুষ্টা হয়। এক কথায় কাঠুরের জীবন যাত্রাকে, তার শ্রম কৌশলকে বুঝতে না পেরে পন্ডিত সমাজ বলে ওঠে, ওরা গাছ মুক্খু। গাছ কাঠুরের হাতে কাঠে পরিণত হয়! সঙ্গে সঙ্গে কাঠুরে হয় কাঠ মুক্খু। তাই থেকে অকাট/আকাট মুক্খু, মুর্খ প্রবাদের জন্ম।

এই প্রবাদ প্রসঙ্গে আরও একটা দিক, সাধারণ মানুষের কথাবার্তায় কান পেতে থাকলে, ধরা পড়বে। আকাট মুক্খু প্রবাদটি সমাজের নিম্নতম অর্থাৎ শ্রমজীবী মানুষের মুখে শোনা যাবে না। এই প্রবাদের ব্যবহার তথাকথিত শিক্ষিত বা অল্প শিক্ষিতের মধ্যেই লক্ষ করা যাবে। অর্থাৎ এই প্রবাদের উৎস-মুখে শ্রমজীবী কাঠুরের গাছ কাটার কৌশলকে মৃত্যু বা বিপদ্-ভয়ভীত উচ্চ শ্রেণীর মানুষ সৃষ্টি করেছে ব্যঙ্গের ছলে। তাই আজও যখন বলি আকাট মুক্খু, তখন উদ্দিষ্ট ব্যক্তির বুদ্ধির স্বল্পতা দর্শনে যে অনুকম্পা প্রদর্শিত বা প্রকাশিত হওয়া উচিত তার পরিবর্তে বাচনভঙ্গীতে ধরা পড়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক মনোভাবের চিত্র।

অভিধান আকাট মুক্খু এই প্রবাদের যে সব অর্থ নির্ধারণ করেছেন সেগুলি একটু অভিনিবেশ সহকারে দেখলেই বোঝা যাবে যে সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ এ প্রবাদের স্রষ্টা নয়। শ্রমজীবী সাধারণ মানুষ, যারা জীবন-অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সাধারণ বুদ্ধিতে শ্রমের প্রয়োগ ক'রে অন্ন সংস্থানের চেষ্টা করে, তাদের কর্ম-কৌশল সম্বন্ধে তথাকথিত শিক্ষিত মানুষ শ্রদ্ধাশীল নয়। আর তাই থেকেই এই প্রবাদের জন্ম।

বঙ্গীয় শব্দকোষ প্রবাদটির অন্যতম অর্থ বলেছেন, কাষ্ঠবৎ নীরস। অর্থাৎ

বিদ্যারসহীন। এই অর্থটি সম্বন্ধে আমাদের মনে সংশয় আছে। কাষ্ঠ বললে আমরা বুঝি বৃক্ষের সেই অবস্থা, যখন তাকে কর্তিত করা হয়েছে ; তার জীবন রসকে নিঃশেষিত করে মানুষ তার নিজের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ রেখে প্রয়োগ-ইচ্ছানুযায়ী রূপান্তর সাধন করেছে।

কাষ্ঠবৎ নীরস। এই প্রসঙ্গে কালিদাসের নামে প্রচলিত আর একটি গল্পের উল্লেখ করছি। বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার শ্রেষ্ঠ রত্ন কালিদাস। একথা নাকি মহারাজ প্রায়শই বলতেন। মহারাজের এই পক্ষপাতপূর্ণ মন্তব্য অন্য অষ্টরত্নের মর্মপীড়ার কারণ ছিল। কিন্তু বলার মত দুঃসাহস বা অশালীনতা কারো মধ্যেই ছিল না। তাঁরা সুযোগ খুঁজছিলেন। একদিন কালিদাসের অনুপস্থিতিতে অন্য এক রত্ন মহারাজকে কথাটা বলেই ফেললেন—'কি এমন গুণ কালিদাসের মধ্যে মহারাজ দেখলেন যার জন্য তাকেই শ্রেষ্ঠ রত্ন বলে সর্বদা চিহ্নিত করেন?' এ ধরনের প্রশ্নের জন্য বিক্রমাদিত্য প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি চুপ করে রইলেন। দিন কেটে যেতে লাগলো।

একদিন মহারাজ নবরত্নের অন্যান্য সদস্য এবং কালিদাসকে নিয়ে সান্ধ্য ভ্রমণে বেরিয়েছেন। পথে যেতে যেতে হঠাৎ সামনে পড়লো একখন্ড কাটা-গাছের কান্ড। পড়ে আছে অনেক দিন। মহারাজ পন্ডিতদের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইলেন—ওটা কি? অষ্টরত্নের সবাই বললেন—শুষ্কং কাষ্ঠং তিষ্ঠত্যগ্রে। ফিরে তাকালেন বিক্রমাদিত্য কালিদাসের দিকে। বিনয়নম্র কালিদাস বললেন—নীরসঃ তরুবরঃ পুরতঃ ভাতি।

এ-ও এক লোককথা। এর স্রষ্টা কিন্তু শিক্ষাদীক্ষার দিক থেকে গাছ-মুকখু কালিদাস-কাহিনীর স্রষ্টার সমগোত্রীয় নয়। বর্তমান কাহিনীর আলোচনা হয় মহাবিদ্যালয় স্তরে সাম্মানিক শ্রেণীর অথবা বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে পঠন পাঠনায়।

এক দলের মতে, কালিদাস যে কত বড় রসজ্ঞ কবি তার প্রমাণ শব্দ চয়নে। শুষ্ক কাষ্ঠখন্ডকে তিনি তরুবর করে তোলেন ; 'নীরস' বিশেষণের সাহায্যে কাষ্ঠ-খন্ডে রস-সমৃদ্ধ সজীব পল্লবিত, কুসুমিত বৃক্ষের অনুষঙ্গে রূপান্তরিত করেন। অন্য দলের বক্তব্য—বাস্তবকে অস্বীকার করা কবির ধর্ম নয়। কারণ ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়। তাই অন্যান্যরা যখন 'শুষ্কং কাষ্ঠং' বলেন তখন ওটি যে আর গাছ নেই, তার প্রাণসত্তাকে হারিয়ে ফেলে মানুষের ভোগ্যপণ্যে পরিণত হয়েছে, তারাই নিষ্করুণ বাস্তব সত্যকে প্রকাশ করেন। ওঁরাই যথার্থবাদী।

বঙ্গীয় শব্দকোষের মতে নীরস কাষ্ঠবৎ, বিদ্যারসহীনরা আকাট মূর্খ। কিন্তু কোন বিদ্যারস? যে বিদ্যা শুষ্ক কাষ্ঠকে 'নীরস তরুবর' বলে সেই বিদ্যা? সে তো মিথ্যা? যখনই 'তরুবর' তখনই তো সে আর নীরস থাকে না। তরুবরের প্রাণরস আছে। সে তাতেই ভরপুর। যতই নীরস বলে অভিহিত করা হোক না কেন, সে কখনওই রসহীন নয়। আর যে বিদ্যা আপাত-মধুর শ্রুতিসুখকর বিশেষণে সত্য, রূঢ়, বাস্তব-সত্যকে ঢেকে দেয়, সে বিদ্যাকে প্রকৃত বিদ্যা নামে চিহ্নিত করা হবে কি? পণ্ডিতদের অভিধান, এই বিদ্যায় যারা রপ্ত নয়, তাদের যতই আকাট মূর্খ বলুক না কেন, জীবন সংগ্রামে এরা কেউ আকাট মূর্খ, গাছ মুক্‌খু নয়।

চিরকালের গাছ-মুক্‌খুরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বোকার মত পেটের তাগিদে অরণ্য সম্পদকে ধ্বংস করে রাজপুত্র, রাজকন্যাদের চেয়ার টেবিল, সোফা, আলমারি, খাট, নক্‌সী-দরজা তৈরির কাঁচামাল জোগাড় করে চলেছে; চোরা-চালানকারীদের উচ্ছিষ্টভোজী হয়ে অরণ্যরক্ষীদের গুলির নিশানা হতে বাধ্য হচ্ছে। অন্যদিকে যারা এইসব গাছ মুক্‌খুদের অসামাজিক কাজে লিপ্ত হতে বাধ্য করছে, সত্যিই তারা পণ্ডিত পদবাচ্য, প্রকৃতই বিদ্যারসপূর্ণ। আপশোস হয়, এই গাছ মুক্‌খুর দল কবে, কেমন করে এই সব পণ্ডিতের পাণ্ডিত্যের মুখোশ খুলতে শিখবে!

কথাগুলো চিন্তা করতে গিয়ে আবার বাঙলা ভাষার অভিধানের একটি অর্থের কথা মনে পড়লো। শ্রী জ্ঞানেমোহন দাস বলেছেন, পরিণত বা সাদৃশ্যার্থে আ+কাট (কাষ্ঠ) বা কট (শব)=আকাট; অভাব অর্থে অ+গতি অর্থে কট্‌+অ =অকাট৭ যে শবে পরিণত হয়েছে; শবের মত গতিহীন অর্থাৎ জড়বৎ।

কাঠমুক্‌খু বা গাছ মুক্‌খু বা অকাট / আকাট মূর্খের (বৃক্ষছেদনকারী শ্রমজীবীরা, এই ব্যুৎপত্তিগত অর্থে) দল শবেও পরিণত হয় নি। এরা গতিহীন বা জড়বৎও নয়। কারণ,

> চাষি খেতে চালাইছে হাল,
> তাঁতি বসে তাঁত বোনে, জেলে ফেলে জাল—
> বহুদূর প্রসারিত এদের বিচিত্র কর্মভার,
> তারি' পরে ভর দিয়ে চলিতেছে সমস্ত সংসার।

গাছ মুক্‌খুরা যদি গতিহীন হতো, শবে পরিণত হতো, এরা যদি জড়বৎ

হতো তবে ঐকতান কবিতার উদ্বৃত-শেষ-চরণে কবির চিন্তা মিথ্যা বলে প্রমাণিত হতে বাধ্য। এদেরই 'পরে ভর দিয়ে চলিতেছে সমস্ত সংসার'। এ-ই অতি বাস্তব সত্য।

তবু এরা প্রচলিত অর্থে সত্যি গাছ মুক্‌খু। তা নইলে,

'কামিনী ছিল গোয়ালার মেয়ে—বালবিধবা, সুন্দরী। বিনোদ চাটুজ্জেও ছিলেন লম্বা চওড়া জোয়ান,...তাছাড়া ছিল অসম্ভব দাপট।...তখন নায়েববাবুই ছিলেন এ অঞ্চলের দারোগা, নায়েববাবুই ছিলেন ম্যাজিস্টেট।...সারাজীবন একসঙ্গে যাহার সহিত কাটাইয়া, নিজের উজ্জ্বল যৌবন যাহাকে দান করিয়া কামিনী নারীজন্মের সার্থকতাকে বুঝিয়াছিল,...সেই ষোড়শী বালিকা তাহাদের বাড়ির সামনে বেগুন ক্ষেত হইতে ছোট চুপড়ি করিয়া বেগুন তুলিয়া ফিরিতে ছিল।

'পথে আসিতেছিল যুবক বিনোদ চাটুজ্জে, ধোপাখালি কাছারির নায়েব, ধোপাখালি গ্রামের দন্ডমুন্ডের কর্তা।...নায়েববাবু যখন কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছেন, তাহার তখন বড় লজ্জা হইল। বাঁ হাতে বেগুনের চুপড়িটা, ডান হাতে কঞ্চির আগড়টা শক্ত করিয়া ধরিয়া রহিল।

'হঠাৎ বিনোদ চাটুজ্জে তাহারই দিকে মুখ ফিরাইয়া চাহিলেন।

—বেগুন ওতে? এ কাদের ক্ষেত?

সে লজ্জায় সংকোচে বেড়ার সহিত মিশিয়া কোন রকমে উত্তর দিল, আমাদের ক্ষেত।

—তুমি কি রসিক ঘোষের মেয়ে?

—হ্যাঁ

—বেগুন বিক্রি কর তোমরা?

—না, এ খাবার বেগুন।

—তোমার বাবা কোথায়?

—চিলেমারি দুধ আনতে গেছে।

—ও।

নায়েববাবু চলিয়া গেলেন।

'তাহার বুক ঢিব ঢিব করিতেছিল। কপাল ঘামিয়া উঠিয়াছে। ভয় না লজ্জা, কে জানে। বাড়ী আসিয়া দিদিমাকে (মা তাহার আগের বছর মারা

গিয়াছিল) বলিল, আইমা, ওই কাছারির নতুন নায়েব ? যাচ্ছিলেন এখান দিয়ে, আমার কাছে বেগুন দেখে বললেন, বেগুন বিক্রির ? কি জাত আইমা ?

'তাহার দিদিমা বলিল, বামুন যে, তাও জান না পোড়ারমুখ মেয়ে ! চাইলেন কিনতে, বেগুন কটা দিয়ে দিলেই হ'ত। আমার তো মনে থাকে না ; তোর বাবাকে বেগুন দিয়ে আসতে বলিস কাছারিতে। বামুন মানুষ।

'এক চুপড়ি ভাল কচি বেগুন ও এক ঘটি দুধ সে-ই কাছারিতে দিয়া আসিয়াছিল। পরদিন বিকেলবেলা বাবার সঙ্গে গিয়াছিল।'

বেগুন দুধের সঙ্গে কামিনীরাও জমিদার বা তাদের নায়েবদের ভেট হয়ে আসছে আবহমানকাল এই সব গাছ-মুকুখু পরিবার থেকে। এরা যদি একবার 'পিতম' হয়ে উঠতে পারতো !—

'লোকটি তার নাম বলে পিতম—জাতে নাকি কাঁসারী। হাপর জ্বালাইতে জ্বালাইতে এক একবার সোজা হইয়া বসিয়া বলে—জয় রাধে !—রাধে গোবিন্দ ! সকালবেলা হইতে তাহার কাছে পাড়ার অনেকে আসিয়া জোটে ···মুখুয্যেমশায় সকাল হইতে ঠায় বসিয়া আছেন, কোনো রকমে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া একটি পিতলের ঘড়া বিনামূল্যে সারাইয়া লইবেন। তামাক খাইতে খাইতে পূর্বকথার খেই ধরিয়া বলিলেন—এই তো গেল কান্ড বাপু···তা এমন ম্যালেরিয়া ধরল—তোমাদের ওদিকে কি রকম হে কারিগর ? (তিনি সকাল হইতেই তাহাকে কারিগর বলিয়া ডাকিতেছেন) ।

—পরিপূন্নু—আজ্ঞে পরিপুন্নু—ম্যালেরিয়ার কথা বলবেন না বাবাঠাকুর—হাড় জ্বালিয়ে খেয়েচে—এই নিন্ আপনার ঘড়টা, ছটা পয়সা দেবেন—

মুখুয্যে মশায় ঘড়াটা হাতে লইয়া উঠিয়া পড়িয়া বলেন—হ্যাঁ ! এর জন্যে আবার পয়সা—দিলে একটা জিনিস ব্রাহ্মণকে সারিয়ে অমনি কার্তিক মাসের দিনটা—তার আবার—

পিতম তাড়াতাড়ি মুখুয্যে মশায়ের হাতের ঘড়াটা ধরিয়া অত্যন্ত অমায়িক-ভাবে হাসিয়া বলে—আজ্ঞে না, মাপ করবেন বাবাঠাকুর, এমনি সারিয়ে দিতে পারবো না—এখনো সকালবেলা বউনি হয়নি। আজ্ঞে না—তা পারবো না—ঘড়াটা রেখে যান্—বাড়ী গিয়ে পহা কটা পাঠিয়ে দেবেন—'

পিতম হতে পারলে এইসব পণ্ডিতের বিদ্যারসের প্রকৃত স্বরূপ, বিদ্যারস-

হীন আকাট মূর্খের দল উদ্ঘাটন করতে পারতো। সমাজের চেহারাটাই যেতো যেতো বদলে!

দিন বদলের পালা যেদিন আসবে সেদিন 'পণ্ডিতরা' বুঝবেন—অকাট মূর্খের দল শববৎ জড় নয়। তখন হয়তো আর সময় থাকবে না নতুন করে ভাববার—গাছমূক্খু কারা?

চিচিং ফাঁক

কোলকাতা দূরদর্শন কেন্দ্রের শিশুদের জন্য সাপ্তাহিক অনুষ্ঠানের অন্যতমটির নাম 'চিচিং ফাঁক'। অনুষ্ঠানটি যারা দেখেছেন, তারা এটাও লক্ষ করেছেন, অনুষ্ঠান শুরু হবার মুহূর্তে এমন একটা দৃশ্যের অবতারণা করা হয়, যাতে মনে হয় পাহাড়ের গায়ে একটা লম্বা ফাটল দরজার মত করে দু'পাশে সরে গেল। ভেতরে গুহা। সেই গুহার মধ্যে এবার শুরু হলো একের পর এক কৌতূহলো-দ্দীপক শিশুদের জন্য অনুষ্ঠান। যে মুহূর্তে অনুষ্ঠান শেষ হলো সেই মুহূর্তেই আবার দরজাটি বন্ধ হয়ে গেল। গুহামুখ আটকে গিয়ে পাহাড়টি যেন পূর্বাবস্থায় ফিরে এলো।

উল্লিখিত দৃশ্যটি আমাদের 'সহস্র-এক আরব্য-রজনী'-র 'আলিবাবা ও চল্লিশ চোর'-এর গল্পের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তা ছাড়া, এর পরিকল্পনা যে কোলকাতা দূরদর্শন কেন্দ্র করেছেন উক্ত গল্পের ভিত্তিতে, একথা তারা স্বীকার করেছেন 'দর্শকের দরবারে' অনুষ্ঠানে বিগত ৬ ডিসেম্বর '৮৫ তারিখে। কিন্তু আমাদের মনে পড়ে, গিরিশচন্দ্র ঘোষ তার আলিবাবা-নাটকে শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন। এ সম্পর্কে 'বাঙ্গালা ভাষার অভিধান' বলেন, চিচিং ফাঁক—গিরিশচন্দ্র ঘোষ উদ্ভাবিত হাস্যোদ্দীপক শব্দ। আলিবাবা নাটকে আলিবাবার গুহা প্রবেশের সাঙ্কেতিক শব্দ। অবলীলাক্রমে উন্মুক্ত, অবারিত দ্বার।'

উক্ত অভিধানের 'হাস্যোদ্দীপক শব্দ' এই বক্তব্য শোনার সঙ্গে সঙ্গে আরও একটি দিকের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়—'গিরিশ ঘোষ উদ্‌ভাবিত শব্দ'। শব্দটি কি গিরিশচন্দ্রের উদ্ভাবিত? ছোটবেলায় আলিবাবার গল্পটি ইংরেজীতে পড়েছিলাম। সেখানে দেখেছি, দস্যু-সর্দার তার রত্ন-গুহার দরজা খোলার জন্য শব্দটির ব্যবহার করে। আলিবাবা এটি শুনে মনে রেখে দস্যুরা চলে গেলে রত্ন নিয়ে বেরিয়ে আসে শব্দটি প্রয়োগ ক'রে। গিরিশচন্দ্র তার আলিবাবা

নাটকখানি লিখেছিলেন আরব্য-রজনীর ইংরেজী অনুবাদ পড়ে। সেখানে যেমন, ঠিক তেমনি আলোচ্য নাটকেও শব্দটি প্রথমে দস্যু-সর্দারের সংলাপেই আছে। তাই 'আলিবাবার কৌশলে গুহা প্রবেশের সাংকেতিক শব্দ,—এই উক্তির বদলে হওয়া উচিত ছিল 'আলিবাবা নাটকে গুহা প্রবেশের সাংকেতিক শব্দ'। শব্দটি আলিবাবার নয়। ওটি দস্যু-সর্দারের শব্দ। মূলে তা-ও নয়।

দ্বিতীয়ত, অভিধানের মতে শব্দটি হাস্যোদ্দীপক। কিন্তু কেমন করে? শব্দটি শুনলে কি হাসি পায়? বরং জাগে বিস্ময় বোধ। এবং বলা চলে, রত্ন-গুহার ভেতরে মন্ত্র ভুলে যাওয়া কাসেম যখন আলু ফাঁক, কুমড়ো ফাঁক, ঝিঙে ফাঁক, পটোল ফাঁক বলতে থাকে, ঢুকে যাওয়ার পর পেছনে বন্ধ হয়ে যাওয়া দরজা আর খোলে না, তখনই হাসি পায়। এবং শেষে দুর্বল স্মৃতিশক্তির জন্যই হোক বা অত ধন রত্ন দেখে উচ্ছ্বসিত আনন্দে আত্মহারা, শেষে মৃত্যু-শংকার জন্যই হোক, পূর্বোক্ত সব্জীর নাম বলতে থাকে, আর পরে অসহায় তাকে দস্যুরা ঢুকে কেটে ফেলে, তখন হাসি ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায়, দর্শক বা শ্রোতার মন অনুকম্পায় ভরে ওঠে। অন্যদিকে দস্যু-সর্দার যখন প্রথমবার গুহার দরজা খোলার জন্য চিচিং ফাঁক উচ্চারণ করে তখন থাকে তীব্র কৌতূহল। দরজা খুলবে তো! খুলে গেলে বিস্মিত হতে হয়, শব্দটির কি তীব্র মন্ত্রশক্তি! তাই 'চিচিং ফাঁক' হাস্যোদ্দীপক শব্দ নয়। তবে একটি কথা বলা দরকার যে চিচিং শব্দটি আপাতত অর্থহীন। যখন আমরা কথায় কথায় বলি, 'একি তোর চিচিং ফাঁক পেয়েছিস?' —তখন উদ্দীপ্ত হাসির বদলে তার একটা আভাস আসে মাত্র। কিন্তু 'চিচিং ফাঁক' যারা ব্যবহার করে, তারা আলিবাবার গল্প জানে। তাই চিচিং ফাঁক উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে গল্পস্থিত পটভূমি পরোক্ষে কাজ করে। আর সেই জন্যই হাসির আভাসও স্পষ্ট হয়ে ওঠে না।

অভিধানের 'অবলীলাক্রমে উন্মুক্ত', 'অবারিত দ্বার' অর্থ দুটিই সার্থকভাবে প্রযুক্ত। আরও একটি কথা। 'চিচিং ফাঁক' ভুলে কাশেম বিভিন্ন সব্জী তথা খাদ্যদ্রব্যের নাম বলে কেন? অন্য কিছুর নাম কেন মনে পড়ে না?

'চিকিং ফাঁক' এই শব্দ গিরিশচন্দ্রের উদ্ভাবন কিনা, এবার তা-ই দেখা যাক। আলিবাবা-র গল্প যারা ইংরেজীতে পড়েছেন, তারাই জানেন যে, সেখানে আছে 'ওপেন সিসেম (open sesame)। হিন্দী বা উর্দুতেও গল্পটি আছে। সেখানে open sesame-এর অনুবাদ করা হয়েছে 'খুল যা সিম্‌সিম্‌'।

বাংলায় ধ্বনি-সাদৃশ্যে গিরিশচন্দ্রের হাতে তা-ই হয়েছে 'চিচিং ফাঁক'। প্রসঙ্গতই মনে পড়ে আরও একটি সব্জীর নাম—চিচিঙ্গা। কিন্তু চিচিঙ্গার সঙ্গে নয়, sesame-এর সঙ্গে চিচিং-এর সম্পর্ক। কারণ এটি 'সিসেম'-এর পরিবর্তে ব্যবহৃত। সেদিক থেকে কেবল 'চিচিং'-অংশটুকু গিরিচন্দ্রের উদ্ভাবিত হলেও 'চিকিং ফাঁক' ইংরেজী open sesame-এর অনুবাদ মাত্র। গিরিশচন্দ্রের উদ্ভাবিত শব্দ নয়।

ইংরেজী ভাষার sesame-এর অথ কি? শব্দটি কোথা থেকে এলো? ইংরেজী sesame ল্যাটিনে sesamum। অক্সফোর্ড অভিধানের মতে প্রাচ্যদেশ থেকে শব্দটি এসেছে। সম্ভবত এর যোগ সেমেটিক ভাষাগোষ্ঠীর সঙ্গে। সীরীয় ভাষায় শব্দটি ষুম্ষম, আর্মানীয়তে ষুম্ষমা। আরবীতে সিম্সিম্। ইংরেজীতে শব্দটি সম্ভবত আরবী সিম্সিম্ থেকে এসেছে। আর বাংলা-ভাষায় সিসেম শব্দের অর্থ তিল। যে তিল দানাশস্য হিসাবে বিভিন্ন দেশে বিচিত্রভাবে ব্যবহৃত হয়।

আমাদের প্রশ্ন, আলিবাবা গল্পের দস্যু-সর্দার রত্নগুহার দরজা খুলতে গিয়ে সিসেম বা সিম্সিম্ বা চিচিং অর্থাৎ তিল শব্দটির প্রয়োগ করে কেন? তিলের এত কি গুরুত্ব? ধনরত্নের সঙ্গে তার সম্পর্ক কি?

আমাদের দেশে তিল সাধারণত বেশি ব্যবহৃত হয় হিন্দুদের মধ্যে শ্রাদ্ধকর্মে ও পূজা-পার্বণে। এই উপলক্ষে সারা দেশ জুড়ে কি বিপুল পরিমান তিলের অপচয় ঘটে ভাবলে শিউরে উঠতে হয়। কৃষি-শ্রমিকের রক্ত জল-করা পরি-শ্রমের উৎপাদন হয় জলে যায়, নয়তো পচে। আর খুব সদ্ব্যবহার মনে করলে, অপ্রয়োজনে গরুতে খায়। অতি সীমিত পরিমাণে রান্নায় ব্যবহৃত হয়; মিষ্টান্ন তৈরির কাজে কিছু লাগে।

শ্রাদ্ধে তিল দিই কেন? আমরা মনে করি আমাদের বিদেহী পূর্বপুরুষরা তিল ভক্ষণে ও তিলোদক পানে তৃপ্ত হন। এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকার মতে ভোজ্যদ্রব্য হিসাবে মানুষ সে সমস্ত দানাশস্য গ্রহণ করতো বা করে তাদের মধ্যে আদিতম হচ্ছে তিল বা সিসেম বা সিম্সিম্। আমাদের অতি-বৃদ্ধ প্র-প্র-প্রপিতা / মাতারা দানাশস্যের মধ্যে প্রথমে তিল খেয়েই বেঁচে থাকতেন। অন্যান্য দানাশস্য পরে খেতে শিখেছেন তারা। আজ তণ্ডুলভোজী আমরা প্রধানত ধান্যজাত দ্রব্য চাউলকে মুখ্য খাদ্যরূপে গ্রহণ করি। কিন্তু ধান্য শব্দের ব্যুৎপত্তি ধন+য। অর্থাৎ, খাদ্যই প্রধান ধন বা সম্পদ মানুষের

কাছে। আজ আমরা ধান্য বললে তণ্ডুল-মাতাকে বুঝি। কিন্তু অভিধানের মতে ধান্য পাঁচ প্রকার—ব্রীহি, শালি, শূক, শিম্বি এবং ক্ষুদ্র। ব্রীহি হচ্ছে আউশ বা আশু, শালি আমনের নাম। শূক হলো যব গম জাতীয়। শিম্বি শিম জাতীয়। বিভিন্ন রকমের ডাল, তিল, সরষে, তুলো বা আরও অনেক বীজ শিমের আকার ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মায়। ক্ষুদ্র হচ্ছে কঙ্গু অর্থাৎ কাউন, শামা (সংস্কৃতে শ্যামাক), চিনা ঘাস জাতীয় ক্ষুদ্র দানাশস্য।

এদের মধ্যে যাদের আমরা শিম্বিধান্য (শিম বা শিম্বি শব্দটি আরবী সিম-সিম শব্দের ভারতীয়রূপ। অর্থাৎ সেমেটিক ভাষাগোষ্ঠী থেকে সংস্কৃতে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে শিম-এ রূপান্তরিত হয়ে বাংলায় ব্যবহৃত হয়।—এমন ভাবা অসমীচীন নয় বলেই মনে হয়) বলছি, সেগুলির প্রকৃতি সম্বন্ধে যাদের অভিজ্ঞতা আছে তারা জানেন; অন্যান্য দানাশস্য পেকে গেলে বোঁটা থেকে খুলে ঝরে যায়। কিন্তু শিম্বিজাতীয় ধান্যের ক্ষেত্রে এটা হয় না। এদের বীজ দুই বা ততোধিক কপাটিকার মধ্যে জন্মে, পুষ্ট হয়, পাকে। প্রথম অবস্থায় শিম্বিজাতীয় ফলের বাইরের আবরণ অর্থাৎ কপাটিকার সমষ্টি অত্যন্ত পুষ্ট থাকে। যতই দিন যেতে থাকে ততই ভেতরের দানাগুলি বহিরাবরণের রসকে টেনে নিয়ে পুষ্ট হতে থাকে। এক সময় অর্থাৎ বীজগুলি রস টেনে টেনে পুষ্টির পূর্ণতা পেলে, পাকার সময় বাইরের কপাটিকা শুকিয়ে ফেটে যায়। শিম্বিজাতীয় অন্যান্য সমস্ত ফসলের মত তিল বা সিমেম বা সিমসিমের ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। তিলফলের বহিরাবরণ বা কপাটিক দু'টি নয়, যতটা মনে আছে, চার বা পাঁচটিতে বিভক্ত। প্রতি কপাটিকা বা দরজা খুলে গেলে পরিপক্ব অবস্থায় প্রচুর পরিমাণে শিম্বিধান্য (ধন) পাওয়া যায়। আর তা-ই ছিল আমাদের অতিবৃদ্ধ পিতৃ-পুরুষদের দানাশস্য জাতীয় খাদ্য, সভ্যতার প্রথম উন্মেষের যুগে। এর কারণ কি ?

ব্রীহি, শালি, শূক অথবা ক্ষুদ্র—এই চার প্রকার ধান্যকে বীজ অবস্থায় যারা দেখেছেন, তারাই স্বীকার করবেন যে যব বা গম অর্থাৎ শূক ধান্যের বীজের বাইরে করাতের মত ধারালো উপপত্র থাকে খুব শক্ত করে এঁটে। এই বৈশিষ্ট্য ব্রীহি, শালি বা ক্ষুদ্রের ক্ষেত্রে অক্ষরে অক্ষরে না হলেও আংশিকভাবে সত্য। অর্থাৎ ব্রীহি, শালির তণ্ডুলের বাইরে যে খোসার আবরণ থাকে তার বাইরের দিকটা ধারালো আর শক্ত। ক্ষুদ্র জাতীয়ের দানার আবরণ মসৃণ হলেও অত্যন্ত

শক্ত। তিলের বহিরাবরণ অত্যন্ত পাতলা। জলে ভিজিয়ে হাতে চটকে দিলেই আবরণ খসে ভেতরের শাঁস বা চাউল বেরিয়ে আসে।

প্রকৃতির স্বাভাবিক দান হিসাবে এই সব দানাশস্য আদিম মানুষ, সভ্যতার ঊষালগ্নে উষ্ণ বলয়ের কাছাকাছি অঞ্চলে জনসংখ্যার তুলনায় প্রচুর পরিমানে পেয়েছে। ক্ষুধার্ত আমাদের সেই যুগের পূর্বপুরুষদের কথা বলছি, যখন তারা চাষ করতে শেখেন নি। নিহত প্রাণীর মাংস অথবা প্রকৃতির স্বভাব-জ ফল মূল দানাশস্যই তাঁদের জীবন ধারণের অবলম্বন মাত্র। একমাত্র ডাল-পালা বা পাথরই তাদের হাতিয়ার। উন্নততর হাতিয়ার তৈরী বা ব্রীহি, শালি, শূক বা ক্ষুদ্র ধান্যের খোসা ছাড়ানোর জন্য যে ধরণের উপায়-উপকরণ ব্যবহারের প্রয়োজন, তা তখনো মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি এবং কৃৎ-কৌশলের অগম্য। তিল খাওয়া সে তুলনায় অনেক সহজ ব্যাপার। তিলই তাই দানাশস্যের মধ্যে প্রধান খাদ্য। তাই, তিলফলের 'দরজা খুলে যাও খুলে যাও'—অথাৎ 'খাওয়ার উপযুক্ত পাকা তিলদানা পাই'—ক্ষুধার্ত তাদের সে-ই ছিল অনুচ্চারিত কামনা, মনস্কামনা। খুল যা সিমসিম, ওপেন সিসেম, চিচিং ফাঁক তাই আদিম মানুষের খাদ্য প্রাপ্তির, বেঁচে থাকবার আকাংক্ষার মূল মানস-মন্ত্র। যাদুমন্ত্র নয়।

আজকের সম্পদ টাকাপয়সা, সোনা-রুপো, হীরে-জহরত, মণি-মুক্তা। কিন্তু সেই আদিম যুগে খাদ্যই ধন। দানাশস্য তাই ধান্য। কারণ অর্থনীতির ভাষায় সে বিনিময়যোগ্য বস্তু। যে আদিম যুগে তিল ছিল আমাদের প্রধান খাদ্যরূপী দানাশস্য, তখনকার মানুষ গুহাবাসী। ঋতুর প্রকৃতি-জ ফসল সে গুহায় রেখে, সঞ্চিত করে, তৃণভোজী আরণ্য-প্রাণীর গ্রাস থেকে সেগুলিকে রক্ষার জন্য গুহা-মুখে পাথর চাপা দিত। কৃষির কৌশল তার তখনও করায়ত্ত হয় নি বলে প্রয়োজন মত তার উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষমতা ছিল না। ক্ষুদ্র সঞ্চয়ই তার কাছে অমূল্য সম্পদ, প্রাণ ধারণের উপায়।

অন্যান্য প্রাণী বা গাছের মতই মানুষ আলোর পিয়াসী। তাছাড়া অসহায় অরণ্য জীবনের রাত্রি তখন তার কাছে বিভীষিকা। গুহা-মুখ পাথর চাপা দিয়ে বা সেখানে আগুন জেবলে সে রাত কাটাতো। প্রসন্ন প্রভাত-সূর্যের আলো একালের মতই তখন মানুষের মনে আশার সঞ্চার করতো, জীবন সংগ্রামে উদ্দীপনা আর উন্মাদনা জোগাতো। বাইরে বেরুবার সময়ও তাই গুহা-মুখ পাথর চাপায় আটকে দিত। বেরিয়ে পড়তো শিকারের আশায়। পরিশ্রান্ত

দিনের শেষে হয়তো বা শিকার হাতে পাখির মত ফিরে আসতো গুহা-রূপী কুলায়। ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত এবার দু'হাতে টানতো পাথরকে—খুল্ যা সিমসিম, ওপেন সিসেম, চিচিং ফাঁক ! ওখানেই রক্ষিত আছে তার মূল খাদ্য তিল। আর ও-ই তো আশ্রয়, বেঁচে থাকার সে যুগের নিশ্চিন্ত আশ্বাস। ও-ই তো তার আশ্রয় আর খাদ্যের রত্নগুহা !

এই খাদ্যাভ্যাস, সম্পদ-সম্পর্কিত সেই আদিম ধারণা, জীবনযাত্রা—সবই আজ ইতিহাস সভ্য মানুষের কাছে। সেইসব আজ এমনভাবে পরিবর্তিত যে 'ওপেন সিসেম'-এর আদি তাৎপর্য সম্পূর্ণ ভুলে বসে আছি আমরা। কিন্তু ভোলেনি সেই সমাজ-জীবনের মানুষ, যারা আলিবাবা লোককথার সৃষ্টি করেছিল। ভোলে নি বললে সত্যের অপলাপ হবে। ভুলেছে তিলকে। তাই কাসেমের দল কিছুতেই খাদ্যকে ভুলতে না পেরে শরণ নেয় আলু, কুমড়ো, ঝিঙে, পটোলের। কিন্তু ওরা তো মূল আর আদি দানাশস্য নয়। তাই দরজা খোলে না। স্মৃতি যে বিশ্বাসঘাতকতা করছে সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ! তাই চিচিং ফাঁক আজ অভিধানের ভাষায় হাস্যোদ্দীপক শব্দ।

যে দানাশস্য শ্রমজীবী আলিবাবার দল রেখেছিল গুহায়, তা স্বার্থান্বেষী লুটেরার কবলিত কালে কালে। বাধ্য হয়েই সুযোগ মত শ্রমজীবী আলিবাবা-রাই নিজেদের রক্ত আর ঘামে উৎপাদিত, সঞ্চিত ধন চুরি করে ক্ষুধার তাগিদে। শ্রমজীবী 'চোর' আখ্যা পায়। চুরি ক'রে, আশৈশব, নিজের আপন ভাই জেনে যে কাসেমদের কাছে তা প্রকাশ করে ফেলে, সে-ও যে আর এক লুটেরা দস্যু একথা পরিবার-সমাজের অভিজ্ঞতায় জেনেও ভুল করে বসে।

এবার ছোট দস্যু যায় বড় দস্যুর ওপর টেক্কা দিতে। ফল হয় উল্টো। বড়-দস্যু ছোট-দস্যুকে মারে। তারপর তার চিরকালের পরস্বাপহরণকারী কলঙ্কিত হাত বাড়িয়ে দেয় শ্রমজীবী আলিবাবাদের দিকে।

আলিবাবা লোককথার গল্প। তাই সেখানে আবির্ভূত হয় মর্জিনার দল। ছিটকে বেরিয়ে আসে মুক্তির পথে, ক্রীতদাসী জীবন থেকে। গল্পের মধ্য দিয়ে আবহমান কালের শ্রমজীবীদের লুটেরার বিরুদ্ধে আক্রোশ মুক্তির পথ পায়। শ্রমজীবীদের জীবনের যে তেল নিঙড়ে বের করে আবহমান কালের দস্যুরা ব্যবসা চালায়, সেই তেলকে উত্তপ্ত করে মর্জিনার দল পুড়িয়ে মারে দস্যুর সাঙ্গ-পাঙ্গদের। ছোরা বেঁধে দস্যু সর্দারদের বুকে। তারপর, তার

পর...? এবার শ্রমজীবী মানুষের উল্লাস। দস্যুকে নয়, দস্যুবৃত্তির মনোভাবের বুকে চিরকালের মত ছুরি বসায় তারা গল্পের মধ্যদিয়ে, বাস্তবে যা সম্ভব হয় নি আজও। তাইতো চিরায়ত দস্যুবৃত্তিকে কল্পনায় হত্যা করে নাচে গানে মেতে ওঠে মর্জিনা আবদাল্লার দল। সবাইকে নিয়ে সুখী জীবন, সুস্থ সমাজ গড়তে চায় তারা। এই আলিবাবাদের লোককথা।

প্রথম যুগের ধন তিল। পাকা তিলের কপাটিকা খোলাই ছিল ওপেন সিসেম। দ্বিতীয় পর্যায়ে খাদ্য ও বাসস্থানরূপী রত্নগুহার পাথর সরানো, তাই ছিল ওপেন সিসেম, চিচিং ফাঁক। তৃতীয় পর্যায়ে দস্যু-কবলিত ধনরত্নের পুনরুদ্ধারের মন্ত্র তাই খুল যা সিমসিম। চতুর্থ পর্যায়ে স্থূল সম্পদকে যেদিন মানুষ সৌন্দর্যের রূপসৃষ্টির রত্নে রূপান্তরিত করতে শিখলো সেদিন আবালবৃদ্ধ বণিতার কাছে কারু ও চারুশিল্প হলো সম্পদ। কোলকাতা দূরদর্শন কেন্দ্রের চারুশিল্পের অনুষ্ঠানরূপী মণ্ড-গুহার দরজা খোলে তাই 'চিচিং ফাঁক' মন্ত্রে। এ মন্ত্রের উচ্চারণ হাস্যোদ্দীপক নয়, শিল্পীর বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়ে ভরা এর নীরব উচ্চারণ।

ওপেন সিসেম, খুল যা সিমসিম, 'চিচিং ফাঁক'কে যদি কান পেতে শুনি, তাকে যদি অনুধাবন করার চেষ্টা করি, তবে শুনবো আমাদের অতি-অতি-অতি বৃদ্ধ পিতামহ/মহী, মাতামহ/মহীদের অস্তিত্বকে কেবল টিকিয়ে নয়, তাকে বাঁচিয়ে রেখে, বীজ থেকে অংকুরে, অংকুর থেকে পল্লবিত তরুতে, পল্লবিত তরু থেকে ফুলে ফলে সুশোভিত, সুস্থ সবল, সতেজ মহীরুহে রূপান্তরিত করার ইচ্ছার অস্ফুট অথচ দৃঢ়, পীনদ্ধ হুংকারকে।

স্থিতিশীল সমাজ ব্যবস্থায় বাস করে আজকের আমরা ভাবতেও পারিনা, কেমন করে সেই আমাদের পূর্বপুরুষরা, কি দুঃসহ জীবনযাত্রায়, বাঁচার জন্য প্রাকৃতিক নিয়মেই খাদ্যপ্রাপ্তির আকাংক্ষায় তীব্র লড়াই করে গেছেন! প্রকৃতি-জাত নতুন নতুন খাদ্যশস্য বা অন্যান্য ভোগ্যবস্তু আমাদের দেহ-মনের পুষ্টি সাধনের উপযুক্ত বলে চিহ্নিত হবার যোগ্য কিনা তা বুঝবার এবং বোঝাবার জন্য, অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্যে, বিষাক্ত খাদ্য খেয়ে জীবনকে বিসর্জন দিয়ে, সেই মৃত্যুর সংকেতে সাবধান-বাণী উচ্চারণ করে গেছেন, হে আমার প্রিয় ভবিষ্যৎ বংশধররা। ওটি খেয়ো না, মৃত্যু অনিবার্য। ওটা তোমার দেহ-মনের পুষ্টি-সাধনোপায়, অতএব খাদ্য। অজ্ঞাত জ্ঞানভাণ্ডারের রত্নগুহার দরজা

খুঁজতে সোচ্চার বাণী উচ্চারণ করছেন—ওপেন সিসেম, চিচিং ফাঁক।

এই বিশেষ ধরণের জ্ঞান তথা বিজ্ঞান অর্জনের জন্য কী যে করতে হয়েছে, আর কী যে করেন নি, তার স্বরূপ উপলব্ধির সময় বোধ হয় এসেছে। সমাজ-বিবর্তনের অলিখিত ইতিহাসের ভুলে যাওয়া লিপির পাঠোদ্ধারের সময় অনেক দিন আগেই সমাগত। যথার্থ এই ইতিহাসের প্রতি ঔদাসীন্যের ফল হবে বর্তমান আর্থ-সামাজিক দীনতার স্বরূপ এবং কারণ আবিষ্কার ও তার প্রতিকারের উপায় উদ্‌ভাবন সম্বন্ধে অবহেলারই নামান্তর। তাই আমাদেরও বলতে হবে—ওপেন সিসেম, চিচিং ফাঁক।

তৃতীয় বিশ্বের মানুষ, আমাদের নিজেদের দীনতার জন্য অন্যকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। নিজেরাই যে সচেতন হতে পারছি না।

অধিকাংশ সময়েই আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের কৃতকর্মের, জ্ঞান, সংস্কৃতি আর ঐতিহ্যের গর্ব করে এক ধরণের আত্মশ্লাঘা অনুভব করি। কিন্তু কী তারা করেছিলেন, কোন জ্ঞান কোন পথে অর্জিত হয়েছিল, সম্যক্ কৃতি, যা থেকে সংস্কৃতি শব্দটির সৃষ্টি করেছি, তার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন বা উপলব্ধির চেষ্টা না করে কিছু কিছু বাঁধা গৎ তোতাপাখির মত আউড়ে যাই। এই আত্মপ্রবঞ্চনা যদি আরও কিছুদিন ধরে চলে, তবে তৃতীয় নয়, আমাদের স্থান হবে চতুর্থ, বা তারও নীচের কোনো বিশ্বে।

পূর্বপুরুষদের দেখানো সে পথে এগুচ্ছি না বলেই চিচিং ফাঁক, ওপেন সিসেম, খুল যা সিমসিমকে জানার চেষ্টাও করিনা, আগ্রহও দেখাই না! আর সেইজন্যই জীবনের বাঁচার মূল মন্ত্রকে ভাবছি হাস্যোদ্দীপক, যাদু। জীবনকে ভাবি অদৃশ্য-শক্তির প্রভাবে প্রভাবিত। জীবনকে নিয়ে খেলি লটারি। স্বয়ম্ভর হবার চেষ্টা না করে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে অন্যের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মুখাপেক্ষী হই।

চিচিং ফাঁক, ওপেন সিসেম, খুল যা সিমসিমকে আবার যদি যাদু নয়, বাঁচার মন্ত্র, অগ্রগতির মন্ত্র, মনুষ্যত্ব লাভের মন্ত্র বলে গ্রহণ করতে পারি, জীবন-চেতনা ও জীবন-বোধের সঙ্গে স্বাঙ্গীকৃত করতে পারি, তবেই সার্থক হবে পূর্বপুরুষদের জীবন সংগ্রাম—যার ঐতিহ্যবাহী বর্তমানের আমরা আর আমাদের অনাগত উত্তরপুরুষ বা নারীসমাজ। সামগ্রিক ভাবে বৃহত্তর দেশ এক সুরে সম্মিলিত কণ্ঠে বলতে পারবে তাদেরই মত করে, নব নব অনুষঙ্গে—চিচিং ফাঁক, ওপেন সিসেম। এই হোক জীবনের মূলমন্ত্র।

ওঠ ছুঁড়ী তোর বিয়ে

জীবনের আঁকাবাঁকা পথের মোড়ে মোড়ে কত বিচিত্র অভিজ্ঞতা! কাজের অবকাশে যখনই একটু সময় পাই মনের সঙ্গে কথা বলার, কত অতীত স্মৃতি ভিড় করে আসে। এই আজই ঘটেছে এমনি একটি ঘটনা। অনেক দিন আগেকার কথা! কলেজের শিক্ষকতার জীবনে সবে ঢুকেছি তখন। কলেজে যাচ্ছি হন্ত-দন্ত হয়ে—একটু দেরী হয়ে গেছে। একটি ছাত্র এসে অত্যন্ত আবদারের সুরে, সমালোচনাধর্মী একটা প্রশ্নের উত্তর আলোচনা করে দিতে বলল। আর তা তক্ষুনি। প্রিয় ছাত্র। তবু, রাগ সামলাতে না পেরে বলে ফেলেছিলাম—ভেবেছ কি? দু'দিন বাদে পরীক্ষা। আজ এসেছ এমনি ধরণের জটিল প্রশ্নের আলোচনা করতে! একি 'ওঠ ছুঁড়ী তোর বিয়ে?'

বহুদিনের কথা। হঠাৎ আজ এই ঘটনা মনে পড়ে গেল কেন, বুঝতে পারছি না। সেদিন বলার সময় ভাবিনি। আজ কিন্তু একটা ভাবনা হচ্ছে। বাংলাভাষায় 'ওঠ ছুঁড়ী তোর বিয়ে' প্রবাদটি হামেশাই ব্যহৃত হলেও, আমার মনের একটি বিশেষ অনভূতিকে প্রকাশ করতে গিয়ে, একটি তরুণ মনের কাছে এটিকে ব্যবহার করা, শিক্ষক হিসাবে বোধ হয় ঠিক হয় নি। মনের অপ্রস্তুত অবস্থাকে প্রকাশ করতে গিয়ে প্রবাদ-স্রষ্টা যে শব্দগুচ্ছ ও তার ভাবানুষঙ্গ সৃষ্টি করেছেন, তা তরুণ মনের উপর একটি রোমান্টিক প্রভাব সাময়িকভাবে বিস্তারে করতে পারে বলে মনে হয়।

'ওঠ ছুঁড়ী তোর বিয়ে' বললেই, যে চিত্রকল্প আজ এই পরিণত বয়সে মনের সামনে ভেসে ওঠে, তা হচ্ছে—কোনো একটি আগত-প্রায়-কৈশোর মেয়ে আলস্যভরে বা অন্য কোনো কারণে চুপচাপ বসে অথবা শুয়ে আছে। অভিভাবক স্থানীয়া কোনো বর্ষীয়সী মহিলা তাকে যেন বলছেন, ওঠ। তোকে সাজিয়ে গুজিয়ে এক্ষুনি ছাদনা তলায় নিয়ে যাব। বর তোকে বরণের অপেক্ষায় সেখানে দাঁড়িয়ে

আছে। হাতে সময় নেই নষ্ট করবার মত। ওঠ্ শিগ্‌গির।

অন্যান্য প্রাণীর মতই বিবাহ মানব মানবীর ক্ষেত্রেও মূলত জৈবিক প্রয়োজনে। তবু, সর্ব দেশে, প্রায় সর্ব কালে এই অনুষ্ঠানের চিন্তাকে ঘিরে শত বরণের যে অনুভূতি কলাপ মেলে ধরে, তার কীর্তনগাথা লোকায়ত কাব্য-কবিতা, লোক-কাহিনী থেকে শুরু করে মহাকবিদের অমর কাব্যের, ঔপন্যাসিক, ছোটগল্প কারদের লেখার পাতায় পাতায় ছড়ানো আছে। এ ব্যাপারে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীমনের বিচিত্র অনুভূতির কথা বিভিন্ন দেশের কবি-গাথায় যতখানি স্থান লাভ করেছে, সে তুলনায় পুরুষের চিন্তা অনেক, অনেক কম ধরা পড়েছে। বিদেশের কথা বাদ দিয়ে আমরা যদি আমাদের দেশের, বিশেষ করে কালিদাসের কুমারসম্ভব-কাব্যে আসি, তবে দেখতে পাবো—আবাল্য শিবকে পতিরূপে পাবার আকাংক্ষায় উমা তপস্যা করেছে, প্রলোভনকে জয় করেও। অবশেষে সেই দিন এলো, যেদিন অঙ্গিরা এলেন হর-পার্বতীর বিবাহ ব্যাপারে ঘটকের ভূমিকায়। যাকে পাবার জন্য সুদীর্ঘ তপস্যা, তারই মনোগত অভিপ্রায় ব্যক্ত করবার জন্য এসেছেন অঙ্গিরা হিমালয়ের কাছে। পিতা এবং দেবর্ষির মধ্যে কী আলোচনা হয়, তার রস নিজে আস্বাদনের লোভ সংবরণ করতে পারে নি পার্বতী। তাই,

এবংবাদিনি দেবর্ষৌ পার্শ্বে পিতুরধোমুখী।
লীলাকমলপত্রাণি গণয়ামাস পার্বতী॥ ৬। ৮৪॥

দেবর্ষি অঙ্গিরা যখন বলছিলেন, আপনার কন্যা হবে বধূ, আপনি হবেন সম্প্রদাতা, আমরা প্রার্থী। শম্ভু।—হবেন বর, তখন পার্বতী হস্তোস্থিত লীলা-কমলের পাঁপড়ি গুণছিল অধোমুখে। কিশোরী কন্যাকুলের বিবাহ-চিন্তাকে কেন্দ্র করে, তাদের মনের লজ্জা ও আনন্দের সংযত অথচ মধুর কাব্যিক প্রকাশের এমন বর্ণণা বোধ হয় বিশ্ব-সাহিত্যে তুলনা রহিত।

কালিদাস বর্ণনা করেছেন রাজ-নন্দিনীর মনের চিত্রকে। অন্য দিকে এযুগে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় একই অনুভূতিকে প্রকাশ করেছেন গ্রাম-বাংলার দরিদ্রতম পরিবারগুলির অন্যতম একটির কিশোরী-কন্যা দুর্গার চিন্তার মধ্য দিয়ে।

পথের পাঁচালীর অন্নদা রায়ের জ্ঞাতিভ্রাতা নীরেনের সঙ্গে গোকুলের স্ত্রী দুর্গার বিয়ের কথা উত্থাপন করে বলে—তোর সংগে ঠাকুরপোর বিয়ে হলে কিন্তু দিব্যি মানায়। দুর্গা লজ্জায় রাঙা হইয়া বলিল—দূর!…যাও, খুড়ীমা যেন

কি…। পরে সে এক প্রকার ছুটিয়াই খিড়কী দোর দিয়া বাহির হইয়া গেল।…

মধু সংক্রান্তির দিন অপুদের বাড়িতে নীরেন নেমন্তন্ন খেতে এলে মায়ের আদেশে দুর্গাই পরিবেশন করেছে। পরে একদিন পথে দেখা হলে—একথা তাহার মনে ছিল এই যে, এই চশমা-পরা ছেলেটির সঙ্গেই সেদিন খুড়ীমা ঠাট্টাচ্ছলে তাহার বিবাহের কথা তুলিয়াছিল। তাহার ভারি কৌতূহল হইতেছিল, ছেলেটিকে সে ভাল করিয়া দেখে। কিন্তু মধু সংক্রান্তির ব্রতের দিনও তাহা সে পারে নাই, আজও পারিল না।…

পরে একদিন খুড়ীমার ওখানে দুর্গা বেড়াতে যায়। শোনে, নীরেনের বোধ হয় তাকে মনে লেগেছে।—

দুর্গা গোয়াল হইতে বাছুর বাহির করিয়া রৌদ্রে বাঁধিল বটে, কিন্তু অন্যদিন বাড়ীর কাজ তবু যা হোক কিছু করে, আজ সে ইচ্ছা তাহার মোটেই হইতেছিল না।…আজ যেন হাওয়াটা কেমন সুন্দর, সকালটা না-গরম-না-ঠান্ডা, কেমন মিষ্টি গন্ধ পাওয়া যায় লেবু ফুলের—যেন কি একটা মনে আসে, কি তাহা সে বলিতে পারে না।…

সুদর্শন পোকা—ঠিক পোকা নয়—ঠাকুর। দেখিতে পাওয়া অত্যন্ত ভাগ্যের…কাজ সে সন্তর্পণে ধুলার উপর বসিয়া পড়িল, পরে হাত একবার কপালে ঠেকাইয়া আর একবার পোকার কাছে লইয়া গিয়া বারবার দ্রুতবেগে আবৃত্তি করিতে লাগিল—সুদর্শন, সুভালাভালি রেখো। পরে সে নিজের কিছু কথা মন্ত্রের মধ্যে জুড়িয়া দিল—অপুকে ভাল রেখো, মাকে ভাল রেখো, ও পাড়ার খুড়ীমাকে ভাল রেখো—পরে একটু ভাবিয়া ইতস্তত করিয়া বলিল,—নীরেন বাবুকে ভাল রেখো, আমার বিয়ে যেন ওখানেই হয় সুদর্শন, রানুর মত বাজি-বাজনা হয়।…তপ্ত বাতাস আম্র-বউলের মিষ্ট গন্ধে, বনে বনে মৌমাছি ও কাঁচ-পোকার গুঞ্জন রবে, ছায়াগহন আমবনে কোকিলের ডাকে, স্নিগ্ধ হইয়া আসিতেছে।

রোদে রোদে ঘোরার জন্য দুর্গা মার খেয়েছে। রাত্রে অপু দুর্গা শুয়ে গল্প করছে। অপু দিদির গায়ে হাত দিয়া চুপি চুপি বলিল—একটা কথা বলবো দিদি?…তোর সঙ্গে মাষ্টারমশায়ের বিয়ে হবে—

দুর্গার লজ্জা হইল; কিন্তু ছোট ভাইয়ের কাছে এ সম্বন্ধে কোনো কথা-বার্তা বলিতে তাহার সঙ্কোচ হওয়াতে সে চুপ করিয়া রহিল।

কুমারসম্ভবের উমা রাজ-নন্দিনী। ঘটক নিজে উপস্থিত। পথের পাঁচালীর দুর্গা গরীবের মেয়ে। তাকে বিয়ের জন্য সুদর্শন ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা জানাতে হয়। উভয়েই প্রগতিশীল সভ্যতার আলোকে আলোকিত সমাজের কিশোরী। তাই দুজনেই লজ্জাশীলা। এই লজ্জাবোধ পরিশীলিত সমাজ মানসিকতার অবদান। কিন্তু আজও যারা আদিম জীবন যাত্রায় অনেকখানি অভ্যস্ত তাদের কিশোরীরাও বিবাহ চিন্তাকে একইভাবে গ্রহণ করলেও প্রকাশভঙ্গী স্বতন্ত্র। এস. এন. বারকাটকি লিখিত Tribal Folk-Tales of Assam (Hills) বইয়ে Pawi-গোষ্ঠীর লোক-কথা Two young men and a girl গল্পে একই কিশোরীকে ভালবাসে দু'টি তরুণ। একজন ব্যাঘ্র-মানব (অর্থাৎ ইচ্ছামত বাঘ থেকে মানুষ, মানুষ থেকে বাঘ হতে পারে), অন্যজন মানুষ। কিশোরীর বাবা মা ব্যাঘ্র-মানবকে ঠিক মত চেনে না অর্থাৎ তার স্বরূপ-পরিচয় জানে না।

একদিন ব্যাঘ্র-মানব 'ঝুম'-ঘরে নিয়ে কিশোরীটিকে মেরে ফেলে। খবর পেয়ে দ্বিতীয় প্রেমিক সেখানেই ব্যাঘ্র-মানবকে তলোয়ার দিয়ে মেরে কাটে। কিন্তু প্রেমিকার শোকে সে খাওয়া দাওয়া, আনন্দ ভুলে গেল। মেয়েটির মা told her younger daughter to ask the young man to accompany her to the jungle to pluck wild fruit. The young man and the girl went to the jungle where the man plucked fruit from the trees··· while he was plucking fruit..., the girl deliberately laid herself down on the ground in an enticing posture. When the young man saw the young girl in this posture, he could not restrain himself. And so a new romance was born...

উমা পদ্মের পাঁপড়ি খোলে, দুর্গা সুদর্শন ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা জানায়। আর-Pawi-গোষ্ঠীর কিশোরী নায়িকা enticing ভঙ্গীতে শুয়ে থাকে। প্রকাশ-ভঙ্গী বিভিন্ন হলেও একই কিশোরী-মন তিন ক্ষেত্রে। বিবাহ সম্পর্কিত চিন্তা আবহমান কালের কিশোরী-মনে যে ঢেউ তোলে, এরা তার ব্যতিক্রম নয়। উমা বা Pawi-গোষ্ঠীর আলোচ্য নায়িকার ক্ষেত্রে কল্পনা বাস্তবে রূপায়িত, দুর্গার ক্ষেত্রে তা মরীচিকার মত মিলিয়ে গেছে। এরা কেউই কিন্তু কোনো বর্ষীয়সীর কাছ থেকে, ওঠ ছুঁড়ী তোর বিয়ে জাতীয় কথা শোনে নি। এর একমাত্র কারণ মিলনের ক্ষেত্রে সামাজিক দিক থেকে কোনো বাধা ছিল না। এবং তিন জনই

কিশোরী অর্থাৎ গ্রাম্যভাষায় 'ছুড়ী'।

শিব-জায়া, কার্তিকেয়-জননী উমা অথবা পথের পাঁচালীর দুর্গা অথবা Pawi-গোষ্ঠীর নায়িকাটিকে যদি 'ছুঁড়ী' বলে চিহ্নিত করা হয়, তবে যে কোনো রসজ্ঞ পাঠক বা স্থিতধী ব্যক্তি বর্তমান লেখককে নিশ্চয়ই ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন না। এমন কি আমি নিজেও না। আর তা করবো না এইজন্য যে, ছুঁড়ী-শব্দটি বাংলা ভাষার বর্তমান-প্রয়োগে যে ভাব ও অর্থানুষঙ্গ বহন করে, তাতে কিশোরী-কন্যাকে সুনজরে দেখবার চিত্র পরিলক্ষিত হয় না। অর্থাৎ, এ ক্ষেত্রে শব্দার্থের অবনমন ঘটেছে। কিন্তু চিরদিন এমনটি ছিল না। বা মূলে শব্দটি মূলে কোনো দেশজ বা অপকৃষ্ট শব্দ নয়।

শব্দটির উৎপত্তি সংস্কৃত ছমন্ডী বা ছেমন্ডী শব্দ থেকে। সংস্কৃতে ছমন্ড শব্দের অর্থ নিঃসঙ্গ পুরুষ। ছেমন্ড অর্থ অনাথ। ছমন্ডী বা ছেমন্ডী এই দু'টি শব্দেরই স্ত্রী-লিঙ্গের রূপ। অর্থাৎ সংস্কৃত ছমন্ডী অর্থ নিঃসঙ্গ নারী, ছেমন্ডী অর্থে অনাথা বালিকা। ছমন্ডী বা ছেমন্ডী হিন্দীতে হয়েছে 'ছোঁরী'। বাংলায় ছুঁড়ী, ছুকরী। পূর্ববঙ্গের ভাষায় ছেরী। ছোঁরী শব্দটি কখনো অবজ্ঞা, কখনো সহানুভূতিসূচক অর্থে ব্যবহৃত হয়। আবার কখনও বা নব-যুবতী, বালিকা বা কিশোরী অর্থে। ছুঁড়ী এর ব্যতিক্রম নয়।

নব-যুবতী, কিশোরী বা বালিকা মাতাপিতৃহীনা হলে অনাথা সাময়িকভাবে হয় বটে, কিন্তু যেহেতু ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার চিরায়ত ধারায় নারীর স্বাধীন সত্তা স্বীকৃত হয় নি, তাই বাল্যকালে সে পিতার অধীন, যৌবনে স্বামীর এবং বার্ধক্যে পুত্রাধীনা। তার অধীনতা কোনো অবস্থাতেই গেল না।

পিতা বা স্বামীর অধীনতার অবস্থাতে কিন্তু সাধারণভাবে ছুঁড়ী বলার রেওয়াজ নেই। পুত্রের অধীনতার যুগে সে আর কিশোরী বা নব-যুবতী নয়। তাই সেই স্তরের কথা-ই ওঠে না। যদিও প্রাগাধুনিক যুগের সমাজ-ব্যবস্থায় বাল্য, এমন কি শৈশব-বিবাহ প্রচলিত ছিল, (আজও গ্রাম-ভারতে এ রীতি অব্যাহত, এমন কি অপ্রতিহত গতিতে চলেছে) তবু তাকে ছুঁড়ী বলার রীতি নেই। অন্ত্যজ (!) শ্রেণীর মেয়েদের অনেক সময় তথাকথিত উচ্চবর্ণের (!) মানুষরা ছুঁড়ী সম্বোধন করেন আজও, বা করতেন এক সময়। তবু বলবো, সাধারণভাবে কিশোরীকে কেউ ছুঁড়ী বলে না।

একক ভাবে ছুঁড়ী যাকেই বলা হোক না কেন, আলোচ্য প্রবাদটিতে সেই

একই বক্তব্য আছে যম-সংহিতার চতুর্বিংশ শ্লোকে।

জীমূতবাহন-প্রণীত দায়ভাগে পৈঠীনসি বলেছেন,—

যাবন্নোদ্ভিদ্যেতে স্তনৌ তাবদ্দেব দেয়া। অথ ঋতুমতী ভবতি দাতা প্রতিগ্রহীতা চ নরকমাপ্নোতি পিতৃপিতামহপ্রপিতামহাশ্চ বিষ্ঠায়াং জায়ন্তে। তস্মান্নাগ্নিকা দাতব্যা।

স্তনদ্বয় বিকাশের পূর্বেই কন্যাদান করবে। যদি কন্যা বিবাহের পূর্বেই ঋতুমতী হয়, দাতা ও গ্রহীতা উভয়েই নরকগামী হয় এবং পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ বিষ্ঠায় জন্ম গ্রহণ করেন। সেই হেতু অগ্নি অর্থাৎ ঋতুপর্ব সূচনার পূর্বে বিবাহ দিতে হবে।

এমন আরও বহুতর উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে। তবু এখানেই নিবৃত্ত থেকে বলছি,—কন্যার একটি ঋতুকালও যাতে ব্যর্থ না হয়, প্রতি ঋতুতে গর্ভাধানের সাহায্যে যাতে তাকে সন্তানবতী হওয়ার পথে বাধ্য করা যায়, পুরুষ নিজে বহুতর সন্তান, বিশেষ করে পুত্রের পিতৃত্ব অর্জন করতে পারে, সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে স্মৃতিকাররা উচ্চবর্ণের মানুষের জন্য এই বিধান দিয়েছিলেন। স্মৃতি-শাসিত সমাজ নারীকে পুত্রোৎপাদক জীব হিসাবে চিহ্নিত করেছে। কিন্তু দেখেনি বা দেখবার মত মনই তৈরি করে নি, যা দিয়ে অনুভব করা যায় কৈশোর-যৌবনের সৃষ্টি-প্রবণ অনুভূতিকে। যে অনুভূতি মানব-মানবীকে বিবাহের রঙীন কল্পনায় বিভোর করে তোলে। তাই যৌবনাগমের পূর্বেই নারীর প্রতি স্মৃতি-শাস্ত্রকারের দুর্লঙ্ঘ্য এই সামাজিক আদেশ।

এ আদেশ কি সমাজ মেনে চলতো? উত্তর পাওয়া যায় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর 'আত্মচরিত' গ্রন্থে। তিনি ঐ গ্রন্থের 'কুলসম্বন্ধ' কুলীন বিবাহের প্রথা' নামক অংশে লিখেছেন,—'কুলসম্বন্ধের অর্থ এই যে, কুলীন বৈদিকের ঘরে কন্যা জন্মিলেই দুই এক মাসের মধ্যে সমশ্রেণীর কোন শিশুবালকের সহিত তাহার বিবাহ সম্বন্ধে স্থির করিয়া রাখা হইত।...এই প্রথানুসারে আমার পিতার ছয় কি সাত মাস বয়সের সময়, কলিকাতার ছয় ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্ববর্তী চাংগড়িপোতা গ্রামের হরচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের একমাস বয়স্কা প্রথমা কন্যার সহিত কুলসম্বন্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল। তদনুসারে দশম কি একাদশ বৎসর বয়সে আমার পিতার বিবাহ হইল।'

নিজের বিবাহ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য—'সাল তারিখ মনে নাই, তখন ঠিক কত

বয়ঃক্রম ছিল, তাহাও স্মরণ নাই, ১২। ১৩ বৎসরের অধিক হইবে না। আমার মাতুলালয়ের সন্নিকটস্থ রাজপুর গ্রামের ৺নবীনচন্দ্র চক্রবর্তীর জ্যেষ্ঠা কন্যা প্রসন্নময়ীর সহিত আমার প্রথম বিবাহ হয়। প্রসন্নময়ীর বয়ঃক্রম যখন একমাস ও আমার বয়ঃক্রম যখন দুই বৎসর, তখন তাহার সহিত আমার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইয়াছিল।

উদ্ধৃত দু'টি দৃষ্টান্তেই সম্বন্ধ স্থির বা বিবাহ-উৎসব সম্পন্ন করার কোনো সময়েই কন্যার (বরেরও) মানসিক প্রস্তুতি যে ছিল না, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এর অন্যতম কারণ জৈবিক দিক থেকে সে বিবাহের উদ্দেশ্য সফল করার পর্যায়ে আসে নি। মনের দিক থেকে যে নয়, তা আগেই বলেছি। তাই উভয় ক্ষেত্রেই সমাজের অলঙ্ঘ্য আদেশ—ওঠ ছুঁড়ী তোর বিয়ে।

উচ্চবর্ণের প্রতি সমাজের এই নির্দেশ কালে কালে তথাকথিত নিম্নবর্ণের মানুষকেও প্রভাবিত করেছে। তাই, বাল্য-বিবাহের চিত্র আজকের গ্রাম-বাংলায়ও আছে। বেশি করে দেখা যায় নিম্নবর্ণের মানুষের মধ্যে। প্রসঙ্গত এই শতাব্দীর পঞ্চাশের / ষাটের দশকের একটি চিত্র, যা আমার মনে উজ্জ্বল হয়ে আছে, তার উল্লেখ না করে পারছি না।

সম্ভবত ১৯৫১ / ৫২ সাল। গাড়ি বাঁকুড়া রেলওয়ে স্টেশনে দাঁড়িয়ে। আমি প্ল্যাটফর্মে। একটি বরযাত্রীর দল এলো। গাড়িতে যাবে নববধূকে নিয়ে। বরকে দেখলাম। ১৫। ১৬ বছরের একটি ছেলে। কনে কোথায়? হঠাৎ একটি তীক্ষ্ন কান্নার আওয়াজ। শিশুকন্ঠের। তাকিয়ে দেখলাম একজন বয়স্ক ব্যক্তির কোলে কনে-চন্দন-চেলিতে ঢাকা তিন-চার বছরের একটি শিশুকন্যা। প্রাণপণ চীৎকার আর ছটফট করছে সে—আমি বাড়ি যাবো। যার কাছে শিশুটি, সে তাকে কিছুতেই কোলে রাখতে পারলো না। উথাল পাথাল ছটফটানির ফলে নামিয়ে দিল মাটিতে। ছাড়া পেয়েই রাগে দুঃখে সমস্ত জামা কাপড় খুলে সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে প্ল্যাটফর্মে গড়াগাড়ি খেতে খেতে পরিত্রাহি চীৎকার—আমি বাড়ি যাবো। সমাজের ওঠ ছুঁড়ী তোর বিয়ে—অনুশাসনকে কিছুতেই সে মানতে রাজি নয়, সে যেন এর বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ। কারণ, কি ঘটছে তার জীবনে, তার কিছুই সে বোঝে না। শুধু দেখছে কতগুলি অপরিচিত লোকের সঙ্গে ততোধিক অপরিচিত জায়গায় সে চলেছে।

এ তো গেল কুলসম্বন্ধ প্রসঙ্গের একটি দিক। এর অন্য আর একটা দিকও

আছে। 'কুলসম্বন্ধ'-রীতি অনুসারে স্থিরীকৃত, 'যদি বিবাহের পূর্বে বাগ্‌দত্ত বরের মৃত্যু হইত তাহা হইলে কন্যা 'অন্যপূর্বা' নাম পাইত। তৎপরে আর তাহার কুলীন বরের সহিত বিবাহ হওয়ার সম্ভাবনা থাকিত না, মৌলিক বরের সহিত বিবাহ হইতে। আমার দুই পিসি; এইরূপে 'অন্যপূর্বা' হইতে মৌলিক বরের সহিত বিবাহিতা হইয়াছিলেন।' বলেছেন পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী।

বাঙালীর ঘরের মেয়ে ছোটবেলা থেকে যে আলোচনা শুনে জীবনকে গড়তে যায়, তা একমাত্র বিবাহ-কেন্দ্রিক। স্বভাবতই বিবাহের প্রকৃত তাৎপর্য বোঝবার আগে থেকেই এ বিষয়ের চিন্তাতে তাকে অভ্যস্ত করানোর চেষ্টা হয়। জ্ঞান হওয়া অবধি, উল্লিখিত সমাজ পরিবেশে সে জানে যে, সে শৈশবেই বাগ্‌দত্তা। কয়েক বছর পরে বিয়ে হবে। সমাজে তার মোটামুটি স্বীকৃতি আছে। কিন্তু যদি স্বামীরূপে নির্ধারিত বালকটি প্রকৃত বিবাহের পূর্বেই মৃত্যুর আশ্রয়ে চলে যায়, তবে বাগ্‌দত্তা কন্যা পরে বিবাহের তাৎপর্য বুঝেও উপলব্ধি করে যে তার পূর্বনির্দিষ্ট সামাজিক মর্যাদার স্থান নেই। কৌলীন্য-অকৌলীন্যের মর্যাদাবোধ গড়ে না ওঠা সত্ত্বেও বোঝে, এবার আর সে কুলীনের ঘরে স্থান পাবে না। এই অবস্থায় মৌলিক বর নির্দিষ্ট করে সমাজ তাকে ধমকে ওঠে—ওঠ ছুঁড়ী তোর বিয়ে। বিবাহের পর মৌলিক পরিবারের বধূ হিসাবেও স্বাভাবিক সম্মান, মানুষের উপযুক্ত মর্যাদা সে পাবে না। কারণ ইতিপূর্বেই স্বামীরূপে চিহ্নিত বাগ্‌দত্ত বালকের মৃত্যুতে 'ভাতারখাকী' নাম সে পেয়েছে। এই সব ক্ষেত্রে 'ওঠ ছুঁড়ী তোর বিয়ে' বলে ধমক দিয়ে বিয়ে দেওয়া ছাড়া অন্য উপায় নেই।

কৌলীন্য প্রথার যূপকাষ্ঠ সমাজরূপী ভূমিতে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত আছে। অন্যদিকে স্মৃতিশাস্ত্রের কঠোর নির্দেশ—ঋতুমতী হওয়ার আগেই কন্যাকে পাত্রস্থ করতে হবে। অন্যথায় 'বৃষলী' অর্থাৎ অবিবাহিতা ঋতুমতী কন্যার প্রতিটি নিষ্ফল-ঋতু-আবর্তের পাপে বর্তমান, এমন কি মৃত ঊর্ধ্বতন পুরুষরা নরকগামী, ভ্রূণহত্যা পাপে লিপ্ত হতে থাকবে, পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহরা বিষ্ঠায় জন্মাতে থাকবে। এমন ভয়াবহ পরিস্থিতিতে কুলীন-পুত্রদের দ্বিবিধ লাভ। একদিকে সে-ই কেবল শ্বশুরকুলকে সমাজ-নির্দিষ্ট পথে গৌরী-কন্যাকে বিবাহ করে উদ্ধার করতে পারে। ফলে এলো কুলীন কুল-প্রদীপদের মধ্যে বহুবিবাহ প্রথা। অন্যদিকে বিয়ের বাজারে তাদের দাম গেল বেড়ে। বরপণের অঙ্ক বেড়ে যেতে লাগল। কন্যাদায়গ্রস্ত দরিদ্র পিতার পক্ষে সে টাকার অঙ্ক

যোগার করা অসম্ভব ব্যাপার। এই দ্বিতীয় দিকটির চিত্র ধরা আছে, বাঙালী পাঠকমাত্রেরই জানা, শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত উপন্যাসে। এখানে তা তুলে দেবার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না।—

'আমি যখন আমাদের গ্রামের মনসা পণ্ডিতের পাঠশালের সর্দার-পোড়ো, সেই সময় ইহার (রাজলক্ষ্মী) দুইপুরুষে কুলীন বাপ আর একটা বিবাহ করিয়া ইহার মাকে তাড়াইয়া দেয়। স্বামী পরিত্যক্তা মা সুরলক্ষ্মী ও রাজলক্ষ্মী দুই মেয়ে লইয়া বাপের বাড়ি চলিয়া আসে। ইহার বয়স তখন আট নয় বৎসর ; সুরলক্ষ্মীর বারো-তেরো।…ইহার বিবাহ। সেও এক চমৎকার ব্যাপার। ভাগ্নীদের বিবাহ হয় না, মামা ভাবিয়া খুন। দৈবাৎ জানা গেল, বিরিঞ্চি দত্তের পাচক-ব্রাহ্মণ ভঙ্গকুলীন সন্তান।…বিরিঞ্চি দত্তের দুয়ারে মামা ধন্না দিয়া পড়িলেন—ব্রাহ্মণের জাতি রক্ষা করিতেই হইবে। এতদিন সবাই জানিত দত্তদের বামুনঠাকুর হাবা-গোবা ভালোমানুষ। কিন্তু প্রয়োজনের সময় দেখা গেল, ঠাকুরের সাংসারিক বুদ্ধি কাহারো অপেক্ষা কম নয়! একান্নো টাকা পণের কথায় সে সবেগে মাথা নাড়িয়া কহিল, অত শস্তায় হবে না মশায়—বাজারে যাচিয়ে দেখুন। পঞ্চাশ-এক টাকায় একজোড়া ভালো রামছাগল পাওয়া যায় না—তা জামাই খুঁজছেন। একশ-একটি টাকা দিন—একবার এ-পিঁড়িতে বসে আর একবার ও-পিঁড়িতে বসে, দুটো ফুল ফেলে দিচ্ছি। দুটি ভাগ্নীই এক সংগে পার হবে। আর একশ-খানি টাকা—দুটো ষাঁড় কেনার খরচাও দেবেন না? কথাটা অসংগত নয় তথাপি অনেক কষা-মাজা ও সহি-সুপারিশের পর সত্তর টাকায় রফা হইয়া এক রাত্রে এক সংগে সুরলক্ষ্মী ও রাজলক্ষ্মীর বিবাহ হইয়া গেল। দুই দিন পরে সত্তর টাকা নগদ লইয়া দু-পুরুষে কুলীন-জামাই বাঁকুড়া প্রস্থান করিলেন। আর কেহ তাহাকে দেখে নাই।'

সুরলক্ষ্মীর বয়স বারো-তেরো, রাজলক্ষ্মীর আট-নয়। পিতৃহীনা! মামার গলগ্রহ। ম্যালেরিয়া ও প্লীহায় পেটটা ধামার মত। হাত-পা কাঠির মত। মাথার চুলগুলো তামার শলার মত। এই কন্যা দু'টির বিবাহ সম্পর্কিত চিন্তা কী ধরণের হতে পারে, সে বিষয়ে গবেষণা না করে নির্দ্বিধায় বলা যায়, দুটো ষাঁড় কেনার খরচা নিয়ে যে কুলীন-পুংগব তাদের উদ্ধার করতে এসেছেন, তার সম্বন্ধে 'বিবাহের কনে দু'টির যে মনোভাব গড়ে উঠেছিল এবং মামা নিজের গলগ্রহকে ঝেড়ে ফেলার জন্য যে ব্যবস্থা করেছিলেন, তাতে দুজনকেই

ধমকে বিয়ের পিঁড়িতে বসাতে হয়েছিল—ওঠ ছুঁড়ী তোর বিয়ে।

শরৎচন্দ্রেরই অরক্ষণীয়ার নায়িকা জ্ঞানদার জীবনেতিহাস এই একই সামাজিক রক্ত-চক্ষুর বেদনাময় ইতিহাস। যে অতুলকে সে সেবা-শুশ্রূষার সাহায্যে যমের হাত থেকে বাঁচিয়েছিল, সে যেদিন মৃত্যুপথযাত্রী প্রিয়নাথের কাছে করা প্রতিজ্ঞার কথা বিস্মৃত হয়ে জ্ঞানদা সম্বন্ধে উদাসীন হলো, যেদিন মৃত্যুপথযাত্রিনী মায়ের তার হাতে আগুন পাওয়ার বিধিনিষেধের বাধা শুনলো, সেদিন জ্ঞানদা নিজেকেই নিজে ধমকেছিল—ওঠ ছুঁড়ী তোর বিয়ে। গোপাল ভট্টাচার্য যখন তার দূর সম্পর্কের ভাগিনেয়কে নিয়ে নিজে জ্ঞানদাকে দেখতে এলো তখন যেন সমাজ স্বর্ণ-র মুখে বলে উঠলো—ওলো গেনি, ওটা নামিয়ে রেখে শিগ্‌গির শিগ্‌গির আয়, তারা এমনি দেখে যাবে।

স্বর্ণমঞ্জরীর এই আহ্বানের সময় জ্ঞানদা 'অপরাহ্ন বেলায় একাকী রান্নাঘরে বসিয়া সে মায়ের জন্য পথ্য প্রস্তুত করিতেছিল…।' 'বাংগালীর মেয়ে—কত জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া যে শাস্ত্রের যূপকাষ্ঠে কন্যা বলি দিয়া আসিয়াছে, আজ পিছাইয়া দাঁড়াইবে কি করিয়া?' সময় নেই। জ্ঞানদার জীবনের এই পরিস্থিতিতে আলোচ্য প্রবাদটিকে পূর্ণাংগ রূপে মনে পড়ে।—ওঠ ছুঁড়ী তোর বিয়ে/ধুচনি মাথায় দিয়ে।

ধুচনি চাল ধোয়ার পাত্র। বালিকা-কন্যা যখন, যে বয়সে পারিবারিক স্নেহ-আবেষ্টনীর মধ্যে থেকে পরিবার-সমাজের দায় দায়িত্ব পালন শিক্ষায় শিক্ষান-বীশীর কাজে হাতেখড়ি দিচ্ছে, তার মনে যখন বিবাহ-সম্পর্কিত চিন্তার লেশ মাত্রেরও উন্মেষ ঘটে নি, তখনই সমাজের রক্তচক্ষু বলছে—অন্য সাজসজ্জা কেনার সময় নেই, বিয়ের বয়স পার হয়ে যাচ্ছে। তাই ধুচনিকেই কনে-চূড়ো (টোপর) করে বিয়ে দেওয়া হবে। উঠে পড় ছুঁড়ী।

বিয়ে না হলে ঋতুমতী অবিবাহিতা কন্যার হাতের আগুনও অপবিত্র—তা রান্নায়ই হোক, আর মুখাগ্নির ক্ষেত্রেই হোক। তাই শত বঞ্চনা-বেদনার মধ্যে জ্ঞানদা নিজেকে যেন চাবুক মেরে চলেছে—ওঠ ছুঁড়ী, তোর বিয়ে! তাড়াতাড়ি সাজলো সে। 'তাহার ঠোঁটের রঙ গালে, গালের রঙ দাড়িতে, অন্ধকার কোণে স্বহস্তে টিপ পরিতে গিয়া সেটা কপালের মাঝখানে লাগিয়াছে। রুক্ষ চুল বোধ করি তাড়াতাড়ি এক খাবলা তেল দিয়া বাঁধিতে গিয়াছিল, তখনো দুই রগ গড়াইয়া তেল ঝরিতেছে।' সে পাত্রপক্ষের সামনে এলে 'দুই একটা মেয়ে পাশ

হইতে খিল-খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। একজনের কোলে ছেলে ছিল, সে কহিল, গিঁনি পিতি থঙ থেজেচে। পিতি, এমনি কোলে জিব বার কলো।—বলিয়া সে হাঁ করিয়া জিভ বাহির করিয়া দেখাইল। আর একবার সবাই খিল-খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।' 'যে মেয়েটা আজকাল লজ্জায় কখনো মুখ তুলিয়া কথা কহিতেই পারিত না, সে কেমন করিয়া, আজ সকল লজ্জায় পদাঘাত করিয়া নিজের ওই স্বাস্থ্য-শ্রীহীন দেহটাকে স্বহস্তে সাজাইয়া আনিয়া ঐ অতিবৃদ্ধটার পায়ে ঠকাইয়া বিক্রি করিতে গিয়াছিল। কিন্তু বিক্রি হইল না—ফাঁকি ধরা পড়িল।' কন্যা-বিবাহের এমন বেদনা-বিধুর, করুণ চিত্র বাংলা সাহিত্যে বিরল। সমাজ বলছে—ওঠ ছুঁড়ী, তার বিয়ে, তার মা বলছে—ওঠ ছুঁড়ী, তোর বিয়ে। স্বর্ণমঞ্জরী বলছে—ওঠ ছুঁড়ী, তার বিয়ে। জ্ঞানদা নিজেকে নিজে বলছে—ওঠ ছুঁড়ী, তোর বিয়ে। শান্তশীলা, সেবা পরায়ণা, দরিদ্র পিতামাতার আদরের দুলালী (মেনকার উমা) সত্যি, 'ছুঁড়ী'তে রূপান্তরিতা।

৩

ওঠ ছুঁড়ী তোর বিয়ে—প্রবাদটির কথা মনে পড়লেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে নাট্যকে রামনারায়ণের 'কুলীনকুল সর্বস্ব' নাটকের কথা। নাটকের চারটি মেয়ে-চরিত্র জাহ্নবী, শাম্ভবী, কামিনী আর কিশোরীর আচরণের চিত্রকে মনে পড়ে। এদের বয়স যথাক্রমে ৩২, ২৬, ১৪ এবং ৮ বৎসর। এদের পিতা কুলপালকের কন্যাদের সকলের জন্য ষাট বৎসর বয়স্ক এক পাত্র স্থির করেছে অনৃতাচার্য নামে সুচতুর ঘটক। কুলীন বংশোদ্ভব এই কুলপালক। তাই পাছে কেউ ভাঙচি দিয়ে এমন লোভনীয় পাত্রকে হাতছাড়া করে দেয়, এইজন্য মাত্র একদিনের মধ্যেই চারটি বোনের বিয়ে হবে ঐ পাত্রের সঙ্গে। এ-ও সেই একই কথা ও সুরের গান—ওঠ ছুঁড়ী তোর বিয়ে।

বিয়ের সংবাদ শুনে ৩২ বৎসর বয়স্কা জাহ্নবী বলে, 'এই বয়সে যমের সঙ্গে বিবাহ হইলেই ভাল হয়। বৃদ্ধ বয়সে আর এই বিড়ম্বনা কেন?' দ্বিতীয়া কন্যা শাম্ভবী বিয়ের সংবাদ শুনে আশ্চর্য হলো। তার উক্তি, 'আমরা কুলীন কন্যা, আমাদের আবার বিবাহ কি?' তৃতীয়া কামিনী বয়স ১৪। বিবাহকে ঘিরে কৈশোরের রঙীন স্বপ্ন-কল্পনা তাঁর মনকে চঞ্চল করে তোলে। তাই সে বলে, এ-বর যেমনই হউক; বিবাহ হইলেই হয়, না হওয়া পর্যন্ত বিশ্বাস কি? শুনিয়া এ শুভ কথা হয়েছি চঞ্চল।' এত অল্প বয়সে তার সৌভাগ্যের উদয়কে

সে যেন বিশ্বাসই করতে পারছে না। চতুর্থী বা কনিষ্ঠা ৮ বৎসরের কন্যা কিশোরী পাড়ার মেয়েদের সংগে খেলতে বেরিয়েছে। সে বিয়ের খবর পায়নি। দিদির ডাক শুনে খেলা ছেড়ে এলো। মা বিয়ের সংবাদ দিলেন। সে খুশি। খুশির কারণ বিয়ের আনন্দ নয়। সে জানে বাড়িতে একটা কিছু হলেই খাওয়া দাওয়া হয়। তাই বিয়ের কথা শোনা মাত্র জিজ্ঞেস করে, 'ও মা! তা কি আমি খাব?' খাওয়াতেই তার আনন্দ, বিয়েতে নয়—কারণ এ ব্যাপারটা বোঝবার মত জৈব-মানসিক পক্বতা তার আসে নি। তাই মা যখন বলেন, তাদের চার জনেরই বিয়ে হবে, তখন সে মাকে বলে, 'ও মা! তবে তোর হবে না?' এই এই সংলাপকে আপাতত স্থূল মনে হলেও এটাই তো স্বাভাবিক!

সে যুগের বিচারে জাহ্নবী এবং শাম্ভবী বিগত-যৌবনা। তাই হারিয়ে যাওয়া মনকে নতুন করে চাবুক মেরে জাগাতে হয়—ওঠ ছুঁড়ী তোর বিয়ে। কনিষ্ঠা কিশোরীর বিবাহ-বোধই আসে নি। তাই তাকেও বলতে হয় একই কথা—ওঠ ছুঁড়ী তোর বিয়ে। তবে তার ক্ষেত্রে কুঁড়িকে টেনে হিঁচড়ে ফোটানোর চেষ্টা। কামিনীর ক্ষেত্রে কিন্তু প্রবাদটি পূর্ণ নয়, আংশিকভাবে প্রযোজ্য। এতকাল সে দেখে এসেছে দিদিদেরই বিয়ে হয় নি। তাই তার প্রসংগ তো আসেই না? সে ঘুমিয়ে ছিল মনের দিক থেকে। এবার হঠাৎই খুশির মেজাজে বলতে হয় নিজকে—ওঠ ছুঁড়ী তোর বিয়ে। একদিনের কথাতেই বিয়ে। মনটাকে চাঙা করে তুলতে হবে তো!

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ইছামতী' উপন্যাসে মোল্লাহাটি নীলকুঠির দেওয়ান রাজারাম রায়। তার তিন বোন তিলু বিলু নিলু। বয়স যথাক্রমে ৩০, ২৭, ২৫। বিয়ে ঠিক হয়েছে পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক ভবানী বাড়ুজ্জের সংগে তিনজনেই।

'অনেক রাত্রে তিলোত্তমা কথাটা শুনলে। ছোট বোন বিলুকে ডেকে বললে —ও বিলু, বৌদি তোকে কিছু বলেছে?

—বলবে না কেন? বিয়ের কথা তো?

—আ মরণ, পোড়ার মুখ, লজ্জা করে না?

—লজ্জা কি? ধিঙ্গি হয়ে বসে থাকা খুব মানের কাজ ছিল বুঝি?

—তিন জনকেই একই ক্ষুরে মাথা মুড়ুতে হবে, তা শুনেচ তো?

—সব জানি।

—রাজি?

—সত্যি কথা যদি বলতে হয়, তবে আমার কথা এই যে, হয় তো হয়ে যাক।

—আমারও তাই মত। নিলুর মতটা কাল নিতে হবে।

—সে আবার কি বলবে, ছেলেমানুষ, আমরা যা করবো সেও তাতে মত দেবেই।

তিলু কত রাত পর্যন্ত ছাদে বসে ভাবলে। ত্রিশ বছর তার বয়স হয়েছে। স্বামীর মুখ দেখা ছিল অস্বপনের স্বপন। এখনো বিশ্বাস হয় না। সত্যিই তার বিয়ে হবে? স্বামীর ঘর সে যাবে? বোনেদের সঙ্গে, তাই কি? ঘরে ঘরে তো এমন হচ্ছে। চন্দ্রকাকার বাপের সতেরোটা বিয়ে ছিল। কুলীন ঘরে অমন হয়েই থাকে। বিয়ের দিন কবে ঠিক করেছে দাদা কে জানে। বরের বয়স পঞ্চাশ তাই কি, সে নিজে কি আর খুকি আছে এখন।'

বিয়ের রঙীন কল্পনা যে বয়সে আসে, তা কবে পেরিয়ে গেছে তিন জনেরই। মন ঘুমিয়ে পড়েছে কুলীনকুল সর্বস্ব-র জাহ্নবীর মত। তিনজনেই হঠাৎ নিজেদের ঘুমিয়ে পড়া মনকে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে বলছে—ওঠ ছুঁড়ী তোর বিয়ে।

৪

'কুলীনকুল সর্বস্ব' ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ১৮৫৩তে লেখা। কৌলীন্য এবং পুরুষের বহুবিবাহ প্রথা তখন উচ্চবর্ণের হিন্দুসমাজে এমনভাবে চেপে অছে যে, জাহ্নবী, শাম্ভবী, কামিনী এরা কেউই সপত্নী-জ্বালার কথা ভাবে না। যেহেতু তারা কুলীন কন্যা, তাই শ্বাস-প্রশ্বাসের মতই সহজ করে দেখে সপত্নী-প্রসঙ্গকে। বিয়েই হয় না, তার আবার সপত্নী-চিন্তা! সতীনের সঙ্গে ঘর করতে হবে (তা-ও সব সময় কাপালে জুটতো না পথের পাঁচালীর ইন্দির ঠাকরুণের মত)। এটা জেনেই কেমন করে নিজের অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে সে ক্ষেত্রে, তার সুন্দর রেখা-চিত্র এঁকেছেন দীনবন্ধু মিত্র তাঁর 'জামাই বারিক'-এ।—

দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে দেখি, পদ্মলোচন শরীরের বাঁ দিকটা তেল-মাখানো অবস্থায় বসে আছে। কামিনীর স্বামী, জামাই বারিকের অন্যতম অধিবাসী অভয়কুমার ঢুকেই জিজ্ঞেস করছে—'কি দাদা হরগৌরী হয়ে বসে রয়েছ যে—অর্দ্ধেক অঙ্গে তেল দিয়েচ; অর্দ্ধেক অঙ্গ রুক্ষ রেখেচ।'

পদ্মলোচন—আমার পক্ষাঘাত হয়েছে; দুই সতীনে শরীরটে ভাগ করে

নিয়েচে ;—ডানদিকটা বড় আবাগীর, বাঁ দিকটে ছোট আবাগীর। ছোট আবাগী এতক্ষণ মাথাচ্ছিল ; চুলচেরা ভাগ, বাঁ অঙ্গে মাখিয়েছে, ডান অঙ্গ পড়ে রয়েচে,—দেখ না, ডানদিকে তেলের দাগটি লাগেনি, বড় আবাগী আসে, ডান দিকে তেল পড়বে, নৈলে এই রূপেই বসে থাকতে হবে।'

এমনি ভাগাভাগির মধ্যদিয়েই সে যুগের সতীনরা স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় অভ্যস্ত। সে অধিকারের অভ্যাসের রূপ কি, কৌতূহলী পাঠক আলোচ্য নাটকের পুরো দ্বিতীয় অঙ্কটি দেখে নিলেই বুঝতে পারবেন।

১৯৫০-এ অর্থাৎ কুলীনকুল সর্বস্ব লেখার প্রায় ১০০ বছর পরে বিভূতি ভূষণ যখন ইছামতী উপন্যাসে একই সমস্যার উপরে লিখতে বসলেন, তখন কৌলীন্য এবং বহুবিবাহ প্রথা উচ্চবর্ণের সমাজ থেকে এক রকম উঠেই গেছে। তাই তাঁর নায়িকা তিলোত্তমা বা তিলু সপত্নী প্রসঙ্গকে গুরুত্ব দিয়ে বলছে— তিন জনকেই এক ক্ষুরে মাথা মুড়ুতে হবে, তা শুনেচ তো ? ছাদে বসে ভাবছে— 'স্বামীর ঘর সে যাবে ? বোনেদের সঙ্গে, তাই কি ? ঘরে ঘরে এমন তো হচ্ছে। চন্দ্রকাকার বাপের সতেরোটা বিয়ে ছিল। কুলীন ঘরে এমন হয়েই থাকে' (সমকালের কোনো উল্লেখ তিলু অর্থাৎ বিভূতিভূষণ করেন নি।) এই সান্ত্বনা দিয়ে নিজেকে সে যেন বলতে চাইছে—ওঠ ছুঁড়ী তোর বিয়ে।

৫

পৃথিবীর অন্যান্য পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় যেমন, ভারতবর্ষে বিশেষ করে বঙ্গদেশেও রমণীকুল তেমনি অধিকারহীন, সম্পত্তিহীন, পুত্রোৎপাদক জীব, সংসারের ভারবাহী দাসী। যৌবনধর্ম যে তার মধ্যে সুন্দরের স্বপ্ন-কল্পনা সৃষ্টি করতে পারে, সে-ও যে মানুষের মত স্বামী-পুত্র নিয়ে বাঁচবার অধিকারী, এটা মধ্যযুগীয় বঙ্গদেশ তথা ভারত স্বীকার করেনি। তাই পুরুষের খেয়াল-খুশিতে, স্বার্থান্ধ পুরুষের খেয়াল-খুশিতে সামাজিক আচার আচরণ, বিধিনিষেধ নিয়ন্ত্রিত ! পুরুষ-শাসিত সমাজ-ব্যবস্থায় নারী-সমাজের উপর চার দিকে গড়ে তোলা বেড়া-জালে যাতে কোনো ফাঁক-ফোকর না থাকতে পারে, তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা স্মৃতি-শাস্ত্রাচারের ছাপ মেরে সুদৃঢ় করে তুলেছে পুরোহিত সম্প্রদায়। মূলত স্মৃতির যুগেই এই অভিশপ্ত প্রথার জন্ম। শ্রুতি বা তৎপূর্ববর্তী বৈদিক সমাজে বাল্য-বিবাহের কোন চিত্র চোখে পড়েনি। শ্রুতি থেকে স্মৃতির মধ্যবর্তী কালের যুগেও এর রূপ আছে বলে জানা নেই।

স্মৃতির যুগে স্তনদ্বয় বিকাশের পূর্বেই, ঋতুমতী হবার আগেই, অর্থাৎ সন্তান ধারণ এবং প্রতিপালনের জৈব-মানসিক ক্ষমতা আসবার আগেই পুরুষের ইচ্ছা এবং কামনা চরিতার্থ করার জন্য তাকে বলা হলো—ওঠ ছুঁড়ি তোর বিয়ে। দ্বিতীয় পর্যায়ে কৌলীন্য প্রথার প্রবর্তনে বিবাহের স্মৃতি-নির্দিষ্ট বয়স পেরিয়ে যাবার পরে, পিতা বা ভ্রাতা বা অভিভাবকের মান-সম্ভ্রম রক্ষা করার জন্যই কেবল, ঘাটের মড়ার গলায় বিগত-যৌবনা অথবা শিশু-কন্যাকে ঝুলিয়ে দেবার ফতোয়া জারি—ওঠ ছুঁড়ী তোর বিয়ে। তৃতীয়ত, কৌলীন্য প্রথারই অন্যতম অভিশাপ (যদিও রাজা বাদশাদের মধ্যে চিরকালই এ প্রথা ছিল। কিন্তু সার্বিক সমাজ-চিত্রে নয়, যা থেকে প্রবাদের জন্ম হতে পারে) পুরুষের বহুবিবাহ। এর ফলে সপত্নী বিদ্বেষের জ্বালা নারীকে সহ্য করতেই হবে। এই সমাজ-লিপিকে মেনে নিয়ে নারী নিজেকে বলেছে—ওঠ ছুঁড়ী তোর বিয়ে!

সমাজ চিত্রের এইসব দিক আজ প্রায় মুছে গেছে। তবু আলোচ্য প্রবাদটি অতীত যুগের সেই সব শিলীভূত সাক্ষীদের বহন করে নতুনতর অনুষঙ্গে প্রযুক্ত হচ্ছে।

ছমণ্ডী বা ছেমণ্ডী থেকে ছুঁড়ী শব্দের জন্ম। অর্থ নব-যুবতী এবং অনাথা। সত্যি কথা বলতে কি, আজও বাংলার নারীকুল (শহরের অত্যন্ত মুষ্টিমেয় কয়েক জনকে বাদ দিয়ে) ছুঁড়ী বা ছমণ্ডী বা ছেমণ্ডী। তদের আশৈশব এমন শিক্ষা আজও দেওয়া হয়, যাতে তারা নিজেদের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে মাথা না ঘামিয়ে, পিতৃ-পরিবারের তুলনায় সমাজের উচ্চতর শ্রেণীতে 'বিবি' হয়ে জীবন কাটিয়ে দেবার চিন্তা করে, বিলাস ব্যসনের মধ্য দিয়ে। আর নিম্নবিত্ত পরিবারে (দারিদ্র্য সীমার নীচে যারা) সে চিন্তার অবকাশ নেই। সেখানে আজও তাদের জীবন তথাকথিত বিধিলিপি নির্দিষ্ট। এই নির্দেশে অর্থনৈতিক, সংস্কারগত বা আরও নানাবিধ সমস্যা-জর্জর প্রাক্-বিবাহিত বাল্য (আজও গ্রাম-ভারতে অতি-বাল্য বিবাহ অপ্রতিহত গতিতে চলেছে, রাষ্ট্রীয় আইনকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে) কালে শোনে—ওঠ ছুঁড়ী তোর বিয়ে।

বাঙালীর জাতীয় উৎসব দুর্গাপূজার প্রাক্কালে যে কন্যা আগমনী গানে আদরের আদরিণী উমা (যামালতন্ত্রের মতে ছয় বছরের মেয়ে। তার বিয়ে হয়েছে। বৎসরান্তে বাপের বাড়িতে আসার দুর্লভ অধিকার তিন দিনের জন্য পেয়েছে। চতুর্থ দিনের ভোরেই 'সিদ্ধিতে নিপুণ' পতিদেবতা এসে উপস্থিত

নিয়ে যাবার জন্য। কৈলাস যে ছয় বৎসর বয়স্কা গৃহিনীর অভাবে অন্ধকার।)" যে চিরদিনের কাব্য-গাথায় খুকুমণি (আগমনী-বিজয়ার গানে বাঙালীর প্রাণ কাঁদে। কিন্তু সে কান্নার কারণ কি কন্যার দুঃখে সহমর্মিতা না ভাবাবেগ?), সেই আদরিণী খুকুমণিকে যখন সমাজ-দৃষ্টিতে 'ছুঁড়ী' সম্বোধনে গলার কাঁটার মত করে দেখা হয়, তখন তার চেয়ে বেদনাদায়ক আর কী হতে পারে? মাঝে মাঝে পুরুষ-শাসিত এই সমাজকে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা হয়—সত্যিই কি উমা আদরিণী? না অতীত যুগ-সংস্কারের বশবর্তী থেকেও আদরের অভিনয় করে চলেছি আমরা?

ওঠ ছুঁড়ী তোর বিয়ে, যার উৎস স্মৃতি-নির্দিষ্ট মধ্যযুগীয় সমাজ-ব্যবস্থা, এর মত খুব কম প্রবাদই আছে, যার মধ্যে লুকিয়ে আছে এত বেদনা, এত যন্ত্রণা, সমাজ-চিত্রের এত কলঙ্কিত অধ্যায়। নারীর বেদনা এবং সমাজ-সভ্যতার হলাহলকে কণ্ঠে ধারণ করে 'ওঠ ছুঁড়ী তোর বিয়ে' তাই নীলকণ্ঠ-প্রবাদ।

পটল তোলা

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিপিনের সংসার' পড়ছিলাম। পড়তে পড়তে একাদশ পরিচ্ছেদের পঞ্চম খণ্ডের কয়েকটি সংলাপ হঠাৎ মনটাকে নাড়া দিল। অংশটি এইরকম।—

হঠাৎ শান্তি একটি ভারি ছেলেমানুষি প্রশ্ন করিল।

—আচ্ছা, পটলের ক্ষেতে মেয়েমানুষ যাওয়া বারণ কেন জানেন?

—তা তো জানি না শান্তি। তবে শুনেছি বটে—

বিপিন কারণটা খুব ভাল রকমই জানে, সে পাড়াগাঁয়েরই ছেলে।

কিন্তু শান্তির সামনে সেকথা বলিতে তাহার বাঁধিল! শান্তি দুষ্টুমির হাসি হাসিয়া বলিল, আমি জানি। বলবো? মেয়েমানুষ অযাত্রা, পটলের ক্ষেতে ঢুকলে পটল ফলবে না—তাই নয়?

পটল অথবা সব্জীর ক্ষেতে মেয়েরা ঢুকলে পটল বা সব্জী ফলবে না।

এই সংস্কার গ্রাম-বাংলা তথা গ্রাম-ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে আছে। যেমন আছে পৃথিবীর বিভিন্ন,—প্রায় সবদেশের মেয়েদের ঋতুরজকে কেন্দ্র করে বিচিত্র সংস্কার এবং আচরণ। আর. এস্. র‍্যাটরে তাঁর 'বাঘিনীকন্যা' (Leapard Pristess) বইতে বলেছেন যে আফ্রিকার 'চিতা-গোষ্ঠী'-র মেয়েদের প্রথম ঋতু-দর্শনের সমকালে সতীচ্ছদ (hymen) বিদারণের একটি অনুষ্ঠান নাপিতরা করে। সেটা হয় মোটামুটি ভাবে নব-যৌবন প্রাপ্ত কন্যার বিবাহের প্রাক্-মুহূর্তে। সে যে বিবাহের পূর্বেই অন্য কোনো পুরুষের সঙ্গে যৌন-সংসর্গে আসে নি, তা প্রমাণ করে নাপিত 'ছেদন' অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। এই অনুষ্ঠান এত বেদনা দায়ক যে, অনেক সময় তা মেয়েদের ক্ষেত্রে প্রাণঘাতী হয়ে ওঠে। আজও, এই অনুষ্ঠান শুধু আফ্রিকাতেই নয় ইউরোপেও হয়। বিগত ২৮. ৪. ৮৩ তারিখে 'আজকাল' পত্রিকায় ৫ / ১·২ পৃষ্ঠায় এই প্রসঙ্গে যে সংবাদ প্রকাশিত

হয়েছিল তা এখানে তুলে দিচ্ছি।

লন্ডন ২৭ এপ্রিল—মেয়েদের ছুন্নত করার জন্যে যে সব ডাক্তাররা অস্ত্রোপচার করেন, ব্রিটিশ সরকার তাদের সাবধান করে দিয়েছেন। সরকারের চীফ ল অফিসার বলেছেন, যদি ছুন্নত করতে গিয়ে কোন মেয়ের মৃত্যু ঘটে তবে ঐ ডাক্তারকে হত্যার অভিযোগে, শাস্তি দেওয়া হবে। হাউস অফ লর্ডসে এ কথা জানিয়া লর্ড হেলশাম বলেন, অস্ত্রোপচারটি যদি সম্পূর্ণ চিকিৎসার প্রয়োজনে না হয় এবং রোগীর যদি মৃত্যু হয় তবে দায়ী ডাক্তারকে খুনের দায়ে হাজত বাস করতে হবে।—রয়টার।

ছুন্নৎ জননাঙ্গে অস্ত্রোপচার। স্ত্রী-অঙ্গে অস্ত্রোপচার অনেক সময়ই মেয়েদের পটল তুলতে বাধ্য করে। এমন একটি ঘটনা ঘটেছে প্যারিসে ১৯৮২ খ্রীষ্টাব্দে।

প্যারিস জুলাই ২৩ (এ. পি) 'তিন মাসের একটি শিশু কন্যার স্ত্রী-অঙ্গে ধর্মীয় আনুষ্ঠানিক অস্ত্রোপচারের ফলে সেখান থেকে প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়। মেয়েটি মারা যায়। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে দাবী উঠেছে, 'ফরাসীদেশে এই অনুষ্ঠান বে-আইনী ঘোষিত হোক।' সংবাদদাতা আরও জানাচ্ছেন, এই ধরণের স্ত্রী-অঙ্গে ছুন্নৎ আফ্রিকার বহু অঞ্চলে আজও আছে। এই অনুষ্ঠানে 'ক্লিটরিস' কেটে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়। মৃত শিশুটির পিতামাতাও আফ্রিকার 'মালি' অঞ্চল থেকে এখানে এসেছে।

আফ্রিকার যে বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে স্ত্রী-অঙ্গে অস্ত্রোপচার সংস্কৃতির অন্তর্গত, তারই অন্তর্গত পূর্বোল্লিখিত ঐতিহ্যের 'চিতা-গোষ্ঠী'। এদের মেয়েদের ক্ষেত্রেও বিভূতিভূষণ-কথিত সব্জীক্ষেতে মেয়েদের প্রবেশ সম্পর্কিত বিধি নিষেধ আছে। আমাদের দেশে 'পটল', ও দেশে 'কুমড়ো'। ওদেশে 'ছেদন' অনুষ্ঠানের আগে মেয়েদের কুমড়ো ক্ষেতে প্রবেশ ফসলের পক্ষে অকল্যাণকর—এ-ই বিশ্বাস।

প্রসঙ্গটি এই জন্য উত্থাপিত হলো যে, নৃতত্ত্ববিদ্‌রা বলেন—ভারতের আদি অধিবাসীরা ছিলেন নিগ্রোবাটু। সেই তখন থেকেই কি ওদেশের কুমড়ো আমাদের দেশের পটলে রূপান্তরিত হয়ে বাংলায় 'পটল তোলা' মানে মৃত্যু (গাছ বা ফসলের) এই প্রবাদের সূচনা? পরে গাছ থেকে মানুষের মৃত্যুতে রূপান্তরিত?

আরও একটি কথা, যদিও কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক তবু, বলার ইচ্ছাকে দমন করতে পারছি না। পুরুষাঙ্গ-সংস্কার ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের অবশ্য কর্তব্য। আফ্রিকায়

স্ত্রী-অঙ্গ সংস্কারের বিধি আজও প্রচলিত। আফ্রিকার অধিবাসী যারা ইংলন্ড, ফ্রান্স (উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে) বা ইউরোপ আমেরিকা বা পৃথিবীর অন্যান্য দেশে গেছেন তারা এই সংস্কারকে ধরে রেখেছেন। 'বাঘিনী কন্যা' বইতে দেখি এই অনুষ্ঠান করেন সেখানকার নাপিতরা মূলত। অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মূলত প্রমাণ করা হয়, প্রাক্-বিবাহিত জীবনে মেয়েটি অন্য কোনো পুরুষের সঙ্গে দৈহিক মিলন ঘটিয়েছিল কিনা অর্থাৎ প্রচলিত অর্থে সতী কিনা। আমাদের দেশেও মেয়েদের সতীত্ব সম্বন্ধে একই ধারণা। প্রাক্-বিবাহিত জীবনে সতীচ্ছদ (এটি এত পাতলা চামড়ার আবরণ যে অন্য-সংসর্গ ছাড়াই অতি সহজে বিদীর্ণ হয়ে যেতে পারে) বিদারিত কিনা অর্থাৎ সে মেয়ে সতী কিনা এটা প্রমাণের ভার ছিল নাপিতের উপর সম্ভবত। তাই তাকে বলা হয় প্রমাণকারী বা প্রামাণিক।

আজও প্রাচীন রীতি যারা মেনে চলেন তাদের ক্ষেত্রে বিবাহ-অনুষ্ঠানে নাপিত বা প্রামাণিকের গৌরীবচন পাঠ অপরিহার্য। তার একটিতে আছে ঃ

শুন সবে এবে আমি করি নিবেদন।
ছাদনাতলায় বর এসেছে বৃষভ বাহন॥
মন্দলোকে থাক যদি যাও সরে যাও।
ছাউনি নাড়ার সময় হ'ল এয়োরা দাঁড়াও॥

নাপিতের উক্তিতে পরিষ্কার বলা হয়েছে "ছাউনি নাড়া।" এ কোন ছাউনি বা আচ্ছাদন? আজকাল নাপিত গৌরী বচন পড়েন কিন্তু কোনো ছাউনি বা আচ্ছাদন নাড়েন না। এককালে যে বরের সামনেই কনের স্ত্রী-অঙ্গের আচ্ছাদন নাড়ার অর্থাৎ সতীত্ব প্রমাণ করার রীতি ছিল তার ভগ্নাবশেষ এই ছড়ায় এখনও ছিটিয়ে ছড়িয়ে আছে। যেহেতু এটা আরও বিস্তৃত ও ব্যাপক আলোচনা এবং ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের বিষয়, তাই এখানেই থেমে গিয়ে শুধু বলি আফ্রিকার স্ত্রী-অঙ্গে অস্ত্রোপচার বিধি এককালে আমাদের দেশেও ছিল সুদূর অতীতে। এ যুগেও সতীচ্ছদ বিদারণের কাজ চলে 'গৌরীগরন' (গড়ন) অনুষ্ঠানে (শ্রদ্ধেয় নন্দগোপাল সেনগুপ্তের 'সমাজ সমীক্ষা ঃ অপরাধ ও অনাচরে'-দ্রষ্টব্য)।

যা-ই হোক 'পটলতোলা' এই প্রবাদের সঙ্গে পটল নামীয় সব্জীর কোনো যোগাযোগ আছে বলে মনে হয় না। তাছাড়া এই জাতীয় চিন্তার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় অন্তরায় 'পটল' এবং 'তোলা' এই দু'টি শব্দই। পটল নামীয় সব্জীটির বানান কিন্তু পটল নয়। ওটি পটোল। এটি সংস্কৃত ভাষায়

ব্যবহৃত শব্দ। বাংলায় সব্জী অর্থে পটল ভুল বানানে লেখা হয়। দ্বিতীয়ত, তোলার সংগে, যে তোলে তার মৃত্যুর কোনো সংস্কার বর্তমান-প্রসংগে নেই। নষ্ট হয়, মৃত্যু ঘটে ফসলটির—এটাই সংস্কার-বশবর্তী ধারণা। তৃতীয়ত, শব্দটির নারীর যৌবন-সংকেতের সংগে যুক্ত। সামগ্রিকভাবে নারী-জীবন বা তার আচরণের নয়। যদিও বিভূতিভূষণের সৃষ্টি উল্লিখিত শান্তি-নামীয় মেয়েটি বলেছে, মেয়েদের পটল ক্ষেতে ঢুকতে নেই, তবু, যৌবনবতী এই বিশেষণটি অনুচ্চারিত। সাহিত্যিকরা শালীনতা-বোধের বশে শ্লীলতা রক্ষার জন্য সামাজিক সংস্কারের এমন অনেক অংশ বা শব্দ অনুল্লিখিত রাখেন, যা সমাজ-বিজ্ঞানীর কাছে সমস্যা সমাধানের গুরুত্বপূর্ণ সংকেত বা যোগসূত্র হতে পারতো।

এত দূর আলোচনার মধ্য দিয়ে যে ধারণা জন্মায় তাতে মনে হয় উক্তনামীয় সব্জীটির সংগে আলোচ্য প্রবাদ সম্পর্কশূন্য। তাই এবার পটোল নয়, পটল শব্দটির আর কোনো অর্থে ব্যবহার আছে কিনা, এটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ কি, সেদিকে চোখ ফেরানো যেতে পারে। তার আগে বাংগালা ভাষার অভিধান প্রবাদটির যে একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন সেটিকে একবার দেখে নিই। অভিধানে বলা হয়েছে, পটল তুলিলে গাছ মরিয়া যায়, লক্ষণায় পটল তোলা। এই মন্তব্য সম্বন্ধে আমাদের প্রথম জিজ্ঞাসা, পটোল বা পলতা গাছের ফল তুললে অর্থাৎ তোলার কারণে গাছ মরে যায়, এমন কথা কখনও শুনিনি বা চোখেও দেখিনি। তা যদি হতো, তবে কেবল পটোল নয়, এই জাতীয় যে কোনো লতানো গাছ থেকে একটিই মাত্র ফল পেতাম আমরা। শ্রীদাস যা বলেছেন, পটোল তুললেই যদি গাছ মরতো তাহলে প্রথম ফসলটি তুলে নেওয়া মাত্রই গাছটি পটল তুলতো। বাস্তবে কিন্তু তা হয় না। লতা জাতীয়, এখানে বিশেষ করে সব্জী জাতীয় লতা, দীর্ঘজীবী হয় না সাধারণত। বছরের একটি বিশেষ ঋতুতে এদের জন্ম ; পত্রপল্লবে ফুলে ফলে সুশোভিত হয়ে বেঁচে থাকে, ফসল দেয় সেই ঋতুর আবহাওয়া পরিবেশ যতদিন পর্যন্ত না নিঃশেষিত হয়ে যায়। এই দিক থেকে এই জাতীয় লতা বা গাছগুলির আয়ুষ্কাল সীমিত প্রাকৃতিক নিয়মেই। একদিকে আবহাওয়া-পরিমণ্ডলের পরিবর্তন, অন্যদিকে বার্ধক্যজনিত জরাক্রান্ত দেহ। এই অবস্থায়, বিরুদ্ধ পরিবেশে গাছগুলি শুকোতে থাকে। তখনও কিন্তু তাতে ফুল ফল থাকে (আগে কিন্তু তা থেকে চাষী বহু ফসল তুলে নিয়েছেন)।

মাঠে আবার নতুন ফসল বোনার সময় এসে যায়। চাষীরা তখন পুরোনো

গাছগুলি থেকে ব্যবহারের উপযোগী ফসল তুলে নিয়ে গাছকে উপড়ে ফেলে দেন। গাছের এই মৃত্যু বার্ধক্য-সম্ভব। তোলার জন্য নয়। শ্রীদাস হয়তো তাঁর জীবৎকালে জরাজীর্ণ গাছ থেকে কোনো কৃষককে পটোল তুলতে দেখেছিলেন। উচ্ছে, করলা, ঝিঙে, ধুধুল, তরমুজ, ফুটি, লংকা, ঢ্যাঁড়স, পটোল জাতীয় সব গাছ সম্বন্ধেই একথা প্রযোজ্য। এই সমস্ত লতা বা গাছই সারাটি ঋতু ধরে প্রচুর ফসল দেয়। কৃষকরাও প্রয়োজন মত ১।২।৩ দিন অন্তর একই গাছ থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণে ফসল তোলেন। একাজ চলে যতদিন পর্যন্ত না গাছ বুড়ো হয়। শ্রীদাসের বোধহয় এই প্রত্যক্ষ-অভিজ্ঞতা ছিল না। অথবা লিখবার সময় পটোল, এই সব্জীই পটল তোলা প্রবাদটির উৎসে আছে, এমন ধারণা বদ্ধমূল ছিল। অথবা এমনও হতে পারে যে প্রবাদটির উৎস সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা ছিলনা বা গভীরে চিন্তা করতে চাননি বলেই হয়তো উপরি উক্ত মন্তব্য করেছেন।

এই প্রসঙ্গেই মনে রাখা দরকার যে এই জাতীয় 'সব্জীর লতা বা গাছের সঙ্গে কলা, ধান প্রভৃতি ওষধির পার্থক্য আছে সামান্য পরিমানে। কলা জাতীয় ওষধির ফল পেকে গেলে গাছ মরে যায়। এই জাতীয় গাছ বা লতার এককালে একগুচ্ছ ফল বা ফসল একই সঙ্গে পাকে (যদিও একেবারে শেষের দিকের ফল সম্পূর্ণ পুষ্ট হয় না)। ইতিমধ্যে গাছের জীবনীশক্তিও নিঃশেষিত হয়ে যায়। গাছ মরে। গাছের মৃত্যুর অব্যবহিত আগেই ফসল সহ গাছকে (ধান বা কলা জাতীয়) কেটে ফেলা হয়। তার কারণ কলা পেকে পচে, পাখিরা ঠুকরে খায়। বিবিধ ধান্য মাটিতে ঝরে পড়ে। সব্জীলতা বা গাছের সঙ্গে এদের পার্থক্য মূলত এখানেই। এই যুক্তি এবং প্রত্যক্ষ সত্যের ভিত্তিতে আলোচ্য প্রবাদ সম্পর্কে শ্রীদাসের উল্লিখিত মন্তব্য গ্রহণযোগ্য বলে মানতে কুণ্ঠা হয়। মনে রাখা দরকার যে, কাঁচা অবস্থায় থাকা এই সব ওষধির দু'চারটে ফসল ছিঁড়ে নিলে কিন্তু গাছ মরে না।

কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক হবে হয়তো। তবু এই প্রসঙ্গে আমার একটি বাল্য-স্মৃতির চিত্র এখানে আঁকছি। লোভ সম্বরণ করতে পারছি না।

ব্যাঙ্কে টাকা রাখা বা সেখান থেকে টাকা ধার নেওয়ার প্রবণতা আমাদের দেশে অতি সাম্প্রতিক কালে দেখা দিয়েছে। ব্যাঙ্কের স্থায়িত্ব বা সেখান থেকে প্রয়োজনে ধার পাওয়া যখন নিশ্চিত ছিল না, তখন সাধারণ মানুষ মহাজনের

(সত্যি ! মহাজন ব্যক্তি ছিলেন এঁরা !) কাছ থেকে টাকা ধার নিতো। আমাদের শৈশব, বাল্য, কিছুটা কৈশোরের এ-ই ছিল সাধারণ চিত্র—সমাজের। শরৎচন্দ্রের একাধিক (অন্যান্যদেরও) লেখায় এ বিষয়ের নিখুঁত চিত্র ধরা আছে। লিখেছেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও।

এমনি এক মহাজনের (!) সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্য (!) হয়েছিল আমার। তিনি এক খাতকের বাড়িতে ঢুকলেন। বাড়ি বলতে দুখানা উলুখড়ের ছোট্ট চালাঘরের সামনে উঠোন নামীয় একফালি খালি জমি। ঘর দু'টির একটিতে কেনো মতে বেড়া ও চালা টিকে আছে। অন্য ঘরখানা একটা শতচ্ছিন্ন পাগড়ী অর্থাৎ পচে যাওয়া খড়ের ভাঙা চালা মাথায় নিয়ে সম্পূর্ণ দিগম্বর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে পদ্মার উন্মুক্ত পাড়ে। বাড়ি না বলে প্রায় পোড়ো ভিটে বলাই ভাল।

শীত আগতপ্রায়। অগ্রহায়ণের মাঝামাঝি। ভিটের উঠোনে এক জরাজীর্ণ বৃদ্ধ একখানা নেংটি-প্রায় লুঙি জড়িয়ে লজ্জা নিবারণের ব্যর্থ প্রয়াস করে বসে। বুড়ো অন্ধ। উঠোনের এক পাশে শুকনো খেজুর ডালা দিয়ে তৈরী করা আব্রুর পেছনে ঢেঁকিতে পাড় দেওয়ার শব্দ হচ্ছে।

মহাজন বাইরে থেকে হাঁক দিলেন—মাইনদ্দি বাড়ি আছ ? বৃদ্ধের উত্তর—আসেন কর্তা। মহাজন উঠোনে উঠলেন। ছেড়া শতচ্ছিন্ন খেজুর পাতার মাদুর নামীয় একখানা বস্তুতে মাইনদ্দি ব'সে। সে হাঁক দিলো—আমিনা লো কর্তায় এয়েছে। বসবার কিছু একটা দিয়ে যা।

ওপাশ থেকে কোনো উত্তর নেই। দু'তিন বার হাঁকের পর একটি ১৫ / ১৬ বছরের তরুণী বেরিয়ে এলো। পরণে কাপড়ের পরিবর্তে কোমরে আর বুকে জড়ানো মাইনদ্দির বসে থাকা পাটিরই একটি অংশ বিশেষ বলে মনে হলো। তাতে উদ্ধত পীনদ্ধ যৌবন ঢাকা পড়ে না। এক টুকরো মাদুর ছুঁড়ে দিয়ে সে পালিয়ে গেল।

মহাজনের মহাজনী প্রশ্ন—'মাইনদ্দি, টাকা ক'টা আর দিলে না ?

—দেবো কর্তা, দেবো। আপনার টাকা মারবো না।

মাইনদ্দি তার দুঃখের গান গাইতে শুরু করলো।—বৌ-টা মরে বেঁচে গেছে। আছে একটা ছেলে আর একটা মেয়ে। ছেলেটাকে পাঠিয়ে ছিল শহরে মোটর গাড়ির কাজ শিখতে। সেখানেই সাদী করে সংসার পেতেছে। বাপের দিকে ফিরেও তাকায় না। খোঁজও নেয় না। মেয়েটার বে' দিয়েছিল। জামাইটা

চোর। এখন জেলে। মেয়ে যথারীতি ফিরে এসেছে বাপের কাঁধে। জমিজমা, গরুবাছুর, হাঁস মুরগী ছাগল—কিছুই নেই। ভোর রাতে মেয়ে, কেটে নিয়ে যাওয়া ধানের ক্ষেতে গিয়ে দু'চার গাছি পড়ে থাকা ধানের শিস কুড়িয়ে নিয়ে এসেছে। ছাড়িয়ে সেই কাঁচা ধানই ভানবার চেষ্টা করছে এখন। হ'লে, সেই চাল-ক্ষুদ দিয়ে চারটি ফ্যান-ভাত করে মা-বেটিতে খাবে।

কাঁদুনি শোনবার সময় নেই কর্তার।—মাইনদি, খোদার কাছে গিয়ে কি জবাব দিহি করবে, মহাজনের ঋণ শোধ না করে ?

—দেবো কর্তা, খোদায় দিন দিলে আপনার ঋণ শোধ না করে মরবো না। কিস্তির সব টাকাই শোধ দেবো।

বেরিয়ে এলেন মহাজন। সঙ্গের তল্পি-বাহক জিজ্ঞেস করলো—কিস্তি কি কর্তা ? মহাজন তল্পি-বাহককে (অল্পবয়সী গরীব ছেলে ফাইভ-সিক্স্ পর্যন্ত পড়েছিল। পেটের দায়ে একাজে ঢুকলেও এসব কিছুই জানতো না তখন) বোঝাতে লাগলেন। আগে খাতকরা চড়া সুদে টাকা নিত। আর সে সুদ বাড়তো চক্রবৃদ্ধি হারে। তাই খাতকও পারতো না, মহাজনও আসলের জন্য চাপ দিত না। সুদও পুরোটা না দিতে পারলে তাগাদার বালাই নেই। ওটা তো চক্রবৃদ্ধি হারে পরের বছরই মুল টাকার অংশ হবে।

অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী শের-ই-বাংলা ফজলুল হক সাহেব আইন পাশ করলেন—কোনো খাতক যদি মহামান্য আদালতের দ্বারস্থ হয়; অথবা মহাজন যদি নালিশ করে বা এমনিতেই আইন পাশের পর, আগে লগ্নীকৃত টাকা চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়বে না। খাতকের সুবিধার্থে আদালতে আসার দিন পর্যন্ত সুদে আসলে টাকা যে অঙ্কে দাঁড়িয়েছে, তাই অত্যন্ত সহজ বাৎসরিক কিস্তিতে ঋণ গ্রহীতা শোধ করবে। তা আদালতের রায় অনুসারে যত বছরেই হো'ক না কেন ? ত্রিশ/চল্লিশও হতে পারে। দীর্ঘ-শ্বাস ফেললেন মহাজন—আগে লগ্নী কারবার ছিল বেগুন ক্ষেত, এখন তা হয়েছে মুলোর। তল্পি-বাহক বুঝলো না এই আলংকারিক অর্থ। কর্তা বোঝালেন, আগে লগ্নী টাকার আসল টাকাটা ছিল বেগুন গাছ। গাছ অর্থাৎ আসল টাকাটা ঠিকই থাকবে। সময় এগোনোর সঙ্গে সঙ্গ সুদ রুপী বেগুন তাতে ফলবে। মহাজন তা তুলে নেবে। আর এখন জনাব ফজলুল হকের কল্যাণে লগ্নী কারবার হয়েছে কিস্তির মুলো। যে কিস্তি-রুপী মুলোটা আদায় হলো সে স্থান আর পূরণ হবে না। নতুন সুদের ফসল ফলবে না।

কিস্তির অর্থ বুঝে নেবার পরই তল্পি-বাহক এমন এক প্রশ্ন করে বসলো যাকে ঔদ্ধত্য বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে।—আচ্ছা কর্তা, মাইনদ্দি কত টাকা ধার নিয়েছিল ?—দশ টাকা।—সুদ দিয়েছে কত ?—তা, প্রায় শ'খানেক টাকা হবে।—আসল দেয়নি তো ?—না।

দায়ে পড়ে তল্পি-বাহক হলেও সে নজরুলের কবিতার একটি চরণ সঙ্গে সঙ্গে মনে করতে পারলো—'জনগণে যারা জোঁকসম শোষে তারে মহাজন কয়।'

স্মৃতি-চিত্রটি আঁকলাম এইজন্য যে, বেগুন, পটোল এরা একই জাতীয় সব্জীর গাছ। ফল ছিঁড়লে গাছ মরে না! বা পটল তোলে না।

২

পাঠকের হয়তো মনে হতে পারে, অবান্তর প্রসঙ্গ কেন? তাই এবার আমরা আবার 'পটল তোলা'য় ফিরে যাই।

অভিধানের মতে পটল ক্লীব লিঙ্গ। ব্যুৎপত্তি পট্+অল (অলচ্)। অর্থ চালের ছাদ বা প্রান্ত। তৃণাদি বেষ্টিত ছাদ বা চাল। আচ্ছাদন। নেত্ররোগবিশেষ ছানি। চোখের পাতা। পেঁট্রা, বাক্স। পরিচ্ছদ। তিলক। সমূহ, রাশি, পুঞ্জ। পরিজন। গ্রন্থ-বিভাগ।

অভিধানে উল্লিখিত অর্থগুলিকে সংহত করলে একটাই বক্তব্য ধরা পড়ে—আবরণকারী স্তর বা সজ্জা। যেখানে পটল-এর অর্থ তিলক সেখানেও তিলকরূপী পটল তিলকধারী মানুষটির অন্য সমস্ত পরিচয়কে আবৃত ক'রে 'ভক্ত-বৈষ্ণব'-অংশটুকুকেই তুলে ধরে। রাশি, সমূহ, পুঞ্জ (যেমন ধনরাশি...) যখন বলি; তখনও কোন বস্তু বা বিষয় এই ধনের অন্তর্গত তা বোঝার উপায় নেই। প্রত্যেকটি ধনের আলাদা আলাদা সত্তা বা পরিচিতিকে 'রাশি' শব্দটি দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়।

পট্ ধাতুর অন্যতম অর্থ বেষ্টিত করা বা জড়িয়ে দেওয়া। অন্যদিকে পটল শব্দের অর্থ আচ্ছাদন। প্রাণী জগতের কথা আপাতত স্থগিত রেখে বৃক্ষ, বিশেষ করে তৃণ-গুল্মশ্রেণীর দিকে তাকানো যাক। এদের কান্ডের প্রতিটি অংশই কতগুলি অংশ বা গ্রন্থিতে বিভক্ত। এবং এই বিভাগ সম দূরত্বের। সম দূরত্বের এই গ্রন্থিগুলি থেকে বেরোয় একটি করে আবরণ-পত্র, যা সেই কান্ডটিকে আবৃত রাখে এবং শীর্ষদেশে একটি করে পাতা দেখা যায়। দূর্বা

থেকে শুরু করে ইক্ষু, কলা, নারকেল, সুপারি এমন কি পেঁয়াজ রসুন-জাতীয় সমস্ত গাছ সম্বন্ধেই একথা প্রযোজ্য। গুল্ম জাতীয় বৃক্ষের এই আবরণকে কি বলে? যেমন কলা বা সুপুরির এই আবরণের নাম পূর্ববঙ্গে (বর্তমান বাংলাদেশ) 'খোল' বা 'খোলা' হলেও পশ্চিমবঙ্গে একে 'পেটো' বলে। এগুলি আচ্ছাদন—পটল। পট্ ধাতুর অর্থ বেষ্টিত করা। পেটো পট্ ধাতু থেকে আবৃত করা অর্থেই এসেছে বলে মনে হয়। এই পেটো পট বা আবৃত করে। অন্যদিকে মানুষের জীবন-অভিজ্ঞতা তাকে শিখিয়েছে যে এগুলি (সুপুরির আপনিতেই) খুলে ফেলা যায় সহজে। তাই খোলা বা উন্মুক্ত করা অর্থে খোল/খোলা/ শব্দ দু'টির ব্যুৎপত্তি। এবং বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রসূত অর্থের সঙ্গে পটল (আচ্ছাদন) অর্থের সংগতি আছে। এ ছাড়া, পরবর্তী স্তরে পত্রের কাজ শ্বাস-প্রশ্বাস এবং গাছের জন্য খাদ্য সৃষ্টি হলেও কিসলয় স্তরে কিন্তু এই পাতাও পেটো বা পটল বা খোল-এর কাজ করে। উপপত্র সম্বন্ধেও একথা প্রযোজ্য।

কলা, পেঁয়াজ, রসুন জাতীয় গাছের ক্ষেত্রে ফুল আসবার আগে পর্যন্ত এই 'পোটো'র সমষ্টিকেই আমরা মূল বৃক্ষ-কান্ড বলে ভুল করি। এর প্রধান কারণ, এই পেটো বা পটলসমূহ এমনভাবে কান্ডটি থেকে বেরোয়, তাকে ঘিরে রাখে, আর নিজে পুষ্ট ও দীর্ঘাকৃতি হয় যে কান্ডটি মূলের কাছাকাছি মাটির প্রায় গায়েই সংলগ্ন থেকে যায় সব সময়। এই পটলগুলি কান্ডটিকে এমনভাবে এমনভাবে ঘিরে রাখে, যাতে বাইরের বিরুদ্ধ প্রকৃতি, বিশেষ করে প্রখর সূর্যতাপ, অতিবৃষ্টি, অত্যধিক শৈত্য একে নষ্ট করে বা মেরে ফেলতে না পারে।

এখন আমরা যদি কলা, পেঁয়াজ, রসুন বা ঐ জাতীয় গাছের পেটো বা খোল বা পটল বা আচ্ছাদনকে একে একে তুলে বা খুলে ফেলি, তাহলে, যাকে কলা, পেঁয়াজ বা রসুন গাছ বলছি, চিহ্নিত করছি, তার অস্তিত্বই থাকে না। অর্থাৎ সে মৃত।

এই জাতীয় গাছ ছাড়া অন্যগুলির ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। বড় গাছের প্রান্ত ভাগ যাকে ডগা বলি, সেটি কুঁড়ি অবস্থায় পত্র বা উপপত্র রূপ পটল বা পেটোতে আচ্ছাদিত। এই পটলগুচ্ছকে জোর করে তুলে ফেললেও গাছের সেই ডগাটি, ফুলটি, বা ফলের শৈশব-মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। চারা গাছ বা অংকুরিত বীজকে বপনের পর তাই পেটো বা খোল বা পটলে ঢেকে রাখতে হয়। অন্যথায় এদের

ক্ষেত্রেও মৃত্যু, অনুন্নত দেশের মানব শিশুর মৃত্যুর হারের সংগে সমানে তাল রেখে চলবে।

গাছের এই পটল বা পেটোর গঠন সম্বন্ধেও একই কথা। অন্যদিকে বৃক্ষ-জগতের মত প্রাণীর দেহও বহিশ্চর্ম, অন্তশ্চর্ম, মাংসপেশী, শিরা, উপশিরা, অস্থি, অস্থি-মজ্জা—পটলে পটলে সজ্জিত হয়ে গঠিত। বিভিন্ন পটলে গঠিত কোষে কোষে যে কর্মশক্তি তারই সম্মিলিত নাম প্রাণ বা প্রাণসত্তা। এবার যদি আমরা একটি একটি করে এই পটলগুলি তুলে নিতে থাকি তবে প্রাণীদেহের সংগে তার প্রাণেরও অস্তিত্ব থাকে না। উভয়েই পটল তুলবে।

বৃক্ষলতা, প্রাণীজগতের সকলেরই দেহ এবং প্রাণ পটলে পটলে বিভিন্নভাবে গঠিত ও বিন্যস্ত। আর এর প্রতি পটলে আছে প্রাণের অস্তিত্ব। এই দেহ এবং প্রাণকে বাঁচিয়ে রাখা, এদের ঘিরে আশা-আকাংক্ষা, কামনা বাসনা, সমাজ-সংস্কার সব কিছুকে সুস্থ এবং স্বাভাবিক-প্রকাশ আর বিকাশের স্বাভাবিক পথ দেবার ক্ষেত্রে অসীম অবদান এই পটল সমূহের। পটল তাই প্রাণ তথা জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংগ। আর সেই জন্যই তাকে তোলা বা তুলে ফেলা তথা ছিন্ন করার অর্থই মৃত্যু।

সব্জী,যাকে আমরা পটল বলি, তা পটোল। পটল নয়। যদিও পটোলের দেহও বিভিন্ন পটলে গঠিত। প্রশ্ন আসতে পারে পটল তোলা তো চলিত ভাষার প্রবাদ। পটল তো তৎসম এবং সাহিত্যিক ভাষার শব্দ। এ দিয়ে কি চলিত ভাষার প্রবাদ হয়? উত্তরে বলি, আমার কাছে আসে প্রায়শই, এমন এক মিস্ত্রি পরামর্শ অর্থে গবেষণা শব্দটি হামেশাই ব্যবহার করে। যদি বলি, এ বিষয়টা সম্বন্ধে তোমার মত কি? উত্তরে বলবে, 'একজনের সংগে গবেষণা করে বলবো।' আরও একটি কথা মনে রাখা দরকার। উচ্চতর সাহিত্য শব্দ সৃষ্টি করে না বা করে নি। শব্দগুলি এসেছে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিতার ভাষা, মুখের ভাষা থেকে। সাহিত্যিক তাঁর পরিশীলিত মনের মাধুরী মিশিয়ে সেই শব্দকে নতুনতর অনুষংগে ব্যবহার করেন। শব্দ নবতর অর্থবহ হয়ে ওঠে।

৩

দেহ এবং প্রাণ যে পটলে পটলে গঠিত এ সম্বন্ধে ধারণা মানুষের কবে হলো? উত্তর—শিকারী-জীবন থেকে। সভ্যতা বিকাশের সেই স্তরে, যখন মানুষ আগুনেরও ব্যবহার শেখেনি, কাঁচা মাংস খেতে অভ্যস্ত বাধ্য হয়েই,

তখন প্রথমাবস্থায় নিহত পশুর মাংস দাঁত দিয়ে ছিঁড়তে গিয়ে দেখে, মাংসখণ্ড ছেঁড়ে পরতে পরতে। এলোপাথারি কামড় দিলে তাকে ছেঁড়া বা ছোট করা যায় না। অথচ যাকে আমরা চলিত কথায় মাংসের আঁশ বলি সেই দিকে লক্ষ রেখে ছাড়ানো, ছোট করা, পাতলা করা সহজ। এই অভিজ্ঞতাই আমরা আখ-খাবার সময় কাজে লাগাই। সেই প্রথম যুগে খাদ্যকেন্দ্রিক অভিজ্ঞতাকে সম্বল করে সভ্যতা বিকাশের অগ্রবর্তী স্তরে সে তাকিয়েছে প্রকৃতির দিকে। সেখানেও দেখেছে একই চিত্র। তাইতো ভবভূতির উত্তররামচরিতম্-এর প্রথম অঙ্কে লক্ষ্মণের উক্তি ঃ অয়মবিরলানোকহনিবহনিরন্তর স্নিগ্ধনীলপরিসরারণ্যপরিণদ্ধ-গোদাবরীমুখকন্দরঃ সততমভিষ্যন্দমানমেঘদুরিতনীলিমা জনস্থানমধ্যগো গিরিঃ প্রস্রবণো নামা—এর অনুবাদে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় লেখেন—'এই সেই জনস্থান মধ্যবর্তী গিরি। ইহার শিখর' দেশ আকাশপথে সতত-সমীর-সঞ্চরমান-জলধর-পটল সংযোগে নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলংকৃত—অধিত্যকা প্রদেশ ঘনসন্নিবিষ্ট বন-পাদপ-সমূহে সমাচ্ছন্ন থাকাতে স্নিগ্ধ, শীতল ও রমনীয় ; পাদদেশে প্রসন্ন সলিলা গোদাবরী তরঙ্গ বিস্তার করিয়া...।' (বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ পথের পাঁচালী)। এখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন যে, বিদ্যাসাগর স্মারক জাতীয় সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত বিদ্যাসাগর রচনাসংগ্রহে 'জলধর-পটল'-এর পরিবর্তে আছে 'জলধরমণ্ডলীর'। উক্ত বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহে 'সীতার বনবাস'-এর বিজ্ঞাপনের তারিখ ১লা বৈশাখ। সংবৎ ১৯১৭। জানিনা এটি কোন সংস্করণের পাঠ। বিভূতিভূষণই বা কোন সংস্করণের পাঠ থেকে 'মণ্ডলী'র পরিবর্তে 'পটল' শব্দটি নিয়েছেন)।

মেঘও যে পটলে পটলে বিন্যস্ত তা আদিম যুগ থেকেই মানুষ দেখেছে। ভবভূতি এবং ঈশ্বরচন্দ্র সেই দেখাকেই ভাষায় রূপ দিয়েছেন। আমরা এ-ও জানি যে বিভিন্ন পটলে বা মন্ডলীতে বিন্যস্ত মেঘের অস্তিত্বও আর থাকবে না, যদি তার পটলকে তোলা বা বিচ্ছিন্ন করা যায়।

৪

জন্মের প্রথম মুহূর্ত থেকেই জীবন বিভিন্ন সম্ভাবনা, আশা-আকাংক্ষার পটলগুচ্ছ। এই পটলের সঞ্চয় এবং বিন্যাস মানব মনে ঘটে চলেছে সভ্যতার উষালগ্ন থেকে। চলবে ততদিন পর্যন্ত যতদিন পৃথিবীর বুকে মানুষ নামীয় প্রাণীর অস্তিত্ব থাকবে। যে কোনো যুগের, যে কোনো দেশের মানুষের

সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক পরিচয় জানতে হোলে, সেই পটলসমূহ যার স্বারা সে যুগ, সে দেশ আবৃত হয়ে নিজের দেহ-গঠন করেছে, তাকে জানতে এবং বুঝতে হবে। তা নইলে সেই দেখা বা বোঝবার চেষ্টা অন্ধের হস্তি-দর্শনের মত হবে।

যুগের ধারাকে অনুসরণ ক'রে বিভিন্ন চিন্তা-চেতনা, সংস্কার, কর্মকাণ্ডের পটল সমূহকে স্বাঙ্গীকৃত ক'রে বাঁচে মানুষ। পরবর্তী তথা পরিবর্তিত পরিস্থিতি, তথা সমাজ-পরিবেশে সেগুলি অপ্রয়োজনীয় তথা ক্ষতিকারক হ'লে সেই ধরণের পটলকে সবল হাতে তুলে ফেলতে হয়। অন্যথায় সমাজ অনারোগ্য কর্কটরোগে আক্রান্ত হয়ে নিজের ও সভ্যতার প্রাণ হরণ করে; তার 'পটল তোলার' ব্যবস্থা করে।

কোন সংস্কাররূপী অথবা প্রয়োজনের পটলে আফ্রিকার সমাজ-জীবনের একটা বৃহৎ অংশ আচ্ছন্ন, তার স্বরূপ উদ্ঘাটন করতে না পারলে, কেন চিতাগোষ্ঠীর বা প্যারিস, ইংলণ্ড বা অন্যত্র বসবাসকারী নিগ্রোদের মেয়ের একটা নির্দিষ্ট বয়সে 'ছেদন' অনুষ্ঠান করে, অনেক সময় প্যারিসে বসবাসকারী 'মালি' প্রদেশের প্রাক্তন অধিবাসী তরুণ দম্পতি তিন মাসের শিশুকন্যাকে অকাল-মৃত্যুতে হারিয়ে নীরব বেদনায় কাঁদে, তার স্বরূপ জানা যাবে না। এগুলি কুসংস্কার—এই বলে মুখ ফিরিয়ে থাকলেই কি সমস্যার সমাধান হবে? সমস্যা বা কুসংস্কার পটল তুলবে?

সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায়, সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতায়, সমাজের অর্থনৈতিক শোষণে শোষিত সাধারণ মানুষের পাশে বলিষ্ঠ মন নিয়ে জানাব ফজলুল হকের মত মানুষ এসে না দাঁড়ালে কত মাইনদ্দি আজও তলিয়ে যেতো, কত আমিনার দল সুস্থভাবে বাঁচার অধিকার থেকে বঞ্চিত হোতো, তার হিসাব করতে পারবো কি?

আজও পৃথিবীর কোণে কোণে কত মহাজন কখনো বণিকের, কখনো দরদীর, কখনো পুরোহিতের, কখনো হিতকামী বন্ধুর ছদ্মবেশে পটলে-তিলকে নিজেদের সাজিয়ে সাধারণ মানুষের রক্ত-শোষণের বেসাতি করে চলেছে, একটু স্বচ্ছ দৃষ্টি-সম্পন্ন মানুষই চক্ষু মেলে তাকালে তা দেখতে পাবেন। এদের ভণ্ডামির পটল তুলতে না পারলে একদিন নিপীড়িত মানুষ আত্মরক্ষার তাগিদে, সুস্থ জীবনে বাঁচার অধিকারে যে মূর্তি ধারণ করবে, ফলে যে ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে,

তাতে শ্রমজীবী মানুষের ঘাম ঝরা শ্রমে যে সভ্যতা তিলে তিলে বহু যুগ ধরে গড়ে উঠেছে, তা-ই হয়তো পটল তুলতে বাধ্য হবে।

তাই সভ্যতা বিকাশের পটলে পটলে যে সব সংস্কার জমে উঠেছে, যাদের এককালে সমকালীন জীবন ও সমাজকে বাঁচিয়ে রাখার প্রয়োজনে মানুষ গ্রহণ করেছিল সে যুগের বুদ্ধিবৃত্তিতে বিচার করে, তাদের ওপর পরবর্তী কালের সুকৌশলী-বুদ্ধিমান শ্রেণীর স্বার্থান্ধ হস্তাবলেপনের নতুন পটল গড়ে উঠেছে। মূল তলিয়ে গেছে বিস্মৃতির অতল গহ্বরে। সেই বিস্মৃত অথবা বিস্মৃতপ্রায় প্রাথমিক উৎসকে গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে খুঁজে বের করে সে যুগের গুরুত্ব এবং এ যুগের প্রয়োজনীয়তাকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করতে হবে। যারা আজো সেই প্রাচীন অন্ধ-সংস্কারের বলি, তাদের মধ্যে পটলের পর পটল তুলে ধরে এযুগের সমস্যার সঙ্গে এদের যোগ কতখানি, তার স্বরূপ উদ্ঘাটন করা একান্ত প্রয়োজন। আর সেই পথেই অন্ধ-সংস্কারের পটল তোলা সম্ভব। অন্যথায় ক্ষতে মলম লাগানো হবে। তার বীজ উৎপাটন অর্থাৎ সেগুলিকে পটল তোলানোর পথে এগিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়।

অক্কা পাওয়া

গিরিশ ঘোষ তাঁর একটি নাটকে একটি চরিত্রের মুখে 'বাবা অক্কা পেলো (বুড়ো বক্কেশ্বর)। টানের চোটেই অক্কা পেয়েছে।'—এই সংলাপটি বসিয়েছেন। অক্কা পাওয়া সাধারণভাবে হামেশাই ব্যবহৃত বলে প্রবাদটি স্বতঃ-অর্থবহ। অর্থাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্তি বা মৃত্যু। কিন্তু মৃত্যু অর্থে অক্কা শব্দটির ব্যবহার কেন? অক্কা শব্দের ব্যুৎপত্তি কেমন করে? শব্দটি সৃষ্টি মুহূর্তে কোন অর্থ বহন করতো? এসব প্রশ্ন মনে আসে।

শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বঙ্গীয় শব্দকোষে শব্দটির বহু অর্থ দেখিয়েছেন। তামিল বা দ্রাবিড়ীয় ভাষায় অক্কা অর্থ জ্যেষ্ঠা ভগিনী, দেশীনামমালা অনুসারে ভগিনী, ফারসী ভাষায় অকা অর্থ প্রভু, মালিক, আতা—অর্থ পিতা, মারাঠী ভাষায় জ্যেষ্ঠাভগিনী, বয়োজ্যেষ্ঠা নারী। ল্যাটিন ভাষায় জননী অর্থে Acca শব্দটির ব্যবহার আছে। অক্কা পাওয়া, তাঁর মতে, মরণসূচক। তিনি বলেন—বোধ হয়, বৈষ্ণবদিগের 'কেষ্টো পাওয়া'-র মত শাক্তদিগের 'অক্কা পাওয়া' (অর্থাৎ, মাকে পাওয়া বা মরা) মরণসূচক। তাই অক্কা অর্থে মা, জননী।

বাঙ্গালা ভাষার অভিধানে শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস বলেছেন—অক্কা = অক (দুঃখ) + ক (কৈ-শব্দ করা) + অ (র্তৃ) স্ত্রীং আপ্।—যিনি সন্তানের প্রসবকাল হইতে দুঃখসূচক শব্দ করেন—মাতা জননী। তিনি মনে করেন অক্কা = অত্তা = অম্বা (জননী)। বঙ্গীয় শব্দকোষ-স্বীকৃত অন্যান্য ভাষায় ব্যবহৃত শব্দের উল্লেখ তিনিও করেছেন। অক্কা পাওয়া এসেছে ফারসী আকা (মালিক, প্রভু-ঈশ্বর) থেকে ঈশ্বরপ্রাপ্তি বা স্বর্গলাভ এই অর্থে।

স্যার মনিয়ের উইলিয়মস্ তাঁর A Sanskrit Euglish Dictionary-তে পাণিনিকে উদ্ধৃত করে বলেছেন, শব্দটি হীনর্থে মাতা। যে কোনো নারীই

অক্কা। তিনি মনে করেন, কোনো বিদেশী শব্দ থেকে অক্কা ভারতীয় ভাষায় প্রবেশ করেছে। যেমন ল্যাটিনে অক আছে। এর বেশি কিছু বক্তব্য তিনি শব্দটি প্রসঙ্গে রাখেন নি। সবাই বলেছেন অক্কা অর্থে মাতা বা জন্মসূত্র। তাই অক্কা পাওয়া অর্থ যে মাতা প্রাণীর জন্ম-উৎস, তাতে বিলীন হওয়া অর্থ (অর্থ-ব্যাপ্তিতে) স্রষ্টা / ঈশ্বরে বিলীন হওয়া—ঈশ্বরপ্রাপ্তি। আবার পঞ্চভূতে (ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম) গঠিত আমাদের দেহ। এরাই আমাদের উৎস অর্থাৎ জননী। তাই অক্কা পাওয়া অর্থ পঞ্চত্ব প্রাপ্তি।

উল্লিখিত বক্তব্যগুলি সংহত করলে দাঁড়ায়, অক্ক / অক্কা / অকা অর্থ প্রভু, মালিক, ঈশ্বর, জননী। অক্কা পাওয়া অর্থে জননী বা জন্ম-উৎসে বিলীন হওয়া। যে পঞ্চভূতে দেহ গঠিত তাতেই দেহস্থিত পঞ্চভূতের বিভাজীকরণ বা বিলীন হওয়া। শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এর একটা ব্যাখ্যাও রেখেছেন। তা ধর্মীয় ব্যাখ্যা—বৈষ্ণবদের কেষ্টো পাওয়ার মত শাক্তদের জননী বা জগন্মাতার পদে লয় পাওয়া থেকে অক্কা পাওয়া অর্থ ঈশ্বরপ্রাপ্তি এসে থাকতে পারে।

উল্লিখিত অর্থগুলি বিভিন্ন ভাষায় আছে। সে সম্বন্ধে কিছু বলার নেই। কিন্তু শাক্তদের উপাসনা পদ্ধতি থেকে অক্কা পাওয়া অর্থ ঈশ্বরপ্রাপ্তি এসেছে এই ব্যাখ্যা মেনে নিতে কুণ্ঠাবোধ জাগে এই জন্য যে, শাক্ত-বৈষ্ণব মতবাদ শব্দটির উৎসের তুলনায় অর্বাচীন।

তাই শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস এবং স্যার মনিয়ের উইলিয়ম্‌স্‌ উৎস-প্রসঙ্গে পানিনি-প্রমুখের যে উল্লেখ করেছেন সেদিক থেকে একবার দেখা যেতে পারে। শ্রীদাস বলেছেন, অক্কা = অক (দুঃখ)+ক (কৈ শব্দ করা)+অ, স্ত্রীং আপ্। এবার ব্যুৎপত্তির বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা যাক। প্রথমে অক। অক অর্থ নয় ক। স্যার মনিয়ের উইলিয়ম্‌স্‌ অক্ ধাতু এবং অক শব্দের আলোচনা করেছেন। অক্ ধাতুর অর্থ to move tortuously like a snake। অর্থাৎ সর্পিল গতিভঙ্গি। অক শব্দের অর্থ unhappiness, pain, troube, sin L। অর্থাৎ অসুখী অবস্থা, ব্যথা, বিপদ এবং লোকোক্তি অনুসারে পাপ।

আগেই বলেছি অক শব্দটির অর্থ, নয় ক। অর্থাৎ ক-এর অবস্থা নয়। ছান্দোগ্য উপনিষদের মতে ক (কম্)-এর অর্থ সুখ, উল্লাস, আনন্দ। উপকোশল কামলায়ন-প্রাপ্ত অগ্নিবিদ্যা প্রসঙ্গে ৪।১০।৫ সংখ্যক মন্ত্রটি এই।—অথ হ অগ্নয়ঃ সমূদিরে তপ্তঃ ব্রহ্মচারী কুশলং নঃ পর্যচারিৎ। হন্ত অস্মৈ প্রব্রবামঃ

ইতি। তস্মৈ হ উচুঃ প্রাণঃ ব্রহ্ম, কম্ ব্রহ্ম, খম্ ব্রহ্ম ইতি (সন্ধিবিহীন পাঠ)।

বঙ্গানুবাদ ঃ অনন্তর অগ্নিগণ পরস্পর বলিতে লাগিল—এই 'এই তপস্যা-নিরত ব্রহ্মচারী যত্নের সহিত আমাদিগকে পরিচর্যা করিয়াছে। আমরা ইহাকে উপদেশ দিই।' অনন্তর তাহারা বলিল—'প্রাণই ব্রহ্ম, ক অর্থাৎ সুখ-ই ব্রহ্ম, 'খ' অর্থাৎ আকাশ-ই ব্রহ্ম।'

ছান্দোগ্য উপনিষদের উল্লিখিত মন্ত্রে পরিষ্কার ভাবেই সুখ-অর্থে 'ক'-এর ব্যবহার করা হয়েছে। যাস্কও তাঁর নিরুক্তম্-এর দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্দশ পরিচ্ছেদে 'নাক' শব্দের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে বলেছেন—অথ দ্যৌঃ; কম্ ইতি সুখনাম। তৎ প্রতিষিদ্ধং প্রতিসিধ্যেত। অর্থ—আর নাক শব্দ দ্যুলোক বোধক। ক এই শব্দ সুখের নাম। তদ্‌বিপরীত অক অসুখ বা দুঃখ প্রতিষিদ্ধ হয়।

উভয়ক্ষেত্রেই 'ক' অর্থে সুখ। অ (নয়, বিপরীত) ক (সুখ)=সুখের বিপরীত দুঃখ। অন্যদিকে অক্ ধাতুর অর্থ সর্পিল গতিভঙ্গি। শ্রীজ্ঞানেন্দ্র মোহন দাস, ছান্দোগ্য উপনিষদ্, যাস্কের নিরুক্ত অথবা পাণিনিও (হাতের কাছে পাণিনি-ব্যাকরণ না থাকায় উদ্ধৃতি দেওয়া গেল না।) অক শব্দের অর্থ দুঃখ বলেছেন। শ্রীদাস 'ক' শব্দের অর্থ বলেছেন কৈ-শব্দ করা। দুঃখভাগী যে কোনো মানুষই কোঁকানোর ধ্বনি করতে পারে। এর সঙ্গে কর্তৃবাচ্যে অ-প্রত্যয় যুক্ত হয়ে অক্ক শব্দের সৃষ্টি। তা'হলে অক্ক শব্দের অর্থ দাঁড়ায় বেদনা বা যন্ত্রণা প্রকাশক ধ্বনিকারী দুঃখপ্রাপ্ত ব্যক্তি। এই পর্যন্ত মোটা মুটি ঠিক থাকলেও স্ত্রীলিঙ্গ বোধক আ-কারটিই মূল সমস্যার সৃষ্টি করে। অক্ক+আ=অক্কা। অক্কা শব্দের অর্থ বিভিন্ন ভাষায় নারীজাতি। কিন্তু বঙ্গীয় শব্দকোষ অনুসারে অকা অর্থে প্রভু, মালিক। স্যার মনিয়েরে উইলিয়ম্‌স্ বলেছেন, 'মনে হয় শব্দটি বিদেশী কোনো ভাষা থেকে ভারতীয় ভাষায় এসেছে। ফারসী মধ্য প্রাচ্যের ভাষা। এটি পারস্য অঞ্চলের ভাষা। এই ভাষায় অকা অর্থে কিন্তু মাতা পিতা নয়। অন্য দিকে অক্কা শব্দটি অকা থেকে আসা একেবারেই বিচিত্র নয়। তবে স্যার মনিয়েরে উইলিয়ম্‌স্ বলেছেন 'অক্কা' জননী অর্থে সংস্কৃত ভাষায় আছে। তিনি পাণিনির নামের উল্লেখ-প্রসঙ্গে অক্ক বলেছেন সম্বোধনে। ল্যাটিনেও শব্দটি অক্ক।—এ-ও তাঁরই উক্তি। যে মনিয়েরে সাহেব প্রায় প্রতিটি শব্দের আলোচনা-প্রসঙ্গে গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেন, তিনি কিন্তু 'অক্কা'—প্রসঙ্গে পাণিনি ছাড়া আর কারো নাম বা কোনো বইয়ের কথা বলেন নি। কোনো

উদাহরণও দেন নি। পক্ষান্তরে, পাণিনি-অনুসারে মায়ের প্রতিশব্দ অক্কা। কিন্তু তাঁর মতে অক্কা এই শব্দটি ঘৃণাসূচক অর্থে ব্যবহৃত—একথা বলেছেন স্যর মনিয়ের উইলিয়মস্ তাঁর অভিধানে। পাণিনির কাল নির্দিষ্ট না হলেও বিভিন্ন পণ্ডিতের মতে তিনি খ্রী. পূ. ৭ম থেকে ৩য় শতকের লোক। জন্মস্থান উত্তর-পশ্চিম ভারতের শালাতুর গ্রামে। আর ঐ পথেই আর্যরা ভারতে অনুপ্রবেশ করেছিল মধ্য এশিয়া থেকে। ফারসী পারস্যবাসীদের ভাষা। আর্য-ভাষায় তথা ভারতীয় ভাষায় ফারসী শব্দের প্রভাব তখন থেকেই ছিল এটা স্বতঃসিদ্ধ। তা যদি হয়, তবে ফারসী অকা অর্থে মালিক, প্রভু। সে মালিক বা প্রভু নারী বা পুরুষ যে কেউই হতে পারতো সে-যুগে ; আজও হয়। প্রভুপত্নী বা নারী-প্রভুকে মাতা সম্বোধন করার রীতি আমাদের দেশে আজও আছে। সেই দিক থেকে সুপ্রাচীন কালেই প্রভু বা মালিক অর্থে পারস্য-দেশবাসীদের ভাষার অকা শব্দটি বিশেষ ক্ষেত্রে সম্বোধনে অক্ক (সাধারণভাবে অক্কা) হয়েছে বলে মনে হয়।

পাণিনি অক্কা অর্থে মাতা বলেছেন। used contemptuously। ঘৃণা বা অবজ্ঞা অর্থে ; সাধারণ ভাবে নয়। আর পাণিনিকে স্বীকৃতি দিলে একথা বলতেই হয় যে, বিভিন্ন অভিধান যে ভাবে অক্কা অর্থে জননী, মাতা বলেছেন, তাতে শব্দটিকে মহিমান্বিত করা হয়েছে। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস এই মহিমাসূচক ভাবকে লক্ষ রেখে অক্কা শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থের ব্যাখ্যা করেছেন—যিনি সন্তানের জন্মকাল হইতেই দুঃখসূচক শব্দ করেন। বঙ্গীয় শব্দকোষ আরও একটু এগিয়ে গিয়ে শব্দটির অর্থ করেছেন শাক্তদের বিশ্বজননী। এই দু'টি ব্যাখ্যাই একটু বেশি আবেগ-প্রবণ বলে মনে হয়। মনে হয় এই জন্য যে, শাক্ত সাহিত্যে বা সাধারণ ভাবে অক্কা শব্দটির এই জাতীয় অর্থে ব্যবহার কোথাও চোখে পড়েনি, বা কানে শুনি নি। ফারসী ভাষার অকা (বঙ্গীয় শব্দকোষ) বা আকা (বাঙ্গালা ভাষার অভিধান) শব্দের অর্থ মালিক বা প্রভু। এই অর্থেরও পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে। বলা হয়েছে, অক্কা পাওয়া যেহেতু মৃত্যু অর্থে ব্যবহৃত, তাই প্রভু, মালিক=ঈশ্বর=অক্কা। অর্থাৎ আমাদের ভক্তিবাদী মন শব্দটির উৎসের গভীরে না গিয়ে, যুক্তির আলোতে তাকে দেখতে চেষ্টা না করে, প্রবাদটি ব্যবহারিক অর্থানুষঙ্গের দিকে লক্ষ্য না রেখে শব্দার্থের উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টা করেছে। ভক্তিবাদের আলোকে বিশ্লেষণ করে শব্দের অর্থের উৎকর্ষ যে সাধন

হয় না বা হয় নি তা নয়। কিন্তু আলোচ্য প্রবাদের অক্কা কখনও-ই তেমন পর্যায়ে পেঁছুতে পারে নি কোনো ব্যবহারিক প্রয়োগে। যখন বলি, 'অত পিটিস্ নে অক্কা পেয়ে যাবে।' অথবা 'দেখিস্, বুড়ো / বুড়ি আজই অক্কা পেয়ে যাবে',—তখন কিন্তু কোনো ক্ষেত্রেই এই মৃত্যুর ফল ঈশ্বরপ্রাপ্তি বা জগজ্জননীর পদ-সান্নিধ্য-লাভ—এমন ভাববার কোনো অবকাশ থাকে না। আর এই প্রবাদের এই ব্যবহারই প্রায় সর্বত্র লক্ষ করা যায়। কোনো শিশু অথবা তরুণ, তরুণী বা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির মৃত্যুর ক্ষেত্রে অক্কা পেয়েছে এমন বলা হয় না। যদিও আমাদের সহানুভূতিশীল মন এই সমস্ত ক্ষেত্রেই ভক্তিবাদের মানসিকতায় ঈশ্বর প্রাপ্তিই কামনা করে। অর্থাৎ, এক কথায় আলোচ্য প্রবাদটির প্রয়োগ-সময়ে সহানু-ভূতিশীল, সহমর্মিতা বোধের মন কাজ করে না। ববং এই প্রবাদের প্রয়োগে সে মানসিকতার চিত্র ফুটে ওঠে তা হচ্ছে হত-শ্রদ্ধার, অ-মানবিকতার ভাব।

কিন্তু কেন সর্বত্রই এই চিত্র? উত্তরে, ফিরে যাওয়া যাক শব্দটির ব্যুৎপত্তির দিকে। ভারতীয় ভাষায় অক শব্দের অর্থ দুঃখ। অক্ ধাতুর অর্থ সর্পিল-ভঙ্গি। দু'টিকে একসঙ্গে মেলালে দাঁড়ায়, বিভিন্ন ধরণের জৈব-মানসিক দুঃখ দেহ-মনের উপর যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, তা হলো যন্ত্রণা কাতরতায় ন্যুব্জ-সর্পিল ভঙ্গিমা। অন্যদিকে পারস্য-দেশবাসীদের ভাষা ফারসীতে অকা শব্দের অর্থ মালিক বা প্রভু। সমাজে প্রভু বা মালিক শব্দের সৃষ্টি তখনই হয়েছে যখন পার্থিব সম্পদের মালিকানার ধারণা মানুষের মধ্যে এসেছে। আদিম জীবন-যাত্রায়, বহুদিনের প্রচেষ্টায় শিকারজীবী মানুষ পশুজগতের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করে তাকে গৃহপালিত হিসাবে অভ্যস্ত হতে বাধ্য করেছে। এই বশীকরণের ক্ষেত্রে দৈহিক নিপীড়ন প্রাথমিক স্তরে ছিল অপরিহার্য। তাকে দৈহিক অক (দুঃখ) দ্বারাই পোষ মানাতে হয়েছে। আজও এই প্রক্রিয়া থেকে আমরা দূরে সরে যাই নি। তাই পশুকে যখন বেঁধে পেটাই তখন সে অক্ (ন্যুব্জ, সর্পিল ভঙ্গি) করে যন্ত্রণায় কাতর হয়ে। নির্দয় মালিক বা প্রভুর মনে কোনো-রকম রেখাপাত করে না। সে পিটেই চলে। ফলে এমনও হয় যে পশুটি অক্কা পায়। মালিকের রোষবহ্নিতে আত্মাহুতিতে তার জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

পশুজগতকে বশীভূত করে তার নিষ্ঠুর হাত প্রসারিত হলো মানুষের দিকে। সেই আদিম যুগের পরবর্তী স্তরে নিরীহ মানুষ বলবানের আক্রমণে পর্যুদস্ত হয়ে মালিক বা প্রভুশ্রেণীর দাসে পরিণত হলো। এই দাসশ্রেণীর

প্রতি প্রভু বা মালিক সম্প্রদায় পশুর মতই আচরণের মধ্য দিয়ে তাদের জীবনে নামিয়ে আনলো 'অক'। 'অক্' করেও নিস্তার পায়নি দাসশ্রেণী। তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অক্কা পেয়েছে। শ্রেণীবিভক্ত অতীত এবং বর্তমান পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যে 'অক' (দুঃখ) মালিক শ্রেণী তৈরী করেছে, করে চলেছে, তার ঐতিহাসিক দলিল স্পার্টাগাস বা আঙ্কল টমস্ কেবিন-এর মত বহু গ্রন্থে ছড়িয়ে আছে পৃথিবীর কোণে কোণে রূপকথায়, উপকথায়, লোক-কথায়, উচ্চতর সাহিত্যে।

'অক'-সৃষ্টিকারী মালিক প্রভুরা তাই ফারসী ভাষায় 'অকা' বাংলায় অক্কা। মধ্যপ্রাচ্য, যা অনেকের মতে মানব সভ্যতার আদি লীলাভূমি (অনেকে আবার এই মতবাদ স্বীকার করেন না), তার প্রাচীন ইতিহাস এই অকা বা অক্কাদেরই দম্ভের ইতিহাস। এবং তা সুপ্রাচীন কাল থেকেই, অন্যান্য দেশের মত। এর চিত্র ছড়িয়ে আছে 'সহস্র-এক-আরব্য-রজনী'-জাতীয় গ্রন্থে।

পৃথিবীব্যাপী এই 'অকাদের দল ছলে বলে কলে কৌশলে মানুষের ওপর আজও 'অক' বা হিক্কা, বা হেঁচ্কি চাপিয়ে দিতে চাইছে এবং দিচ্ছে এমনভাবে যাতে তারা কখনো উচ্চকণ্ঠে, কখনও বা নীরবে অক্ করে চলেছে।

'অক'-র পরিবর্তে যে নতুন শব্দ দু'টি সংযোজিত হলো, তাদের সম্বন্ধে কিছু বলি। হেঁচ্কির আভিধানিক অর্থ হিক্কার শব্দ করা। আমরাও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় জানি, কাঁদতে কাঁদতে অথবা শুকনো গলায় কোনো কঠিন এবং শুষ্ক-প্রায় খাদ্য গলাধঃকরণ করার চেষ্টা করলে কন্ঠনালীতে যে অস্বস্তিকর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়, তা-ই হেঁচ্কি। হেঁচ্কির ফলে দেখা দেয় থেমে থেমে দম বন্ধের একটা পরিস্থিতি। এর হাত থেকে পরিত্রাণের উপায় জল দিয়ে কন্ঠনালীকে ভিজিয়ে নেওয়া। অন্যদিকে 'হিক্কার' অর্থ হেঁচ্কি। বাঙগালা ভাষার অভিধানে শব্দটির একটি যথার্থ প্রয়োগের সাহিত্যক উদাহরণ আছে।—"দেখিতে দেখিতে কন্ঠ অন্তিম হিক্কায় কাঁপিয়া উঠিল,—প্রেম ও ফুল (গ্রন্থকার বা গ্রন্থ সম্বন্ধে কোনো ধারণা বর্তমান লেখকের নেই)। অর্থাৎ, অকা-র দল সাধারণ মানুষের উপর যে 'স্নেহ-বর্ষণ' করে তার ফলে হিক্কার (অন্তিম কম্পন) সৃষ্টি হয়, তা-ই প্রাচীন অর্থে হেঁচকি বা 'অক্কা'!

উপরি উক্ত আলোচনা এবং অক্কা পাওয়া এই বাংলা প্রবাদের প্রয়োগ রীতি থেকে, আমাদের ধারণা, ফারসী 'অকা' থেকে বাংলা প্রবাদে ব্যবহৃত অক্কা-শব্দের সৃষ্টি।

সংস্কৃত অক্কা (জননী, নারী) শব্দের সঙ্গে এর কোনো উৎস-যোগ নেই। এই অকা/অক্কাদের সংস্পর্শে আসাই অক্কা পাওয়া। পৃথিবীর তাবৎ দেশের আবহমান-কালের ইতিহাস তা-ই বলে।

যে অকাকে পেলে লোক, শ্রমজীবী দাসের দল অক্কা পায়, সেই অক্কা শব্দটি যদি সংস্কৃত থেকে বাংলায় আসতো তবে অক্কা শব্দটির প্রবাদের বাইরেও ব্যবহার পেতাম। তা কিন্তু কোথাও পাই না।

অকা কেমন করে অক্কা হলো এটা চিন্তার ব্যাপার। অনেক শব্দের শেষ ব্যঞ্জন-ধ্বনিকেই আমরা দ্বিত্ব করে উচ্চারণ করি বিভিন্ন অনুভূতির প্রকাশের ক্ষেত্রে। যেমন বড়>বড্ড। যখন বলি, 'বড্ড দূরে', তখন থাকে ক্লান্তি জনিত হতাশার সুর। আবার, 'বড্ড বাড় বেড়েছে তোমার!' এই বাক্যে বক্তার মাত্রা-সংযত, দাঁত-চাপা ক্রোধ দ্বিত্ব ধ্বনিটিতে যথাযথ ও সার্থকভাবে ধরা পড়ে। অন্য দিকে 'ছোট্ট পাখি টুনটুনি'।—তে এক আদর, সোহাগভরা মন যেন নিজের প্রাণের দরজাটি খুলে দেয়। অকাদের অত্যাচারের স্মৃতিই অকাকে অক্কায় রূপান্তরিত করেছে।

অকা বা অক্ককে, পাওয়া অর্থাৎ তার সংস্পর্শে আসা যে ধরণের আনন্দ দেয়, তা দাসশ্রেণীর (শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে আছে কেবল দু'টি শ্রেণী—প্রভু আর দাস) হৃৎ-স্পন্দনেই ধরা পড়ে, তা অনুভব করা যায়। উল্লিখিত বিভিন্ন গ্রন্থের ঘটনা প্রবাহকে স্মরণ করলেই তা বুঝতে পারি। এই অত্যাচার উৎপীড়নের মাত্রাকে সহ্য করতে না পেরে অনেক সময় এই নিপীড়িতের দল পালিয়ে যাবার চেষ্টা করে, বা যায়। একক অথবা দলবদ্ধ ভাবে কিন্তু এই অক্কা-শ্রেণীর জাল এমনভাবে পৃথিবী ব্যাপি ছড়ানো যে পালিয়ে মুক্তি নেই। আবার অক্কার কাছে ফিরে আসতে হবে, অক্কা পেতে (প্রবাদের অর্থে নয়) হবে। ফলে পালানোর অব্যবহিত পূর্ববর্তী নাটক এমন তীব্রতর প্রয়োগে অভিনীত হ'তে থাকবে যে প্রবাদের অন্যতম অর্থ 'পঞ্চত্বপ্রাপ্তি' সুপরিস্ফুট হয়ে উঠবে। 'পঞ্চত্ব-প্রাপ্তি' কঠিন শব্দ। অর্থ যাতে সহজে বুঝতে পারি তার জন্য বলি 'মেরে হাড় গুঁড়িয়ে দেবো'। এটা কেবল কথার কথা নয়। অকারা প্রায়শই এটা করতো। আজো অনেকক্ষেত্রে করে, কেবল ক্রোধের বশে নয়, খেলার ছলেও। নইলে আফ্রিকা, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া বা পৃথিবীর অন্যান্য বহু অঞ্চলের আদিম জাতিগুলি নিশ্চিহ্ন হতে বসেছে কেন? কেন আজ আর ইস্টার আইল্যান্ডে একটিও মানুষ

নেই ?—যারা ওখানকার বিরাট বিরাট পাথরের মূর্তি গড়েছিল ? অকাদের এ খেলার সাক্ষী ইতিহাস।

অকাদের কাজই নিরীহ, সরল মানুষকে অক্কা পাওয়ানো। আরও মজার ব্যাপার এই যে, এদেরই অধীনস্থ দাস বা ভৃত্যশ্রেণী অত্যাচারের নতুন কৌশল উদ্ভাবন করে এদের হাতে তুলে দেয়। সেগুলি অকারা আবার ভৃত্য বা দাস বা সাধারণ মানুষের ওপর প্রয়োগ ক'রে সবারই অক্কা পাওয়ার পথ প্রশস্ত করে তোলে।

শ্রেণীবিভক্ত সমাজে অকাদের নয়, অক্কাত্বের অক্কা পাওয়ানোর জন্য সাধারণ মানুষ যদি সংহত হ'তে না পারে, তবে এই অত্যাচারকে স্বীকার করে নেওয়া হবে। 'সুস্থ, সুন্দর, সৎ মানুষের সমাজ' কেবল কল্পনার বস্তুই হবে। এ থেকে মুক্ত হতে গিয়ে মালিক বা অকা বা অক্কাদের প্রদর্শিত পথের অনুসরণ মানুষকে ভুলের পথেই ঠেলে দেবে। হয়তো একদিন দেখা যাবে মানুষ নামীয় প্রাণীই অক্কা পেয়ে গেছে পৃথিবীর বুক থেকে এর ফলে।

টেঁসে যাওয়া

রবীন্দ্রনাথের 'কৌতুক-নাট্য'গুলির অন্যতম বিখ্যাত 'অন্ত্যেষ্টি-সৎসকার।' এই কৌতুক-নাট্যটিতে রায় কৃষ্ণকিশোর বাহাদুর মৃত্যু শয্যায় শয়ান। চন্দ্র কিশোর নন্দকিশোর ও ইন্দ্রকিশোর পুত্রত্রয় পরামর্শরত। ডাক্তার উপস্থিত। মহিলাগণ ক্রন্দনোন্মুখী। কৃষ্ণকিশোর মারা গেলে কোন কোন সাহেবকে সংবাদ দিতে হবে, তাই নিয়ে সংলাপ চলছিল (রায় বাহাদুর উপাধি তো সাহেবদেরই দেওয়া!)। তখন অন্যতম পুত্র স্কন্দকিশোরের প্রবেশ। আলোচ্য বিষয় ঘুরে যায়। তার মতে 'সাহেবদের নামের লিস্টির আগে প্রয়োজন, ঘাটে যাবার প্রোসেশ্যনে যারা যোগ দেবে তাদের তো আগে থাকতে খবর দেওয়া।' প্রশ্ন উঠলো, সাধারণকে জানাতে হলে মৃত্যুটা কখন হবে, তা নির্ধারণ করা। উপস্থিত ডাক্তারের উক্তি, 'যে রকম দেখছি আজ রাত্রি চারটের সময়ই বা হয়ে যায়।'

এই নাটিকাটি যদি রবীন্দ্রনাথের না হয়ে আধুনিক কালের নাট্যকারের হতো, নায়ক রায়বাহাদুর না হয়ে সাধারণ নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের হতেন, চন্দ্র, নন্দ, ইন্দ্র, স্কন্দ যদি মৃত্যুপথযাত্রীর পুত্র না হয়ে পাড়ার তরুণ-বয়সী কিছু যুবক, যারা সত্যি পাড়া-প্রতিবেশীর বিপদের সময় স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এগিয়ে আসে, অথচ ছুঁৎমার্গী সমাজ যাদের রকবাজ আখ্যায় চিহ্নিত করে, তবে নাট্যকার হয়তো কোনো উপযুক্ত অবসর সৃষ্টি করে ডাক্তারের বক্তব্যকে ওদের কারো সংলাপ করে লিখতেন, 'চল চল, বুড়ো তো আজ রাত্রেই টেঁসে যাবে। খাটিয়াটা এখনই নিয়ে এসে রেখে দিই।'

আলোচ্য নাটিকাখানি পড়তে পড়তে কথাটা মনে এলো। রবীন্দ্রনাথ যেখানে সমাজের তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর মানুষের মুখে, যা সাধারণ ভাষায় ব্যবহৃত, সেই 'হয়ে যায়' শব্দ দিয়ে মৃত্যুকে চিহ্নিত করেছেন, তা-ই চটুল চালে বলতে গেলে হয় 'টেঁসে যায়।' টেঁসে যাওয়া শব্দগুচ্ছ বা প্রবাদকে যখনই যারা ব্যবহার

করুন না কেন এর ব্যবহারে কখনই মৃত্যুর বেদনা প্রকাশ করা যায় না। মৃত বা মৃত্যুপথযাত্রী বা তার আত্মীয়-স্বজনের প্রতি সমবেদনা বোধের কোন প্রকাশ এই প্রবাদটির মধ্য দিয়ে ধরা পড়ে না।

প্রশ্ন আসে, মৃত্যুকে টেঁসে যাওয়া বলে কেন? 'টেঁসে' শব্দটির ব্যুৎপত্তি এবং ব্যুৎপত্তিগত অর্থ কি? শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস তাঁর বাঙ্গালা ভাষার অভিধানে বলেছেন—চলিত ভাষার টেঁসে যাওয়া—টাঁসা। তিনি টাঁসা ক্রিয়াপদের সঙ্গে হিন্দী ক্রিয়াপদ টাঁসনা-এর সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছেন। হিন্দী টাঁসনা ক্রিয়াপদের সঙ্গে যে ব্যুৎপত্তিগত অর্থানুষঙ্গ আছে তা হলো 'যে রোগে হাত পায়ের রক্ত চলাচল বন্ধ হইয়া যায় এমন রোগাক্রান্ত হওয়া।'

হিন্দীতে রক্ত চলাচল বন্ধ হওয়া টাঁসনা শব্দটির দ্বারা চিহ্নিত হয়ে আছে। রক্ত চলাচল করা সজীবতার লক্ষণ। অথচ সেটা যে মুহূর্তে বন্ধ হবে, সেই মুহূর্তে ধরে নিতে হবে স্বতঃসিদ্ধভাবে যে হৃদ্‌যন্ত্র আর কাজ করছে না। অবস্থাটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্য এবং বেদনাজনক। কিন্তু যে মুহূর্তে বলি টেঁসে গেছে, সেই মুহূর্তেই ধরে নিই যে হৃদ্‌পিণ্ড স্তব্ধ। ব্যথা পাই বলেই এই ধরণের মৃত্যুতে, বলা উচিত মরে গেছে, বা ঐ জাতীয় কোনো বেদনাগভীর শব্দ উচ্চারণ করা উচিত। বাংলা ভাষায় 'টেঁসে যাওয়া' অত্যন্ত চটুলভাবেই ব্যবহৃত। অথচ ভাবতে অবাক লাগে যে হিন্দীভাষা অত্যন্ত বেদনাবোধের সঙ্গেই মৃত্যুকে টাঁস-না দিয়ে বোঝাতে চেয়েছিল শব্দটির সৃষ্টি-মুহূর্তে। কিন্তু বাংলাভাষা যখন শব্দটিকে ভাষা প্রবাহে আলোচ্য প্রবাদটির মধ্যে ব্যবহার শুরু করলো, সেই গাম্ভীর্য আর বেদনাবোধের অনুষঙ্গকে টিকিয়ে রাখতে পারলো না। এটা যখন ভাবি তখন আর একটি বাংলা প্রবাদের অর্থ বুঝতে অসুবিধা হয় না—এক দেশের বুলি, অন্য দেশের গালি। একটি সুস্থ সবল মানুষ যার রক্তে আছে সরস সজীব উদ্দামতা, সে টাঁসনায় আক্রান্ত হলো। ধীরে, ধীরে রক্তের চলাচল কমতে কমতে হৃদ্‌যন্ত্র একদিন বন্ধ হয়ে গেল। যে যুগে এবং যে জনগোষ্ঠীর মধ্যে শব্দটির জন্ম, তাদের মধ্যে সে সময় এবং আজো সব ক্ষেত্রে চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত নেই বা ছিল না। তিলে তিলে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করছে রোগী, করবার কিছু নেই, অসহায়ভাবে মৃত্যুর প্রহর গণনা করা ছাড়া। এই পরিবেশে নিকট আত্মীয় যখন বলেন যে টাঁসনা হয়েছে, তখন সেই উচ্চারিত 'লোকটা টেঁসে গেছে বা যাবে'—এর কতই না তফাৎ।

এই সমাজ পরিবেশে যেখানে বঞ্চনা আর হতাশা, ব্যর্থতা আর বেদনা, গোষ্ঠী-স্বার্থ, বৃহত্তর সমাজের উপর বিভিন্ন কৌশলে চাপিয়ে রেখেছে, তা থেকে মুক্তির পথ খুঁজে বের না করতে পারলে লোলচর্ম ফলের মতই টেঁসো মারতে হবে। বা সমাজের কাঁধে আবহমান কাল ধরে যে জীবন্মৃতের দেহ আজও শব হয়ে কেবলই ভারি হতে হতে চলেছে, তাকে শ্মশানের আগুনে পোড়ানো আশু কর্তব্য হলেও, মুখাগ্নির প্রয়োজন তার, যে স্বার্থচিন্তা তরতাজা প্রাণগুলোর মধ্যে সেই বিষ প্রয়োগ করে চলে আসছে বহুকাল ধরে অত্যন্ত সুচতুর ভাবে। যার ফলে তরুণ-তরুণীরাও জীবনীশক্তির রক্তচলাচল ধীরে ধীরে বন্ধ হতে হতে 'টেঁসে যেতে' বসেছে। সেই খল নায়কতার পশুশক্তির মুখাগ্নি করে মন্ত্র পড়া প্রয়োজন— 'ধর্মাধর্মসমাযুক্তং লোভমোহ-সমাবৃতম্ দহেয়ং সর্বগাত্রাণি দিব্যান্ লোকান্ স গচ্ছতু।' খল-নায়কত্বের পশুশক্তিকে দিব্যলোকে পাঠাতে হবে। কারণ পৌরোহিত্য আমাদের বলেছে, সেখানে পার্থিব ক্ষুধা তৃষ্ণা নেই। সেখানে অনন্ত জীবন। দিব্যাঙ্গণা বা হুরী পরীরা সেখানকার অধিবাসীদের সেবাদাসী হয়ে থাকে চিরকাল। তাই বলি, এই স্বার্থান্ধ পশুশক্তিকে সৎকারের মধ্য দিয়ে সেখানে পাঠিয়ে দেবার পথ সুগম করা হোক। পৃথিবীর অতি নগণ্য নিরক্ষর, অবহেলিত, পদদলিত, নিরন্ন অর্ধাহার অনাহারক্লিষ্ট মানুষের সংগে ওই শক্তির সহাবস্থান অসম্ভব। বে-মানানও বটে। ওর টেঁসে যাওয়ার পথ সুগম, কুসুমাস্তীর্ণ করাই আশু প্রয়োজন।

টেঁসো মারা, টেঁসে যাওয়া শব্দগুচ্ছ তথা প্রবাদের প্রকৃত তাৎপর্য, তার ব্যবহারিক অনুষঙ্গরূপান্তর ভাবতে বসলে, বারে বারেই মনে হয়, প্রবাদ বৃহত্তম সমাজের বেদনাময় জীবন-অভিজ্ঞতার ফসল। সে নিজে টেঁসো মেরে বা টেঁসে যায় না। বরং তা শুক্তির পেটে ঢুকে যাওয়া বালিকণাকে ঢাকার জন্য, বেদনার উপর প্রলেপ দিতে দিতে একসময় মুক্তোর মত জন্ম নেয়। মুক্তো নিজে হাসে; কিন্তু তার মর্মমূলে থেকে যায় সেই অতি প্রাচীন ধারালো বালুকণা।